বি. এ. (শিক্ষা) ; বি. টি. ; বি. এড্. এবং পি. জি. বেসিক কোর্স

শিক্ষা-তত্ত্ব

(Principles and Practice of Education)

[illegible] কুমার রায়

অধ্যাপক, মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র কলেজ

কলিকাতা-৩

ব্যানার্জী পাবলিশার্স

৫/১এ কলেজ রো

কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

আমার

মা

ও

বাবাকে

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'শিক্ষা-তত্ত্ব' সম্বন্ধে একটি অভিযোগ ছিল যে, অনেক আনুষংগিক বিষয়ের অবতারণা আমি করিনি। প্রচলিত বইগুলিতে শিক্ষাতত্ত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা নেই বলে অনেকে তা' যোগ করতে বলেছেন। দ্বিতীয়বার সংস্কারের সুযোগ পেয়ে আমি বহু ক্ষেত্রে নতুন বিষয়ের অবতারণা করেছি। বিশেষভাবে উল্লেখ যে, বিগত কয়েক বছরের স্নাতক ও শিক্ষক-শিক্ষণ পরীক্ষার প্রশ্নাবলী সম্পূর্ণ আলোচিত হয়েছে। এছাড়া, বুনিয়াদী শিক্ষা একটি পৃথক অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

আশা করি সংযোজিত বিষয়গুলি সহকর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। কোন বিষয় সম্বন্ধে মতামত রইলে বা বইটির কোন ত্রুটি ধরা পড়লে অনুগ্রহপূর্বক আমাদের জানাবেন—পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করার চেষ্টা করব।

খগেন্দ্রকুমার রায়

ভূমিকা

শুরুতেই একটি কথা বলা ভাল, আমার এ-বই গবেষণালব্ধ তথ্যপূর্ণ নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে যে সমস্ত দেশী-বিদেশী বইয়ের উল্লেখ রয়েছে মূলতঃ তাদের উপর নির্ভর করেই এই বইটি রচনা করেছি। কোন নতুন তথ্য বা তত্ত্বের অবতারণা করিনি। সুতরাং প্রশ্ন হচ্ছে, বাজারে যখন চলতি বইয়ের অভাব নেই তখন নতুন পুস্তক প্রকাশের প্রয়োজন কি? এজন্য একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া দরকার। প্রথমতঃ, আমার বইটি স্নাতকশ্রেণীর পাঠ্যসূচীকে কেন্দ্র করেই লিখিত। পাঠ্যসূচীকে এলোমেলো সাজিয়ে বা কিছু অংশ বাদ দিয়ে আমি বই লিখিনি। আমার বিশ্বাস পাঠ্যসূচী প্রণেতারা বিশেষ দৃষ্টিভংগী থেকে বিষয়াবলী ক্রমানুসারে নির্ধারিত করেছেন। শিক্ষাতত্ত্বের গতিশীল চিন্তার সংগেও তার মিল আছে। এজন্য একে রক্ষা করতে সযত্ন চেষ্টার ক্রটি করিনি। দ্বিতীয়তঃ, এ বই শিক্ষার্থীদের জন্য লেখা। সাধারণ পাঠক শিক্ষা-গবেষক দেশী-বিদেশীদের লেখা প্রচুর তথ্য-সম্ভারপূর্ণ পুস্তক বাজারে পাবেন। কিন্তু শিক্ষার্থীরা আমাদের দেশে প্রচলিত পাঠ্যসূচীর উপর তাদের পরীক্ষা দেয়। এই বাস্তব চাহিদাকে মেটাবার জন্যই বইটি লিখতে অনুরুদ্ধ হয়েছি। এতে আমি কতটুকু সমর্থ হয়েছি সুধীজন বিবেচনা করবেন। দেশী-বিদেশী লেখকদের তথ্য যেখানে পরিবেশন করেছি, সেখানে তাঁদের নাম উল্লেখ করেছি। যদি কোথাও কারো নাম বাদ পড়ে থাকে সেটা অনিচ্ছাকৃত ভাবেই হয়েছে। আমি যখন বই লিখছিলাম, তখন প্রাচীন ও আধুনিক অনেক শিক্ষাবিদ্‌দের চিন্তাধারাই আমার মনে কাজ করছিল। এঁদের সকলের কাছে আমি ঋণী। তাছাড়া, বাংলা ভাষায় যাঁরা শিক্ষাতত্ত্বের উপর বই লিখে আমার পথকে সুগম করে দিয়েছেন, তাঁদের প্রতিও আমার ঋণের সীমা নেই।

বইয়ের নামকরণ সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। '*Principles and practice of Education*'কে একই সংগে 'শিক্ষা-তত্ত্ব' বলে অভিহিত করেছি। 'শিক্ষা-তত্ত্ব' বলতে শিক্ষার মৌলিক নীতি (Principles) এবং তার প্রয়োগ (Practice) বুঝি। শিক্ষার মৌলিক নীতিগুলি নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করি, তখন শিক্ষা-শাস্ত্রকে একটি

বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃতি দেই। কিন্তু শিক্ষা-বিজ্ঞান বস্তুনিষ্ঠ (Positive) বিজ্ঞান নয়; আদর্শ এবং মূল্যের (values) প্রশ্ন শিক্ষার যে-কোন আলোচনার সংগে যুক্ত। এজন্য শিক্ষাবিজ্ঞানকে আদর্শনিষ্ঠ (Normative) বিজ্ঞান বলে অভিহিত করা যেতে পারে। কিন্তু শিক্ষার আলোচনা শিক্ষার মৌলিক নীতি নির্ধারণেই সীমায়িত নয়। শিক্ষার প্রয়োগ বা অনুশীলনের (Practice) দিকটিও শিক্ষা-চিন্তার অংগীভূত। শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয়ের সংগে শিক্ষাদান-পদ্ধতিও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার সংজ্ঞা বা শিক্ষানীতি দার্শনিক সংব্যাখ্যানকে শিক্ষা ব্যবস্থায় বাস্তবে প্রয়োগ করতে হয়। এজন্য জন ডিউই শিক্ষাতত্ত্বকে দর্শনের প্রয়োগ শাস্ত্র বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর এ বক্তব্যে প্রচুর যুক্তি থাকলেও শিক্ষা-তত্ত্ব সম্বন্ধে উহা যথার্থ বা সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা বলে অনেকে গ্রহণ করেন না। শিক্ষা-তত্ত্ব শুধু কতকগুলি মৌলিক-নীতির প্রয়োগ-শাস্ত্র (Art) নয়, উহা নানা মৌলিক-নীতিকেও আলোচনা করে। অর্থাৎ শিক্ষা-তত্ত্ব শিক্ষার মৌলিক-নীতিও নির্ধারণ করে। এজন্য শিক্ষা-তত্ত্বকে যুগপৎ বিজ্ঞান এবং প্রয়োগ-শাস্ত্র (both Art and Science) বলা যেতে পারে। বলা বাহুল্য, বর্তমান লেখক এ মতকেই গ্রহণ করেছেন। শিক্ষা-তত্ত্ব শিক্ষার মৌলিক-নীতি এবং এদের ব্যবহারিক দিক আলোচনা করে। এ প্রসংগে অনিসন্ধিৎসু পাঠক C. L. Hall-এর *Great Human Issues of Our Times* গ্রন্থে 'Conflicting Philosophies of Educations' প্রবন্ধটি প্রয়োজন বোধে আলোচনা করতে পারেন।

ব্যানার্জী পাবলিশার্সের স্বত্বাধিকারী বন্ধুবর শ্রীসূর্যকুমার ব্যানার্জী স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে বইটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং নিউ মহামায়া প্রেসের শ্রীঅবনীরঞ্জন মান্না মুদ্রণের দায়িত্ব নিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁদের সক্রিয় সাহায্য ছাড়া আমার পক্ষে এ-বই প্রকাশ করা সম্ভব হত না।

বইটির উন্নতিকল্পে বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মিদের অভিমত সাদরে গৃহীত হবে এবং কোন রকম ত্রুটিবিচ্যুতির দিকে যদি লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, অবশ্যই তা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধিত হবে। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছাপার ব্যাপারে দুচারটি ভুল রয়ে গেল, বারান্তরে সংশোধনের ইচ্ছা রইল। আশা করি সহানুভূতিশীল পাঠক সেগুলি ক্ষমা সুন্দর চোখে দেখবেন। ইতি—

জ্যোতিন্দ্রকুমার রায়

Revised SYLLABUS for B. A.

EDUCATION

Paper I : 100 Marks

Principle and Practice of Fducation (*including theories of great educators*).

Definition, scope and function of education.

Aims of education.

Factors of education : pupil, teacher, curriculum and educational environment.

Child-centered education : History and Significance.

The child, His nurture and nuture.

Agencies of education : family, school, society, religous institutions and state

Curriculum : principles of curriculum construction. Co-curriculular activities.

Play and play-way in education.

Freedom and discipline.

Methods of teaching—logical and psychological. Activity Methods in education and individualised instruction : Kindergarten system, Montessori method, Dalton Plan, Project method, Batavia system, Winnetka plan, Decrely System. Sevagram in method.

Contributions of Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Herbert, Montessori and Dewey to educational theory and practice.

The teacher : his qualifications.

Reward and punishment.

Teaching and lesson notes.

Tests and examinations.

Revised Syllabus for the B. T. Examination

Part I

Principles of Education : 100 Marks.

Concept, meaning and scope of Education. Philosophy and education. Sociological bases of education. Educational a ms and ideals.

Modern trends in Education—child-centric and life-centric 'education. Activity principle in education. Play and playway.

Suggestion, sympathy and imitation in Education.

Curriculum and principles of curriculum construction. Co-curricular actitivities. Education for leisure.

Agencies of education—Home school and society. The school Idea. Different types of schools and their functions.

Discipline and freedom.

Rewards and punishments.

Teacher—his qualifications, duties and functions. Mental health of the teacher.

Education for Democracy and citizenship. Education for emotional ;and national integration, Education for international understanding.

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

বিষয় পৃষ্ঠা

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চতুর্দশ অধ্যায়

পঞ্চদশ অধ্যায়

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

সপ্তদশ অধ্যায়

অষ্টাদশ অধ্যায়

উনবিংশ অধ্যায়

বিংশ অধ্যায়

একবিংশ অধ্যায়

দ্বাবিংশ অধ্যায়

শিক্ষা-তত্ত্ব

(Principles of Education)

প্রথম অধ্যায়

শিক্ষাতত্ত্ব ঃ বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যা

(Education : Science and Art)

১। শিক্ষাতত্ত্বের স্বরূপ ঃ (Nature of Education) :

কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করার পূর্বে সে শাস্ত্রের স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের কিছুটা পরিচয় থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ, এর ফলে সে শাস্ত্রের অধীত বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আমাদের সম্যক ধারণা সৃষ্টি সম্ভব হয় এবং অধীত বিষয়কে কেন্দ্র করে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভংগী গড়ে ওঠে।

'Principles and Practice of Education'-কে একই সঙ্গে 'শিক্ষাতত্ত্ব' বলে আমরা অভিহিত করেছি। কারণ 'শিক্ষা তত্ত্ব' বলতে শিক্ষার মৌলিক নীতি বা শিক্ষা-বিজ্ঞান (Principles or Science) এবং তার প্রয়োগ (Practice) বুঝি। শিক্ষার মৌলিক নীতিগুলিকে নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করি, তখন শিক্ষা-শাস্ত্রকে একটি বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃতি দেই। কিন্তু শিক্ষার আলোচনা শিক্ষার মৌলিক নীতি নির্ধারণেই সীমায়িত নয়। শিক্ষার প্রয়োগ বা অনুশীলনের দিকটিও শিক্ষা-চিন্তার অংগীভূত। এদিক থেকে শিক্ষা-তত্ত্ব একটি প্রয়োগ শাস্ত্র (Art)।

উপরের এই অভিমতকে এক্ষণে আমরা একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করি। কারণ, শিক্ষা-তত্ত্বের স্বরূপ নির্ণয়ে আমরা 'বিজ্ঞান' 'প্রয়োগ শাস্ত্র' ইত্যাদি কথা ব্যবহার করেছি। এ সব শব্দের সংব্যাখ্যান প্রয়োজন।

'বিজ্ঞান' কথাটার সহজ অর্থ বিশেষ জ্ঞান। সাধারণ জ্ঞান যেখানে এলোমেলো, অসংযত ; বিজ্ঞানের জ্ঞান সেক্ষেত্রে সুবিন্যস্ত, সংযত, সুসম্বদ্ধ। এ অর্থে বিজ্ঞানের জ্ঞান বিশেষ। বিজ্ঞান প্রকৃতির কোন নির্দিষ্ট অংশকে নিয়ে যখন অধ্যয়ন করে তখন সে বিশেষ বিশেষ প্রণালীর (methods) সাহায্য নেয়, বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্যে একটি সংহতি (system) আনবার চেষ্টা করে। যার ফলে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত হয় সার্বিক এবং অনিবার্য (universal and necessary)। অবধারণ ও পরীক্ষণের উপর বিজ্ঞানের গবেষণা নির্ভরশীল এবং

বৈজ্ঞানিক সূত্রে গবেষণালব্ধ তথ্য ব্যাখ্যাত হয় বলে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত সার্বিকতা ও অনিবার্যতা দাবি করে। পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, মনোবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞান নিজ নিজ বিষয় বস্তু সম্বন্ধে আমাদের সুসংহত জ্ঞান প্রদান করে। বিজ্ঞান যখন বিচ্ছিন্ন ব্যাপার সম্বন্ধে ব্যাখ্যা প্রদান করে তখন সে নানা তত্ত্ব (theory) সৃষ্টি করে। এজন্য বিজ্ঞানকে 'তত্ত্ব'ও বলে।

আবার অনেক ধরনের বিজ্ঞান আছে, যে গুলিতে ব্যবহারিক (practical) দিকটিই প্রধান। যেমন, কৃষি-বিজ্ঞান, নৌবিদ্যা ইত্যাদি। এ বিজ্ঞানগুলিতে তত্ত্বীয় (theoretical) দিক থাকলেও ব্যবহারিক দিক প্রধান। বাস্তবে নীতি বা তত্ত্ব প্রয়োগ করাই এ সব বিজ্ঞানে মুখ্য কথা। এদিক থেকে বিবেচনা করলে পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, মনোবিদ্যা ইত্যাদিকে আমরা বিশুদ্ধ বিজ্ঞান (Pure Science) বলে অভিহিত করতে পারি। এ সব বিজ্ঞানে বিষয় বস্তুর জ্ঞান লাভের জন্যই আমরা বিষয় বস্তুকে অধ্যয়ন করে থাকি, এর বাইরে আমাদের বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু কৃষি-বিজ্ঞান, নৌবিদ্যা বা খনি-বিজ্ঞানে কেবলমাত্র তত্ত্বীয় জ্ঞান লাভই আমাদের উদ্দেশ্য নয়, বাস্তব ক্ষেত্রে নীতি প্রয়োগ করাই আমাদের লক্ষ্য। এ অর্থে এ সব বিজ্ঞানকে আমরা ফলিত বিজ্ঞান (Applied Science) বলে আখ্যাত করতে পারি। এ ফলিত বিজ্ঞানকেই কলা বা প্রয়োগ শাস্ত্র (Art) বলা হয়ে থাকে। কোন কর্মকে সুসম্পাদন করার জন্য যে তত্ত্বীয় জ্ঞান আমরা গ্রহণ করি তাকে নিয়েই ফলিত বিজ্ঞান গঠিত হয়।

অতএব দেখা যাচ্ছে, ফলিত বিজ্ঞানেরও তত্ত্বীয় দিক বর্তমান, এখানে তত্ত্বকে আমরা গ্রহণ করি শুধু জ্ঞান লাভের জন্য নয়, বিশেষ কর্মকে যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য। অন্য দিকে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানেরও ব্যবহারিক দিক বর্তমান। পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যার সিদ্ধান্তকেও বাস্তবে প্রয়োগ করে যাথার্থ যাচাই করে থাকি। রেমণ্ট (*Raymont*) অতি সহজ ভাবে 'বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও ফলিত বিজ্ঞান' এ'দুয়ের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেছেন: "যেখানে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে প্রয়োগ তত্ত্বের জন্য বর্তমান, সেখানে ফলিত বিজ্ঞানে তত্ত্ব প্রয়োগের জন্য বর্তমান।"[১]

1 ..."Whereas in the pure sciences the practice exists for the sake of the theory, in the applied sciences, the theory exists for the sake of practice" Raymont—The Principles of Education—Page 15.

এক্ষণে দেখা যাক্, শিক্ষাতত্ত্বকে কি আমরা 'বিজ্ঞান' বলতে পারি। আর যদি বিজ্ঞান বলা যায় তবে উহা কোন্ ধরনের বিজ্ঞান, বিশুদ্ধ—না ফলিত? শিক্ষাতত্ত্ব 'শিক্ষা' বিষয় সম্বন্ধে আমাদের সুসংহত, প্রণালীবদ্ধ জ্ঞান প্রদান করে, অবধারণ ও পরীক্ষণের উপর তার গবেষণা সীমাবদ্ধ রাখে। সুতরাং শিক্ষাতত্ত্বকে বিজ্ঞান বলে অভিহিত করা যায়। কিন্তু শিক্ষাতত্ত্ব বিশুদ্ধ বিজ্ঞান নয়। শিক্ষাতত্ত্বে কতকগুলি তত্ত্বকে আমরা নিছক জ্ঞান লাভের জন্য অধ্যয়ন করি না —তত্ত্বকে কেবল মাত্র তত্ত্বের খাতিরে গ্রহণ করি না, বাস্তবক্ষেত্রে তত্ত্ব কতটুকু প্রলপ্রসূ তা যাচাই করি। সুতরাং শিক্ষাতত্ত্ব ফলিত বিজ্ঞান। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, শিক্ষাতত্ত্বে তত্ত্বের প্রয়োগ বলতে আমরা কি বুঝি? শিক্ষাতত্ত্বে প্রয়োগ বলতে আমরা বুঝি, বিদ্যালয়ে শিক্ষকের শিক্ষাদান কর্ম, পাঠ্যসূচী, পুস্তক, পরীক্ষা গ্রহণ ইত্যাদি যার দ্বারা শিক্ষার মৌলিক নীতি বা তত্ত্বগুলি শিক্ষাসম্পাদনে সহায়তা করে।

অতএব দেখা যাচ্ছে শিক্ষার মৌলিক নীতিগুলি বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের তত্ত্ব হিসেবে উপস্থাপিত হলেও শিক্ষাতত্ত্ব মূলতঃ ফলিত বিজ্ঞান বা প্রয়োগ বিদ্যা। আমরা শিক্ষাতত্ত্বকে যখন কেবলমাত্র বিজ্ঞান বলে অভিহিত করে থাকি তখন কেবলমাত্র তত্ত্বীয় দিকটির উপর গুরুত্ব দেই বা শিক্ষার মৌলিক নীতিগুলি বুঝি। আর যখন কলা বা প্রয়োগ শাস্ত্র বলে অভিহিত করি তখন তার ব্যবহারিক দিকটি বুঝি। যদিও শিক্ষাতত্ত্ব একটি ফলিত বিজ্ঞান, আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। এ কথা ঠিক, ঐতিহাসিক দিক থেকে মানুষ আগে কর্ম সম্পাদনে ব্রতী হয়েছে, পরে তত্ত্ব আবিষ্কার করেছে, তবুও বলা চলে কর্ম সম্পাদনে তার তত্ত্বগুলিই প্রয়োগ করা হয়েছে যদিও তত্ত্ব সম্বন্ধে সে সচেতন ছিল না। তত্ত্ব এবং প্রয়োগ অংগাংগী ভাবে জড়িত।[1]

২। শিক্ষাদর্শন (Educational Philosophy):

শিক্ষা সম্বন্ধে দর্শন প্রসূত আলোচনার ইতিহাস সুপ্রাচীন। প্রাচীন ভারতীয় বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে পাশ্চাত্য জগতের গ্রীক চিন্তারও

1. Cp. "Sound practice is sound theory unconscious of itself, sound theory is merely sound practice conscious of itself.'
Sidgwick—'The Theory of Classical Education—Page 1.

শিক্ষাদর্শনের আলোচনার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু শিক্ষাদর্শনের আলোচনার পরিধি কখনও সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়নি। শিক্ষাদর্শন কখনও দর্শনের অংগীভূত হয়ে এবং বর্তমানে শিক্ষাতত্ত্বের অংগীভূত হয়ে আলোচিত হয়। বর্তমানে ইংলণ্ড, আমেরিকা, কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে শিক্ষাদর্শন পৃথক বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এ সব দেশে কোথাও দর্শনবিভাগের অংশ হিসেবে শিক্ষাদর্শন বর্তমান, কোথাও বা শিক্ষাদর্শন পৃথক একটি বিভাগ হিসেবে আপন অস্তিত্বের অধিকারী হয়েছে।

শিক্ষাদর্শনের সংজ্ঞা প্রদান সহজ নয়। শিক্ষা বিষয়ক মৌলিক প্রশ্ন বা সমস্যা নিয়ে দর্শন প্রসূত আলোচনাই শিক্ষাদর্শন। এ ব্যাখ্যার দ্বারা শিক্ষাদর্শনের আভিধানিক অর্থই সূচিত হয়। সুতরাং কোন্ ধরনের প্রশ্ন নিয়ে শিক্ষাদর্শনের আলোচনা অগ্রসর হয়, সেগুলি উল্লেখ করলে শিক্ষাদর্শন সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট হতে পারে। এসব প্রশ্নের কয়েকটি উদাহরণ আমরা প্রদান করছি : 'শিক্ষা কি', 'জ্ঞান কাহাকে বলে?' 'মানব চরিত্রকে কি ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়?' 'কোন্ মানদণ্ডে শিক্ষাবিষয়ক অভিমত (educational judgment) গ্রহণ করা যায়?' ইত্যাদি। এসব প্রশ্নের কোনটিই বাস্তব ঘটনা বা তথ্যের দ্বারা মীমাংসা করা যায় না, যদিও ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তথ্যের অবতারণা করা চলে। দার্শনিক যুক্তির উপরই এসব প্রশ্নের সমাধান নির্ভর করে। কারণ, এসব প্রশ্ন বিজ্ঞানের প্রশ্ন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। আমরা যখন প্রশ্ন করি, 'ছাত্রদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার কারণ কি?' 'ছাত্রের শিক্ষাগ্রহণে পুরস্কারের প্রভাব কি?' 'খেলাভিত্তিক শিক্ষার দ্বারা ছাত্রের আগ্রহ কিভাবে সৃষ্টি করা যায়?' ইত্যাদি; তখন এ সব প্রশ্ন অনুমান বা অবধারণের দ্বারা মীমাংসা করা যেতে পারে। কিন্তু দার্শনিক যখন প্রশ্ন করেন 'শিক্ষা কি?' তখন তার পক্ষে 'শিক্ষা' নামক কোন বস্তু অবধারণ বা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়। দার্শনিককে 'শিক্ষা' ব্যাখ্যা করার জন্য কতকগুলি বিশেষ 'প্রত্যয়' (concept) ও ভাষা বিশ্লেষণের (linguistic analysis) সাহায্য নিতে হয়, নানা সংজ্ঞা (definition) নির্দেশ করতে হয়।

শিক্ষাদর্শনের আলোচ্য বিষয়ের পরিধি সাধারণতঃ দুটো দিকে পরিব্যাপ্ত। প্রথমতঃ, শিক্ষাদর্শন শিক্ষা প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে। এ প্রসঙ্গে উহা শিক্ষার উদ্দেশ্য, উপকরণ প্রভৃতি ব্যাখ্যা করে। শিক্ষণ ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের

নানা তথ্য গ্রহণ করে। ইতিহাস ও সমাজ জীবন থেকে নানা উপাত্ত (data) সংগ্রহ করে শিক্ষাদর্শন শিক্ষা কর্ম সূচীসম্বন্ধে একটি তত্ত্বীয় পরিকল্পনা উপস্থাপিত করে। শিক্ষা-দার্শনিক কমেনিয়াস্ (*Comenius*), ফ্রয়েবেল (*Froebel*), হার্বার্ট (*Herbert*) প্রভৃতির শিক্ষা পরিকল্পনায় দার্শনিক চিন্তা প্রসূত শিক্ষাসমস্যার সংগে আমরা পরিচিত হই। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষাদর্শন শিক্ষাতত্ত্বের নানা বিষয়ের সংগে জড়িত। শিক্ষাতত্ত্ব তার বিষয়বস্তু সংব্যাখ্যানে পরিমাপ (measurement), যাথার্থ (validity), বুদ্ধি (intelligence) প্রভৃতি প্রত্যয় গ্রহণ করে থাকে। শিক্ষাদর্শন এসব প্রত্যয়ের বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা প্রত্যয়গুলি সুস্পষ্ট ও সুসংযত করে। তাছাড়া প্রত্যয়গুলির বিশ্লেষণের দ্বারা শিক্ষাদর্শন তাদের যথাযথ মূল্য নির্ধারিত করে থাকে। এ অর্থে শিক্ষাদর্শন শিক্ষা তত্ত্ব বা শিক্ষা বিজ্ঞানের দর্শন। এজন্য ডিউই মনে করেন শিক্ষাতত্ত্ব শিক্ষাদর্শনের ব্যবহারিক শাস্ত্র। মূলতঃ 'দর্শন' ও 'শিক্ষাতত্ত্ব' অভিন্ন।

শিক্ষাদর্শনের আলোচনার ফলে শিক্ষাসম্বন্ধে নানা দার্শনিক মতবাদ সৃষ্টি হয়েছে। স্বভাববাদ (Naturalism), জড়বাদ (Materialism), ভাববাদ (Idealism) প্রভৃতি মতবাদ শিক্ষার অলোচনা প্রসঙ্গে নানা দৃষ্টিভংগী ও তত্ত্বের সৃষ্টি করেছে। শিক্ষা-বিজ্ঞান বা শিক্ষাতত্ত্ব শিক্ষাদর্শনের নিকট শিক্ষার মৌলিক নীতি এবং তত্ত্বের জন্য ঋণী।

৩। শিক্ষার আধুনিক গতি-প্রকৃতি (The modern trends in Education) :

ঊনবিংশ শতাব্দীকে যদি বলা হয় বিজ্ঞানের যুগ তবে বিংশ শতাব্দীকে সামাজিক বিজ্ঞানের যুগ বলে নিঃসন্দেহে অভিহিত করা যেতে পারে। একথা ঠিক সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতেই ব্যক্তি ও পরিবেশ চেতনার যুগ সূচিত হয়, তবুও তার পূর্ণ ফলশ্রুতি বিংশ শতাব্দীতেই দেখা দেয়। কারণ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ঐশ্বর্য সম্ভার মানুষের মনকে ঊনবিংশ শতাব্দী অবধি পরিপূর্ণ অধিকার করেছিল। তাছাড়া ব্যক্তির জীবনে ও সামাজিক পরিবর্তনে বিজ্ঞানের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্টভাবে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে অনুভূত হতে থাকে।

প্রতিটি যুগ তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের দ্বারা তার সমস্যাগুলিকে বিচার করে— আর তার অর্জিত জ্ঞান সম্ভার, পরিবর্তনশীল পরিবেশ প্রতিটি যুগকে তার

নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রদান করে। বিংশ শতাব্দীতে এসে এজন্য শিক্ষাকেও আমরা আমাদের অর্জিত জ্ঞানের আলোকে নতুন ভাবে বিবেচনা করতে, প্রয়োগ করতে শিখেছি। এর ফলে শিক্ষার এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এবং লক্ষণ আজ আমাদের চোখে ধরা পড়েছে যা গতানুগতিক শিক্ষায় আমরা ভাবতে পারিনি। আমরা এক্ষণে শিক্ষার আধুনিক গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করার প্রস্তাব করছি।

প্রথমতঃ, আধুনিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হল শিশুকেন্দ্রিকতা (paedo-centricism)। গতানুগতিক শিক্ষায় শিক্ষার বিষয়বস্তুর উপরই গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষার সকল আয়োজন সীমিত করা হত। শিক্ষক ছিলেন দাতা, শিক্ষার্থী ছিল গ্রহীতা। শিশু বা শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট কতকগুলি ভাবধারায় বুদ্ধি চর্চা করান ছিল সেদিনকার শিক্ষার তাৎপর্য। শিশু মনের স্বাতন্ত্র্য, চাহিদা, সমস্যা ইত্যাদি গতানুগতিক শিক্ষায় ছিল অবিবেচিত। জীববিদ্যা ও মনোবিজ্ঞানের অভ্যুদয় এবং নিরন্তর গবেষণার ফলে দেখা গেল অভিব্যক্তি (evolution) এবং গতিশীলতা (dynamism) প্রাণীর ধর্ম। জীববিদ্যা দেখাল যে বহু বিচিত্রধারায় প্রাণের বিবর্তন চলছে আর পরিবর্তনের সঙ্গে অভিযোজন (adjustment) না হলে প্রাণী জীবনসংগ্রামে (struggle for existence) পরাস্ত হবে, পরিণামে তার বিলোপ অবশ্যসম্ভাবী। অন্যদিকে মনোবিজ্ঞান প্রমাণ করল যে প্রতিটি ব্যক্তি আপন চাহিদা, আবেগ, অনুরাগ, সামর্থ্য ও সম্ভাবনায় প্রতিটি ব্যক্তি থেকে বিভিন্ন। ব্যক্তি বৈষম্য (individual differentiation) নীতি অনুসারে প্রতিটি শিশুর মনকে বিচার করা চাই। নিছক বুদ্ধি চর্চাই জ্ঞান নয়। কোন মনই স্থাণু হয়ে বসে নেই, সে চির চঞ্চল। গতিশীল বিবর্তনশীল, মনের ধর্মকে কেন্দ্র করেই শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন। আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার এ হল প্রধান বক্তব্য। শিক্ষা হল শিশুর জীবনের সকল সম্ভাবনার সর্বাংগীণ বিকাশ।

শিক্ষার এই আধুনিক সংজ্ঞা সূচিত হবার ফলে প্রাচীন শিক্ষাকে সংকীর্ণ শিক্ষা বা নিছক জ্ঞান প্রদান (instruction) বলা হয়। ফলে শিক্ষকের কর্তব্য, শিক্ষাদান পদ্ধতি, পাঠ্যসূচী প্রণয়ন প্রভৃতিতে এসেছে যুগান্তকারী পরিবর্তন। শিক্ষক আজ আর শিশুকে সামাজিক চাহিদা অনুসারে গঠন করেন না, তিনি ব্যক্তিত্ব উন্মোচনের সহায়ক বা তত্ত্বাবধায়ক। বক্তৃতা দান বা পাঠ মুখস্থ করান আজ আর স্বীকৃত শিক্ষা পদ্ধতি নয়। নানা কর্মকেন্দ্রিক

পদ্ধতি, খেলাভিত্তিক পদ্ধতি প্রভৃতির মাধ্যমে শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত মানসিক ও দৈহিক বিকাশ সাধন করাই আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির লক্ষ্য। পাঠ্যসূচী আজ আর নিছক বুদ্ধি চর্চার জন্য প্রণীত হয় না। শিশুর মানসিক ধর্মকে, তার ব্যক্তিত্বকে স্বীকার করে, তার গ্রহণ ক্ষমতা, আগ্রহ, চাহিদা, প্রবণতা ইত্যাদিকে বিচার করে পাঠ্যসূচী গঠিত হয়। আধুনিক শিক্ষায় শিশুকে এই অভূতপূর্ব গুরুত্ব দেওয়া হয় বলে বিংশ শতাব্দীকে শিশু-শতাব্দী (child-century) বলা হয়।

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার আধুনিক বৈশিষ্ট্য হল—শিক্ষা একটি সামাজিক শক্তি (social force)। সামাজিক পরিবর্তন ও প্রগতিতে শিক্ষা আজ অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। শিক্ষার মাধ্যমে শুধু সঞ্চিত ভাবধারার সঙ্গে পরিচিতি ঘটান আজ আর লক্ষ্য নয়। সামাজিক নবীকরণ (modernization) ও প্রগতির উপকরণ হল শিক্ষা। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক্, আমরা আমাদের দেশকে অর্থনৈতিক উন্নতিতে অগ্রসর করতে চাই। এ সম্ভব হবে একমাত্র বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী শিক্ষা প্রসারের দ্বারা। দেশকে খাদ্যসংস্থানে স্বনির্ভর করা কখনই সম্ভব হবে না যতক্ষণ কৃষক মান্ধাতার আমলের গোড়ামি পরিত্যাগ করে বিজ্ঞান্-ভিত্তিক চাষবাসে এগিয়ে না আসে, কৃষিকার্যে নতুন নতুন পরীক্ষণে আগ্রহ প্রকাশ না করে। আর এ সম্ভব একমাত্র শিক্ষার দ্বারা। সামাজিক শক্তি হিসেবে বর্তমানে শিক্ষাকে যখন গণ্য করা হয়, তখন দেখা যায় শিক্ষা মানব-অস্তিত্ব ও প্রগতির শর্ত। মানবজাতি এদিক থেকে অনন্য যে, সে তার নিজের জীবনের পরিধি-বিস্তার নিজেই সৃষ্টি করে—সে প্রতীকধর্মী, সে প্রতীকের (symbol) জগতে বাস করে, ভাষা, সংখ্যা, সংকেত, তত্ত্ব সে নিজেই সৃষ্টি করে। আর শিক্ষার দ্বারা আপামর জনমানবকে তার সভ্যতার অপরিহার্য প্রতীকগুলি ব্যবহারে অভ্যস্ত করান হয়।[1] গতানুগতিক শিক্ষা সামাজিক শক্তি হিসেবে গণ্য হতনা। শিক্ষা ছিল সেদিন বুদ্ধিচর্চার নামান্তর।

তৃতীয়তঃ, আধুনিক শিক্ষা উৎপাদনশীলতামুখী (productivity-oriented)। শিক্ষাকে বর্তমানে একটি বিশেষ ক্ষমতার্জনের এবং

1. Human kind is unique in that it can construct its own dimensions of life. It lives in an world of symbols, which it has created itself: language, number, formulae. Education is the greatest instrument for training human beings in the use of symbols basic to their survival and progress. Ed. Arthur H. Moehlmon—Comparative Education (Introduction.)

উৎপাদনশীলতার পরিপূরক হিসেবে গণ্য করা হয়। একজন দক্ষ শ্রমিক ও অদক্ষ শ্রমিকের পার্থক্য কেন? তার কারণ, দক্ষ শ্রমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত। বিজ্ঞান ও যন্ত্র সভ্যতার যুগে শিক্ষাই উৎপাদন ও সুদক্ষ কর্মক্ষমতা অর্জনের একটি শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। গতানুগতিক সমাজ ও আধুনিক সমাজের মধ্যে একটি প্রধান পার্থক্য হল আধুনিক সমাজে বিজ্ঞানভিত্তিক কারিগরী ব্যবস্থার ব্যবহার ও প্রগতি যা গতানুগতিক সমাজে অনুপস্থিত। গতানুগতিক সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থা, ব্যবহারিক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, চেষ্টা ও ত্রুটি (trial-and-error) পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আধুনিক বিজ্ঞান ও যন্ত্রসভ্যতা শিক্ষার গতি প্রকৃতিতে তাই এ নতুন পরিবর্তন এনেছে।

চতুর্থতঃ, শিক্ষা বিজ্ঞানভিত্তিক হবার ফলে শিক্ষা জীবন-কেন্দ্রিক (life centred)। জীবনে কয়েকটি নির্দিষ্ট বছর ধরে নির্দিষ্ট বিষয় অধ্যয়ন শিক্ষা নয়। ডিউইর ভাষায় শিক্ষাই জীবন। এজন্য আজ গৃহ ও বিদ্যালয়, বিদ্যালয় ও সমাজ এদের মধ্যে নিবিড় যোগসূত্র গড়ে উঠেছে। আজ শিক্ষায় সমাজতাত্ত্বিক, রাজনৈতিক বহু চাহিদা এসে জড় হয়েছে। কারণ শিক্ষা যদি জীবনযাপনের প্রস্তুতি হয় তবে ব্যক্তির সংগে সমাজের সংযোগ থাকা চাই। তাকে সুনাগরিক হয়ে সামাজিক মংগলে অংশ গ্রহণ করা চাই।

পঞ্চমতঃ, আধুনিক শিক্ষা হল সার্বিক (universal), আধুনিক শিক্ষার জনক রুশো (*Rousseau*) ঘোষণা করেছিলেন, শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার। শিক্ষার গুণগত দিকের সঙ্গে শিক্ষার সংখ্যাগত দিকটিও আজ মুখ্য হয়ে উঠেছে যা গতানুগতিক শিক্ষায় অবিবেচিত ছিল। এজন্য আজ শিক্ষা সকলের জন্য, এ নীতি সর্বজন স্বীকৃত। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রগতিশীল দেশগুলিতে বাধ্যতামূলক—আমাদের দেশেও প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হতে চলেছে।

ষষ্ঠতঃ, আধুনিক শিক্ষা সারগ্রাহী (eclectic)। আধুনিক শিক্ষা ভাববাদ (Idealism), স্বভাববাদ (Nationalism), প্রয়োগবাদ (Pragmatism), সমাজতত্ত্ব, রাজনীতিবিজ্ঞান, ইতিহাস, বিজ্ঞান সকল মতবাদ ও স্তর থেকে যা কিছু গ্রহণীয় তা গ্রহণ করে এবং সর্বতোমুখী এক জীবনের সন্ধান দেয়। সকল বিষয়ের 'সার' গ্রহণ করে বলে আধুনিক শিক্ষাকে সারগ্রাহী বলে আখ্যা দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিক্ষার সংজ্ঞা, পরিধি ও কাজ

(Definition, Scope and Function of Education)

১। শিক্ষার সংজ্ঞা নির্দেশ (Definition of Education) :

'শিক্ষা' শব্দের আভিধানিক অর্থ যদি আলোচনা করি তবে শিক্ষার অর্থ দাঁড়ায় 'যাহা অন্তর্নিহিত গুণাবলী বাহিরে প্রকাশ করে।' 'শিক্ষা' পদের ইংরেজী প্রতিশব্দ 'education' পদটি ল্যাটিন 'e' অর্থাৎ out বা ভেতর থেকে বাহির এবং duco অর্থাৎ lead বা পরিচালিত করা ; এ দুই শব্দের মিলনে গঠিত। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগত অর্থে শিক্ষা হল অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ সাধন। অর্থাৎ শিক্ষায় ব্যক্তির সুপ্ত ক্ষমতার উন্মোচন করা হয়, নতুন কিছুই শিক্ষার দ্বারা সৃষ্ট হয় না। ব্যক্তির অন্তরে যে সম্ভাবনা শক্তি ও প্রবৃত্তি অব্যক্ত অবস্থায় আছে, সেগুলি ব্যক্ত করা। এ প্রসংগে একটি কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, ব্যক্তির যে কোন সম্ভাবনা বা প্রবৃত্তির বিকাশসাধন আমরা কামনা করি না। যা সমাজ অভিপ্রেত নয়, সামাজিক মংগলের যা সহায়ক নয় তার বিকাশ সাধন সর্বতোভাবে পরিত্যজ্য। মানুষের কুপ্রবৃত্তির বিকাশ সাধনের পরিবর্তে শিক্ষায় তার নিয়ন্ত্রণ আমরা কামনা করি।[1]

২। শিক্ষার সংকীর্ণ ও ব্যাপক অর্থ (Narrow and wide meaning of Education) :

জন্মাবধি মানুষ শিক্ষালাভ করে আসছে। যে অবিচ্ছিন্ন, অবারিত অভিজ্ঞতার সমারোহ ব্যক্তির জীবনে চলছে তা থেকে সে ইচ্ছায়, অনিচ্ছায়,

1. তুলনায় "I may not be very good gardener, but if I knew that a plant was likely to send up poison shoots as well as flowers I shou'd hold my self ready to restrict its growth very fiercely................. Can these educators not see that the self is an uneasy combination of possiole god, actual man and very real beast ? If the beast is left unchained, what environment will save the man or give the god a chance of emerging ?"
Urwick—The Social Good.—Page 202.

গান্ধীজীর বক্তব্য : "By education I mean an all round drawing out the best in the child and man.

কোন পূর্ব-পরিকল্পনা সহকারে বা কোন পূর্ব-পরিকল্পনা ছাড়া শিক্ষা গ্রহণ করছে। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা জীবনের বহুমুখী অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান বোঝায়—এতে কোন পরিকল্পনা বা সচেতন ইচ্ছার প্রাধান্য নেই। কিন্তু সভ্য সমাজে শিক্ষার কেবলমাত্র ব্যাপক অর্থই গৃহীত হয় না। নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও প্রয়োজন অনুসারেও অভিজ্ঞতা নির্বাচন করে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি। এ হল শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থ। এক্ষণে এ দুই অর্থ আমরা একটু বিস্তারিত আলোচনা করছি।

(ক) **শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থ (Narrow meaning of Education) :** আদিমকালে মানুষ জীবন সংগ্রামের প্রস্তুতির জন্য যে তথ্য আহরণ করত বা যে সব কৌশল আয়ত্ত করত তাকেই বলা হ'ত শিক্ষা। কিভাবে রান্নাবান্না করতে হয়, কিভাবে মাঠে চাষ করতে হয়, সামাজিক ও নৈসর্গিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়—এ সব অভিজ্ঞতা তারা বয়স্কদের কাছ থেকে শিখত। সমাজ ও সভ্যতার বিবর্তনের ফলে এই অভিজ্ঞতা ও কৌশল অর্জনের ধারার পরিবর্তন হয়। শিক্ষাদানের জন্য সৃষ্টি হয় শিক্ষায়তনের ও শিক্ষকের। শিক্ষার বিষয়বস্তুরূপে নানা শাস্ত্রের সৃষ্টি হয়—কৃষিবিদ্যা, নৌবিদ্যা, চিকিৎসা শাস্ত্র, বিজ্ঞানের নানা শাখা প্রশাখা ইত্যাদি। শিক্ষায়তনে সমবেত হয়ে শিক্ষকদের কাছ থেকে এসব বিভিন্ন বিষয়ের কৌশল বা অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীরা অর্জন করে।

শিক্ষার এ ব্যাখ্যা হল শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থ। ইংরেজীতে অনেক সময় শিক্ষার এ অর্থকে ইনস্ট্রাকৃসন্ (instruction) বলে। সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমান।

প্রথমতঃ, শিক্ষাকে সংকীর্ণ অর্থে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনে পারদর্শী করার চেষ্টা করা হয়। দৈনন্দিন জীবনে অর্থাৎ লৌকিক অর্থে এবং আইনের ভাষায় যখন আমরা 'শিক্ষা' শব্দের ব্যবহার করি, তখন ব্যক্তির আত্মচর্চা বা তার উপর তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার কোন প্রভাব বুঝি না। সমাজের বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা অপ্রাপ্তবয়স্ক অর্থাৎ শিশুদের উপর সচেতন ভাবে যে প্রভাব বিস্তার করে থাকে সংকীর্ণ বা লৌকিক অর্থে তাহাই শিক্ষা। অর্থাৎ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষকের সহায়তায় বিশেষ পাঠ্যসূচী অনুসারে অধ্যয়ন ও তার অনুশীলনই শিক্ষা।

দ্বিতীয়তঃ, সংকীর্ণ বা লৌকিক শিক্ষার একটি সামাজিক স্বীকৃতি আছে। পরীক্ষা-পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষার্থীর শিক্ষা অর্জন কতটুকু হয়েছে তা মেপে নেবার প্রয়াস আমরা পাই। ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট প্রদানের দ্বারা সমাজ শিক্ষার্থীর শিক্ষাগ্রহণের প্রচেষ্টার স্বীকৃতি দেয়।

তৃতীয়তঃ, এ শিক্ষার পাঠ্যসূচী সমাজের অভিভাবক এবং শিক্ষা পরিচালকগণই নির্ধারিত করেন। তাদের বিবেচিত বিষয়গুলিই অর্থাৎ তারা যা বিবেচিত বলে মনে করেন, শিক্ষার্থীকে তা গ্রহণ করতে হয়। শিক্ষার্থী এখানে নিষ্ক্রিয়, সে সক্রিয় নয়। শিক্ষার্থীর নিজস্ব কোন চাহিদার মূল্য এ শিক্ষায় স্বীকৃত হয় না। পূর্বপুরুষদের অভিজ্ঞতা ও সংস্কৃতির সংগে পরিচিতি ঘটানই এ শিক্ষার উদ্দেশ্য। শিক্ষক সেখানে পরিবেশক মাত্র।

চতুর্থতঃ, সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা প্রয়োজনমাফিক (Utilitarian)। প্রয়োজনের তাগিদে রুটি রোজগারের জন্য আমরা নানারকম বৃত্তি (vocation) আয়ত্ত করি ; কলাবিদ্যা, বিজ্ঞান, কারিগরী বা ব্যবসা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করি। কোন ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ (specialised) হওয়াই এ অর্থে শিক্ষা। কিন্তু এর ফলে সামগ্রিক, দৃষ্টিভংগী থেকে আমরা বঞ্চিত হই। চেষ্টিতবাদ (Faculty Theory) আমাদের মনকে কতকগুলি পর্যায়ে ভাগ করে এবং প্রত্যেকের আলাদাভাবে চর্চা করাই শ্রেয় মনে করে। সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা এই চেষ্টিতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষাদ্বারা আমাদের অনুভূতি, বিচারশক্তি ও ইচ্ছাশক্তিকে আলাদাভাবে চর্চা করব। কিন্তু এই লৌকিক বা সংকীর্ণ শিক্ষায় আমাদের ব্যক্তিসত্তার সামগ্রিক রূপ আমরা পাই না।

(খ) শিক্ষার ব্যাপক বা বিজ্ঞানসম্মত অর্থ (Wide or Scientific meaning of Education) : আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বে শিক্ষার অর্থকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী থেকে বিচার করা হয়। শিক্ষাকে লৌকিক বা সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ না করে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা হয়।

ব্যাপক অর্থে শিক্ষা যে-কোন নতুন অভিজ্ঞতা আহরণ বোঝায়। রেমণ্ট (*Raymont*) তাঁর Principles of Education বইতে শিক্ষার ব্যাপক অর্থ প্রসংগে বলেছেন, শিক্ষা হল মানুষের শৈশব থেকে পরিপক্কতার স্তর অবধি একটি বিকাশের পদ্ধতি। এ প্রক্রিয়ার সাহায্যে মানুষ নিজেকে ধীরে

ধীরে তার শারীরিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক পরিবেশের সংগে খাপ খাইয়ে নেয়। হর্নী (*Horne*) এ অর্থকে অন্যভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, শিক্ষা মানুষকে একটি উন্নত ধরনের উপযোজন বা সংগতিবিধানের ক্ষমতা এনে দেয়। দেহে ও মনে এই সংগতিসাধনের ক্ষমতা নিয়ে মানুষ তার বুদ্ধিগত বা অনুভূতিপ্রবণ পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেয়।

ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) তাঁর Outlines of Social Philosophy বইতে শিক্ষার সংজ্ঞাকে সংকীর্ণ অর্থে ও ব্যাপক অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা হল এমন একটি প্রক্রিয়া যা আমাদের সমগ্র জীবন ধরে চলতে থাকে এবং জীবনের সবরকম অভিজ্ঞতাই এই শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে সহায়তা করতে পারে। তিনি বলেন, 'এই অর্থে এটি হল সাধারণ প্রক্রিয়া যার দ্বারা আমাদের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয় এবং যার দ্বারা মানুষ তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও যে বিশ্বে তারা বসবাস করে তার সংগে তাদের সম্পর্ককে উপলব্ধি করতে পারে।' শিক্ষার এই ব্যাপক অর্থকেই ব্যাখ্যা করে হোয়াইটহেড (*Whitehead*) বলেছেন, 'শিক্ষার একটিমাত্র বিষয় আছে এবং তা হল সর্বতোভাবে প্রকাশিত জীবন।'

সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ম্যাকেঞ্জি বলেন, 'সংকীর্ণ অর্থে একে মনে করা যেতে পারে আমাদের ক্ষমতাকে বিকশিত ও অনুশীলন করার জন্য সচেতনভাবে পরিচালিত যে কোন প্রচেষ্টা।' এই অর্থে উপযুক্ত শিক্ষাবিদের দ্বারা নির্ধারিত একটি শিক্ষাব্যবস্থা থাকবে এবং শিক্ষকের সহায়তায় এই শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষ ধাপে ধাপে ও স্তরে স্তরে শিক্ষিত হবে।

ব্যাপক অর্থে শিক্ষার যে সংজ্ঞা প্রদত্ত হল সে শিক্ষার অধিকাংশই মানুষ নিজের অজ্ঞাতসারে লাভ করে। জীবনের বিভিন্ন সমস্যা, প্রকৃতির প্রভাব ও প্রেরণা, মানুষের সংগে মেলামেশা, জীবনের সুযোগ ও সাফল্য, ব্যর্থতা ও দুর্ভোগ থেকে মানুষ নিয়ত এ শিক্ষালাভ করে। সংকীর্ণ অর্থে যে শিক্ষা, সে শিক্ষা মানুষ সচেতন ভাবেই গ্রহণ করে। রেমণ্ট (*Raymont*) বলেন, সাধারণ কথাবার্তায় এবং আইনের ভাষায় আমরা সংকীর্ণ অর্থেই শিক্ষাকে গ্রহণ করি। এ অর্থে শিক্ষার দ্বারা আমরা পরিবেশের উপর ব্যক্তির কী প্রভাব

বা ব্যক্তির আত্মোপলব্ধি এসব কিছুই বুঝি না। আমরা বুঝি কতকগুলি প্রভাব (**Influences**) যা সমাজের প্রাপ্তবয়স্করা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এবং সচেতন ভাবে শিশুদের উপর প্রয়োগ করতে চান। এই সংকীর্ণ অর্থ বোঝাতে গিয়েই ডিউই (*Dewey*) 'ইচ্ছামূলক শিক্ষা' (**Intentional Education**) কথাটি ব্যবহার করেছেন। সাধারণতঃ সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা বলতে বোঝায় রাষ্ট্র, পরিবার বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন সংগঠনের বা ব্যবস্থার মাধ্যমে (কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যসাধনের জন্য) তরুণদের ক্ষমতা বিকশিত করার ব্যবস্থা।

ব্যাপক অর্থে শিক্ষার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ

প্রথমতঃ, শিক্ষা ও জীবন সমার্থক। আধুনিক মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান বলে, জন্মের সময় থেকে শিশুর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অভিজ্ঞতাময়। শিক্ষার শুরু জন্ম থেকেই আর শেষ মৃত্যুতে। শিক্ষা জীবনব্যাপী এক অন্তহীন ও বিরামহীন একটি প্রক্রিয়া।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যাপক অর্থে শিক্ষার পরিধি বিদ্যালয়েই সীমাবদ্ধ নয়, তার বিস্তার জীবনের সবস্তরে প্রসারিত। সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষাকে গ্রহণ করলে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বলে মানুষের দুটি শ্রেণী আমরা ভাগ করতে পারি। কিন্তু ব্যাপক অর্থে এ ধরনের কোন ভেদ মানুষের মধ্যে নেই, কেননা অভিজ্ঞতা নেই এ ধরনের মানুষও নেই। অক্ষর জ্ঞান না থাকলেও শিক্ষিত হতে দোষ নেই। অভিজ্ঞতার অভিনবত্বই শিক্ষা। নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সঞ্চয় প্রতিনিয়তই আমাদের হচ্ছে। এটাই শিক্ষা।

তৃতীয়তঃ, যেহেতু অভিজ্ঞতাই শিক্ষা সেহেতু আমাদের আচরণের উপর অভিজ্ঞতার প্রভাব এ শিক্ষার আর একটি বৈশিষ্ট্য। অভিজ্ঞতা যখন আমাদের আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে বা তার পরিবর্তন ঘটায় তখনই অভিজ্ঞতা শিক্ষা-পদবাচ্য। শিক্ষা তথ্য আহরণেই সীমাবদ্ধ নয়। তথ্যকে বাস্তব আচরণে প্রয়োগ করতে হয় এবং তখনই তথ্য সংগ্রহ বা অভিজ্ঞতা অর্থময় হয়। যে শিক্ষা জীবনের কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না, যে শিক্ষা বাস্তবধর্মী নয়, সে শিক্ষা শিক্ষা-পদবাচ্যও নয়।

৩। নির্দিষ্ট শিক্ষা বা ইনস্ট্রাক্‌সন্‌ (Instruction) :

শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থকে নির্দিষ্ট, নির্বাচিত শিক্ষা বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচীকে কেন্দ্র করে নির্বাচিত বিষয় সম্বন্ধে যখন জ্ঞান প্রদান করা হয় তখন তাকে আমরা 'ইনস্ট্রাক্‌সন' বলি। একথা ঠিক যে নির্দিষ্ট বিষয়ের শিক্ষা দ্বারা শিক্ষার্থীর জীবনের সামগ্রিক বিকাশ সাধন সম্ভব নয়। শিক্ষা নির্বাচিত বিষয়াবলীর জ্ঞান অর্জনের চাইতে অনেক ব্যাপক ও গভীর। কিন্তু তবুও শিক্ষা ব্যবস্থায় ইন্‌স্ট্রাক্‌সন গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এজন্য আমরা ইন্‌স্ট্রাক্‌সন সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন বোধ করি। 'ইন্‌স্ট্রাক্‌সনের' যদিও সঠিক বাংলা প্রতিশব্দ আমাদের জানা নেই, তবু নির্দিষ্ট বা নির্বাচিত শিক্ষা এ অর্থে আমরা ব্যবহার করছি।

নির্বাচিত শিক্ষার সংজ্ঞা প্রদান দুরূহ ব্যবহার। প্রাচীন খ্রীষ্ট-যুগের শুরুতে দেখি, খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক বিষয়ে শিক্ষণ প্রদানকে ইন্‌স্ট্রাক্‌সন বলা হত। তারপর শিক্ষা ব্যবস্থার সংগে জড়িত হয়ে যখন ইন্‌স্ট্রাক্‌সন শুরু হল তখন কেবলমাত্র খ্রীষ্টধর্মের ভাবরাশি সম্বন্ধে জ্ঞানপ্রদান না বুঝিয়ে শিক্ষার্থীকে যে কোন জ্ঞান প্রদান বা নৈপুণ্য শেখান অর্থেও এ শব্দ প্রযোজ্য হতে লাগল।

আধুনিক অভিধানে শিক্ষা প্রদান (teaching) ও ইন্‌স্ট্রাক্‌সনকে একার্থ-বাচক পদ বলে গ্রহণ করা হয় অর্থাৎ শিক্ষা প্রদানও নির্দিষ্ট, আর নির্বাচিত শিক্ষা একই অর্থবাহী। নির্দিষ্ট শিক্ষা পদ্ধতি (method) অনুসারে শিক্ষার্থীকে জ্ঞান, সংবাদ বা নৈপুণ্য প্রদান করাই হল শিক্ষাদান কার্য বা নির্দিষ্ট শিক্ষার অর্থ। তবে শিক্ষাদান কার্যকে বিশ্লেষণ করলে নির্দিষ্ট শিক্ষার সংগে কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্য ধরা পড়ে। নিম্নে তা' আলোচনা করছি :

শিক্ষাদানকে যদি আমরা একটি উদ্দেশ্যমূলক কর্ম হিসেবে ধরি তবে শিক্ষা-দান কার্যকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তার মধ্যে তিনটি দিক (aspect) বর্তমান। প্রথমতঃ, শিক্ষাদানের জন্য পূর্ব নির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা উদ্দেশ্য বর্তমান, দ্বিতীয়তঃ, পরিকল্পনা বা উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করার উপায় বা কর্মপন্থা বর্তমান। তৃতীয়তঃ, নির্দিষ্ট পরিকল্পনা কর্মপন্থার দ্বারা বাস্তবে কতটুকু রূপায়িত হল তার একটি বিচার বা পরীক্ষা বর্তমান। শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার এ বিশ্লেষণ গ্রহণ করলে প্রথম স্তরকে আমরা পাঠ্যসূচী (curriculum) আখ্যা দিতে পারি—অতএব দেখা যাচ্ছে, শিক্ষাদান কার্যে পাঠ্যসূচী প্রথমতঃ পরিকল্পিত

হওয়া চাই। দ্বিতীয় স্তরকে আমরা ইনস্ট্রাকসন বা নির্দিষ্ট শিক্ষাকার্য বলতে পারি। এদিক থেকে বিবেচনা করলে পাঠ্যসূচীকে বাস্তবে প্রয়োগ করার উপায় বা পন্থা হল ইনস্ট্রাকসন বা নির্দিষ্ট শিক্ষা। তৃতীয় স্তরকে পরীক্ষা (evaluation) বলা যেতে পারে। অবশ্য এ তিনটি স্তর একত্র বিদ্যমান ; বাস্তবে এগুলির পৃথকীকরণ সম্ভব নয়।

নির্দিষ্ট শিক্ষাকার্য প্রক্রিয়ার স্বরূপ সম্বন্ধে সাধারণতঃ দুটি মত দেখা যায়। একদল বিশ্বাস করেন, শিক্ষাদান ক্রিয়া একটি বিজ্ঞান। সুতরাং শিক্ষাদানে ক্রিয়ায় বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী এবং বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলী প্রয়োগ করা উচিত। যদিও এদল শিক্ষাদান কার্যে বৈচিত্র্য বা বিভিন্ন পদ্ধতি অস্বীকার করেন না, তবুও তারা শিক্ষা পদ্ধতিতে একরূপতায় (uniformity) বিশ্বাসী। অন্য দল বিশ্বাস করেন, শিক্ষাদান পদ্ধতি একটি সৃজনশীল কলা বা প্রয়োগবিদ্যা। যদিও এদল শিক্ষাপদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলীকে অস্বীকার করেন না, তারা শিক্ষাপদ্ধতিকে কলা হিসেবেই গুরুত্ব দেন বেশী। তারা মনে করেন, শিক্ষক স্বতঃস্ফূর্তভাবে নানা পদ্ধতি সৃষ্টির মাধ্যমে স্বাধীনভাবে শিক্ষা দেবেন। বাঁধাধরা নিয়মে শিক্ষা-দান নীরস, প্রাণহীন যান্ত্রিক কাজে পর্যবসিত হবে।

ইনস্ট্রাকসন বা নির্দিষ্ট শিক্ষার কাজ কি? প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে শিক্ষণে দক্ষতাবৃদ্ধি ও শিক্ষণের উপকরণ প্রয়োগে নৈপুণ্য অর্জন করা। দ্বিতীয়তঃ, ঐতিহাসিক দিক থেকে নির্দিষ্ট শিক্ষার আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হল মানব-জাতির সঞ্চিত জ্ঞান ও জাতির সংস্কৃতির সঙ্গে শিক্ষার্থীর যোগসূত্র সৃষ্টি করা। মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় না ঘটিয়ে দিলে অতীতের সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদ ঘটে যাবে। তৃতীয়তঃ, নির্দিষ্ট শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীর আচরণে অভিপ্রেত পরিবর্তন আনয়ন করতে পারেন। শিক্ষকের শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার ফলে শিক্ষার্থী অনুসন্ধিৎসু, স্বাধীনচেতা, সৃজনশীল হয়ে উঠতে পারে।

৪। শিক্ষা ও শিক্ষণ (Education and Learning):

শিক্ষা প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে আচরণের পরিবর্তন যদি অবাঞ্ছিত হয়, তবে সে পরিবর্তন শিক্ষা নয়। সাধারণ ভাবে বলা হয়, যে অভিজ্ঞতা আমাদের আচরণে পরিবর্তন আনতে সক্ষম সে অভিজ্ঞতাই শিক্ষা। কিন্তু সে পরিবর্তন

কতকগুলি চাহিদা ও নিয়ন্ত্রণ থাকা চাই। শিশুর নিজস্ব চাহিদা ও সম্ভাবনার বিকাশ তখনই সম্ভব যখন শিশু সামাজিক চাহিদা ও নিয়ন্ত্রণের সংগে সংগতি সাধন করে। যে শক্তির দ্বারা ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক পরিবেশের সংগে খাপ খাইয়ে নেয়—সে-শক্তির সঞ্চারকই শিক্ষা। শিক্ষাকে যখন ডিউই আমাদের জীবনের ক্রমবিকাশ পদ্ধতির সংগে অভিন্ন বলে বর্ণনা করেছেন তখন তিনি মানবজীবনের দুটি মৌলিক দিকের মধ্যে সংহতি এনেছেন এবং যুগপৎ এ দুয়েরই ক্রমবিকাশের কথা বলেছেন। এ ক্রমবিকাশের ধারা সম্বন্ধে ডিউই বলেছেন, এ প্রক্রিয়াটি হবে স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত, স্বনির্ভর। এ প্রক্রিয়া শিশুর উপর চেপে দেওয়ার ব্যাপার নয়। শিশু যে সম্ভাবনা নিয়ে জন্মায় স্বতঃপ্রণোদিত ধারায় তার বিকাশ সে অন্বেষণ করে।

শিশু তার সম্ভাবনার সুষ্ঠু পরিণতি সমাজ জীবনেই লাভ করার চেষ্টা করে। সামাজিক পরিবেশ ছাড়া শিশুর শিক্ষা সম্ভব নয়। এখানে সামাজিক পরিবেশ বলতে সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির, সম্প্রদায়ের, সংগঠনের বা প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও সম্পর্ক বোঝায়। শিক্ষা সমাজ বহির্ভূত ব্যাপার নয়। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা শুধু জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া নয়, তা সামাজিকও।

৬। শিক্ষা একটি সক্রিয় পদ্ধতি (Education is an Active Process) :

সংকীর্ণ অর্থে নিছক জ্ঞান অর্জনকে বলা হয় শিক্ষা এবং তাই ছিল প্রচীন শিক্ষার সংজ্ঞা। সে জ্ঞান সুনির্দিষ্ট এবং অপরিবর্তনীয়। বছরের পর বছর একই ভাবধারা বিতরণকে বলা হত শিক্ষা দান। শিক্ষার্থীর কোন চাহিদা সে শিক্ষায় স্বীকৃত হত না। শিক্ষার্থী সেখানে নিষ্ক্রিয়।

কিন্তু আধুনিক শিক্ষার সংজ্ঞা হল, শিক্ষা একটি সক্রিয় পদ্ধতি। অ্যাডাম্স (*Adams*) এ প্রসংগে বলেন, শিক্ষা শুধু সজ্ঞান (conscious) পদ্ধতি নয়, তা ইচ্ছাকৃত (deliberate) পদ্ধতিও। শিক্ষা একটি উভয়-মুখী (bi-polar) প্রক্রিয়া, শিক্ষা একমুখী প্রক্রিয়া নয়। এখানে শিক্ষার্থীর উপর শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ক্রিয়াশীল, অপর পক্ষে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব শিক্ষকের উপর ক্রিয়াশীল। শিক্ষকের প্রভাব যেমন শিক্ষার্থীর উপর কাজ করে, শিক্ষার্থীর প্রভাবও তেমনি

শিক্ষকের উপর কাজ করে। শিক্ষক শিক্ষার্থীর মনে জ্ঞানের বিভিন্ন উপাদান উপস্থিত করে তার অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভংগীর উপর পরিবর্তন আনেন। অন্যদিকে শিক্ষার্থীর চাহিদা ও সমস্যা শিক্ষকের মনে প্রভাব বিস্তার করে তার শিক্ষাদান পদ্ধতিকে প্রভাবিত করে।

আসল কথা নিছক জ্ঞান অর্জনের সংগে বাস্তব জগতের অভিজ্ঞতার কোন সম্পর্ক থাকে না। শিক্ষার্থী নিষ্ক্রিয় জড়ের মত অপরের প্রভাবকে মেনে নেয় না। সে যা গ্রহণ করে তার উপর নিজের প্রভাবও ফেলে এবং তা বাস্তবেও প্রয়োগ করে। প্রয়োজন মত সে অর্জিত অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানের পরিবর্তন ও পরিবর্ধনও করে। তারপর সে তাকে গ্রহণ করে। যে জ্ঞানের সংগে বাস্তবের সম্পর্ক নেই, তা নিষ্ক্রিয়। ডিউই তাঁর শিক্ষার সংজ্ঞায় শিক্ষাকে একটি সক্রিয় ও প্রাণবন্ত প্রক্রিয়া রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। শিক্ষাও জীবনের মত সক্রিয়। এ অর্থে শিক্ষা জীবনের নামান্তর মাত্র।

আসল কথা জীবন নিয়ে বাঁচবার একটি অনিবার্য তাগিদ নিয়ে মানুষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, তাকে বাস্তবে প্রয়োগের চেষ্টা করে। যে অভিজ্ঞতা ফলপ্রসূ নহে, জীবনের প্রয়োজনে যা লাগে না আমরা তাকে বাতিল করে দিই। তারপর জীবনে চলে নতুন অভিজ্ঞতার লীলাখেলা। শিক্ষা তাই জীবনধর্মী এবং এ শিক্ষাই জীবনের প্রয়োজন। ডিউই অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বলেছেন—শিক্ষা জীবনের প্রস্তুতিমাত্র নয়, শিক্ষাই জীবন।

৭। শিক্ষার পরিধি (Scope of Education) :

শিক্ষা-দর্শনে আমরা 'শিক্ষা' বলতে শিক্ষার ব্যাপক অর্থই বুঝি এবং মানবজীবনের সামগ্রিক রূপটিই শিক্ষার মাধ্যমে প্রতিফলিত করতে চাই। ব্যাপক অর্থে শিক্ষার পরিধি আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই :

প্রথমতঃ, শিক্ষা ও জীবন সমব্যাপক। শিক্ষার ইতিহাস ও মানুষের জীবনের ইতিহাস একই। মানুষের জন্মক্ষণেই তার শিক্ষা শুরু, আর জীবনের বিলুপ্তিতে তার শেষ। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলতেন, যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যাপক অর্থে শিক্ষার পরিধি বলতে কোন বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা নয়। কোন বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন

আমাদের জীবনের রুটি রোজগারের প্রয়োজনেই সীমাবদ্ধ। ব্যাপক শিক্ষার পরিধি প্রয়োজনের (utility) সীমা ছাড়িয়ে দেহ-মন-আত্মার উন্মেষ সাধনেও রত।

অর্থাৎ ব্যাপক অর্থে শিক্ষা প্রাথমিক, মাধ্যমিক বা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে সীমাবদ্ধ নয়। ব্যাপক অর্থে শিক্ষার কোন পরিকল্পনা (Plan) করা সম্ভব নয়। শিক্ষা মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতার এক বিরামবিহীন প্রক্রিয়া।

তৃতীয়তঃ, শিক্ষা চির চঞ্চল—ইহা কোন গতিহীন বস্তু নহে। মানুষ নিয়ত অভিজ্ঞতা আহরণ করে। পুরাতন অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন অভিজ্ঞতাকে সে যাচাই করে। আর এই অভিজ্ঞতার লীলাখেলা চলে সমগ্র জীবনব্যাপী। যে অভিজ্ঞতা তার জীবনের সহায়ক তাকেই সে বাঁচিয়ে রাখে। শিক্ষা তাই সক্রিয় গতিশীল পদ্ধতি।

চতুর্থতঃ, শিক্ষার পরিধি শুধু অভিজ্ঞতার মূল্যায়নে সীমিত নহে। যে অভিজ্ঞতা মানুষ সঞ্চয় করে—তা সমাজের ভাবী সন্তান-সন্ততিদের জন্য রক্ষা করার মাধ্যমও সে ব্যবস্থা করে। পুস্তক ও শিক্ষকের মাধ্যমে এক যুগের অভিজ্ঞতা নতুন যুগে নতুন মানব সন্তানের নিকট পরিবেশন করা হয়। মানুষ তার অর্জিত অভিজ্ঞতা সমাজ ও কালের উপর চিরস্থায়ী রূপ দেবার চেষ্টা করে। কোন যুগের মানুষই একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা দিয়ে তার জীবন শুরু করে না, তার পেছনে থাকে পুরাতন যুগের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ইতিহাস। এই ভাবে শিক্ষা মানুষের জীবনের সমব্যাপক হয়ে দাঁড়ায়, শিক্ষা হয় যুগপ্রসারী—প্রাণবন্ত ও গতিশীল প্রক্রিয়া।

পঞ্চমতঃ, মানুষের জীবনে যে সংগতি সাধনের চেষ্টা দেখা যায়, ব্যাপক শিক্ষার পরিধি তার সমপর্যায়ভুক্ত। মানুষের জীবনে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা চার ধারায় প্রবাহিত- (ক) মানুষের সংগে প্রকৃতি ও পরিবেশের সামঞ্জস্য বিধান, (খ) মানুষের সংগে মানুষ বা সমাজের সামঞ্জস্য বিধান, (গ) ব্যক্তি-মানুষের সংগে তার বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির সামঞ্জস্য বিধান, (ঘ) মানুষের সংগে তার ঈশ্বর বা নীতিজ্ঞানের সম্পর্কের সামঞ্জস্য বিধান।

এই সংগতি বিধানের মধ্য দিয়েই মানুষের সামগ্রিক সত্তারই পূর্ণ প্রকাশ পায়। সে সত্তাই ব্যক্তিত্ব বা চরিত্র। নানা সংঘাতের মধ্য দিয়ে মানুষের

জীবনে সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের পরীক্ষা হয়, ফলে শিক্ষার মাধ্যমে সে-সব মূল্যবোধ (Values) সম্বন্ধে আমরা সচেতন হয়ে উঠি এবং বিভিন্ন মূল্যবোধ (Values) স্থিতিস্থাপকতা লাভ করে। শিক্ষা জীবনের বিভিন্ন সমস্যা ও সংঘাতের মধ্যে, বিভিন্ন বাতাবরণের মধ্যে সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধকে বাঁচিয়ে রাখে। যে ব্যক্তি বা সমাজ তার মৌলিক মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত হয়—সে কালের করাল গ্রাসে বিনষ্ট হয়।

পরিশেষে, শিক্ষার পরিধি (Scope) সম্বন্ধে আমরা দার্শনিক ডিউই-র কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করতে চাই। গণতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষার এক ব্যাপক ভূমিকা বর্তমান। ডিউই তাঁর *'Democracy and Education'* বইতে এ নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। ডিউই-র বক্তব্য হচ্ছে বর্তমান কারিগরী বিদ্যা ও বুদ্ধিগত চেষ্টা মানুষকে নিজ স্বার্থ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ করে তুলছে—কিন্তু এ শিক্ষাতে কোন সামাজিক মন (Socialised Mind) গড়ে তোলার প্রয়াস নেই। আজকের শিক্ষার জগতে একদিকে সমাজ ও যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী (utilitarian) শিক্ষা গ্রহণ এবং অন্যদিকে নির্জ্ঞান ভাবে চরিত্র সংগঠন—এ দুয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত। এ দুয়ের দ্বন্দ্ব পরিহার আজকের শিক্ষা ব্যবস্থায় এক ক্রমবর্ধমান জটিল সমস্যা।

৮। শিক্ষার কাজ (Functions of Education) :

শিক্ষা দ্বারা মানুষ তার অভিজ্ঞতার পরিবর্তন ঘটায়। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে নিত্য নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছে মানুষ। তার পরিবেশ, তা সামাজিক হোক আর প্রাকৃতিক হোক তার উপর প্রভাব বিস্তার করে। শিক্ষার সাহায্যেই মানুষ সেই প্রভাবকে তার কাজে লাগায়, তার আচরণ ও দৃষ্টিভংগীর উপর একটা স্থায়ী পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা করে। নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর উপরও পরিবেশের প্রভাব ক্রিয়াশীল। কিন্তু তারা নিজেরা পরিবেশের উপর প্রতিক্রিয়া করতে পারে না। অর্থাৎ নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীরা বিচিত্র অভিজ্ঞতার সংগে মিল রেখে আচরণ পাল্টাতে পারে না। তাই যুগ যুগ ধরে একই ধরনের আচরণে তারা অভ্যস্ত। বাবুই পাখী হাজার হাজার বছর একই ভাবে বাসা বুনছে। নিম্নতর প্রাণীর আচরণ একঘেয়ে এবং যান্ত্রিক—সে আচরণের মূলে

তাদের প্রবৃত্তির (Instinct) তাড়নাই ক্রিয়াশীল। এ তাড়না অনেকটাই অন্ধ ভাবাপন্ন। তাই গতানুগতিক এবং অভ্যস্ত পরিবেশের বাইরে নিম্নতর প্রাণীরা হতবুদ্ধি হয়ে যায়, অনেক সময় প্রাণ হারায়। শীতপ্রধান অঞ্চলের কুকুরগুলিকে যদি উষ্ণপ্রধান অঞ্চলে নিয়ে আসা হয়, তারা অনেক সময় বাঁচতে পারে না। অর্থাৎ নতুন পরিবেশে আচরণের পরিবর্তন বা অভ্যাস গঠন নিম্নতর প্রাণীর পক্ষে সম্ভব নয়।

মানুষের জীবনেও কতকগুলি প্রাথমিক আচরণ প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রবৃত্তির প্রেরণায় পরিবেশ-নিরপেক্ষভাবে মানুষও গতানুগতিক আচরণ করে। কিন্তু তার জীবনের অধিকাংশ আচরণই অভিজ্ঞতালব্ধ। নতুন অভিজ্ঞতা ও পরিবেশের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলেই মানুষের জীবনে নতুন আচরণ ও অভ্যাস সৃষ্ট হয়। ইহাই তার জীবনে শিক্ষার কাজ। পরিবর্তিত পরিবেশ অনুযায়ী আচরণের পরিবর্তনের যে ক্ষমতা তাকে বলা হয় নমনীয়তা (Plasticity)। একমাত্র মানুষই এ ক্ষমতার অধিকারী। এ ক্ষমতার ফলেই মানুষ শিক্ষালাভ করে। আর এ শিক্ষার দ্বারাই সে পৃথিবীর পরিবেশে পরিবর্তন আনে; প্রকৃতির শক্তিকে নিজের কাজে লাগানর চেষ্টা করে—সৃষ্টি হয় সভ্যতার ইমারত, মানুষের জীবন তাই সহজ ও নিরাপদ। অন্যদিকে ইতর বা নিম্নতর প্রাণীর জীবন সংগ্রাম বিপদসংকুল, গতানুগতিক এবং অনিশ্চিত।

ব্যাপক অর্থে শিক্ষা মানুষের জীবনে সমব্যাপক। শিক্ষার পরিধি এবং আমাদের জীবনের পরিধি একই। শিক্ষা তাই জীবনধর্মী। জীবনের ধর্ম হল পরিবেশের সংগে সংগতি সাধন। প্রাণীর অস্তিত্ব নির্ভর করছে এই সংগতি সাধনের উপর। এই সংগতি সাধনের চেষ্টাকে আমরা তিনভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি, যথা—ব্যক্তিগত সংগতিসাধন, সমাজ-সংরক্ষণ, ব্যক্তিক ও সামাজিক অগ্রগতি।

(ক) ব্যক্তিগত সংগতিসাধন (Individual Adjustment): বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ হর্নী (*Horne*) বলেন: শিক্ষা মানুষকে একটি উচ্চশ্রেণীর সংগতি সাধনের ক্ষমতা প্রদান করে। দেহ ও মনে শিক্ষালব্ধ এই ক্ষমতার দ্বারা মানুষ তার বুদ্ধিগত, ভাবগত ও অনুভূতি প্রবণ পরিবেশের সংগে সংগতি বিধান করে।

*শিশু জন্মগ্রহণের পরই প্রাকৃতিক পরিবেশের সম্মুখীন হয়। তার অন্তর্প্রকৃতি এবং বহির্প্রকৃতি নানা চাহিদা নিয়ে তার কাছে উপস্থিত হয়। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, দুঃখ-বেদনা, নানা ঋতুর প্রভাব ইত্যাদি নিয়ে শিশু ও প্রকৃতির মধ্যে এক দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। এই প্রকৃতি-পরিবেশ নিয়ত পরিবর্তনশীল। এই সদা পরিবর্তনশীল প্রকৃতির সংগে কিভাবে থাপ থাইয়ে নিতে হয়, কিভাবে সহজে নতুন বা প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন হতে হয় সে অভিজ্ঞতাই শিশু তার শৈশব থেকে সঞ্চয় করে। ইহাই শিক্ষার প্রধান ও প্রথম কাজ—কেননা এই প্রকৃতির পরিবেশের সংগে সুষ্ঠু সংগতি সাধনের উপর মানুষের জীবনের অস্তিত্ব নির্ভর করছে।

তারপর শিশুর বয়স বৃদ্ধির সংগে সংগে সে আরো দুটি দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়। একটি অন্যান্য মানুষ তথা সমাজ, অন্যটি তার অন্তর্প্রকৃতি ও বহির্প্রকৃতি। প্রাকৃতিক পরিবেশের সংগে সংগতি সাধনের মত শিশুকে তার সমাজের সংগেও থাপ থাইয়ে নিতে হয়। বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্ক, সমস্যা, চাহিদা ও পরিবেশের সংগে ব্যক্তির স্বকীয়তাবোধের বা আত্মচেতনার দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। ব্যক্তি-চেতনা (Individual consciousness) এবং সমাজ-চেতনার (Social consciousness) সংগে চলে ব্যক্তির জীবনে সংগতি সাধনের প্রয়াস। এই সংগতি সাধন শিক্ষার সহায়তায়ই সম্ভব।

তৃতীয় স্তরে শিশুর বুদ্ধি বিকাশের সংগে তার অন্তর্প্রবৃত্তি ও বহির্প্রবৃত্তির আর এক ধরনের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ, ব্যক্তি ও প্রকৃতির মধ্যে দ্বন্দ্ব; দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে দ্বন্দ্ব, তারপর ব্যক্তির নিজের মধ্যে দ্বন্দ্ব। একদিকে ব্যক্তির প্রবৃত্তির তাড়না এবং অন্যদিকে বুদ্ধির বিচার, একদিকে ভোগ-বাসনার ইচ্ছা, অন্যদিকে নৈতিক শাসন—এই দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয় প্রতিটি ব্যক্তি। আর একটি সংহত এবং সুন্দর জীবন যাপনের জন্য ব্যক্তির এই দ্বন্দ্বের সমাধান করতে হয়। এ সমাধান সংগতি সাধনেরই নামান্তর। শিক্ষাই এ সংগতি সাধনে মানুষকে সহায়তা করে।

একটি কথা এখানে আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, মানুষ যখন তার পরিবেশের সংগে সংগতি বিধান করে তখন সে নিজে যেমন পরিবর্তিত হয়ে যায়, তেমনি সে পরিবেশের পরিবর্তনও সাধন করে। মানুষের উপর পরিবেশের যেমন প্রভাব অসীম, পরিবেশের উপর মানুষের প্রভাবও তেমন অসীম।

মানুষ পরিবেশের নিকট আত্মসমর্পণ করে না, প্রয়োজন মত প্রকৃতিকে সে নিয়ন্ত্রণও করে। মানুষের সংগে ইতর প্রাণীর পার্থক্য এখানে। ইতর প্রাণী প্রকৃতির প্রভাবকে মেনে নেয়, প্রকৃতির দয়ার উপর তার জীবনের স্থায়িত্ব। মানুষ প্রকৃতির বা পরিবেশের বাইরে নয়, একথা সত্য। কিন্তু প্রকৃতির বা পরিবেশের উপর সময় বিশেষে কর্তৃত্বও করে একথাও সত্য। ইতর প্রাণীর পরিবেশের উপর নিজস্ব উদ্যম বা ইচ্ছার কোন মূল্য নেই। কিন্তু মানুষ তার পরিবেশের উপর নিজস্ব উদ্যম ও ইচ্ছার প্রভাব বিস্তার করে। প্রকৃতিকে মানুষ তার চাহিদা অনুযায়ী কাজে লাগানর চেষ্টা করে, মানুষের কাছে প্রকৃতিও তাই পরিবর্তিত হয়ে যায়। আর সে পরিবর্তন সাধনে শিক্ষাই প্রধান সহায়ক। মানুষের সভ্যতার ইতিহাস এই প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করারই ইতিহাস। এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার ফলেই মানুষ নিত্য নতুন আবিষ্কারের দ্বারা বাড়ি তৈরী করে, রাস্তা তৈরী করে, আকাশে ওড়ে, সাগর পাড়ি দেয়, সৃষ্টি করে সভ্যতার বিচিত্র সম্ভার।

তাই দিন দিন আমাদের এই পরিচিত পৃথিবীর ,চেহারা পাল্টে যাচ্ছে। যে প্রকৃতিতে মানুষ আদিমকালে জন্মেছিল, সে প্রকৃতিও নেই, আর সে আদিম মানুষও নেই। মানুষের প্রচেষ্টার ফলে নতুন নতুন শহর গড়ে ওঠছে, নতুন নতুন কল-কারখানা তৈরী হচ্ছে, চারদিকে নতুন নতুন পথঘাট দেখা যাচ্ছে। আর মানুষের ব্যক্তি জীবনে, সমাজ-জীবনে নতুন ভাবের আবির্ভাব হচ্ছে—প্রকৃতি ও মানব এক পরিবর্তনের পরিক্রমায় ব্যস্ত। মানুষের পাথেয় তার অভিজ্ঞতা, আর এই অভিজ্ঞতার ইতিহাসই শিক্ষার ইতিহাস।

(খ) সমাজ সংরক্ষণ (Social Conservation)ঃ ব্যক্তিকে তার সামাজিক, প্রাকৃতিক পরিবেশের সংগে সার্থক সংগতি সাধন করতে সাহায্য করা শিক্ষার প্রধান ও প্রথম কাজ। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই আমরা বুঝতে পারব, ব্যক্তি নিছক একক হিসেবে বাস করে না—অন্যান্য ব্যক্তিদের সংগে তার সম্পর্ক গভীর এবং জন্মসূত্রে লব্ধ। মানুষ জন্মে সমাজে, বাঁচে সমাজে, মরে সমাজে। ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, নৈরাশ্যবেদনা, উত্থান-পতন, জীবনের সকল কর্ম, সকল সংগ্রাম সামাজিক পটভূমিকায়ই সম্ভব হয়। শিক্ষার কাজ ব্যক্তির সংগে তার পরিবেশের সংগতি বিধান কিন্তু সমাজের সংগে ব্যক্তির সংগতি ছাড়া তা মূল্যহীন। শিক্ষা একটি সামাজিক কর্ম (Social

function)। **শিক্ষার মাধ্যমেই সমাজের স্থিতি, প্রকাশ ও প্রতিপালন এবং সমাজ সংরক্ষণ সম্ভব হয়।**

'সমাজ' কথাটা যখন আমরা বলি তখন আমরা একটি জনসমষ্টি বুঝি না। সমাজ হল, ব্যক্তির সংগে ব্যক্তির একটি সচেতন সম্পর্ক বা জটিল সম্পর্কসমষ্টি। সমাজ একটি গতিশীল প্রবাহ—সমাজের সংরক্ষণ যাতুঘরে সম্ভব নয়, তার প্রাণবন্ত প্রবাহ চলে মানুষে মানুষে সম্পর্কের লীলাখেলায়। মানুষে মানুষে এই সম্পর্কের বার্তা বহন করে মানুষের ভাবধারা, সামাজিক আদর্শ ও সংস্কৃতি। শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়, মানুষের ভাবধারা, আদর্শ, কৃষ্টি, সংস্কৃতি চিরস্থায়ী হয়, আর সমাজ এই শিক্ষার মাধ্যমে তার প্রবাহকে প্রানবন্ত করে তোলে। শিক্ষার দ্বারা সমাজ-সংরক্ষণ বলতে আমরা একথাই বুঝি। শিক্ষা সমাজ-সংস্কৃতির ধারক।

যে কোন একটি সামাজিক গোষ্ঠী (Social Group) বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই তা নবীন ও প্রবীণদের সংগমস্থল। জাগতিক নিয়মে প্রবীনরা ধীরে ধীরে সমাজ থেকে বিদায় নেয়—তারা পূর্বপুরুষ থেকে গৃহীত অভিজ্ঞতার ও তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারটি নবীনদের উপহার দেয়। সমাজের এই অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান সম্ভব হয় শিক্ষার মাধ্যমেই। প্রাচীনরা তাদের ঐতিহ্য ও জ্ঞান আগামী বংশধরের জন্যই রেখে যায়। কোন সমাজ যদি বাঁচতে চায় তবে তাকে তার প্রাচীন সমাজ তথা পূর্বপুরুষের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা, আদর্শ, ভাবধারা ইত্যাদির অধিকারী হওয়া চাই। আর এক যুগের ঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতাকে অন্য যুগে পরিবাহিত করে শিক্ষা। বিদ্যালয়ে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসবে, সভা-সমিতিতে, আলাপ আলোচনায়, কথা-বার্তায়, ভাব-বিনিময়ে ভবিষ্যৎ সমাজের নাগরিক অর্থাৎ নবীনের দল প্রবীণের অভিজ্ঞতাই গ্রহণ করে। শিক্ষাব্যবস্থাই সমাজের নিরবচ্ছিন্নতা সম্ভবপর করে তোলে। শিক্ষার এ কাজের উপর সমাজের অস্তিত্ব নির্ভর করছে। শিক্ষা যদি একটি বিশেষ যুগের বিশেষ মানবগোষ্ঠির চিন্তা, ভাবরাশি ও অভিজ্ঞতা অন্য যুগে পরিচালিত (transmission) না করে, তবে সেই বিশেষ মানবগোষ্ঠির মৃত্যুর সংগে সংগে সে সমাজেরও সমাধি হয়।

(গ) প্রগতি (Progress) : শিক্ষার প্রধান প্রধান কাজ হল ব্যক্তিগত সংগতি সাধন এবং সমাজ সংরক্ষণ। কিন্তু ব্যক্তিগত সংগতি সাধন এবং সমাজ

সংরক্ষণ একটি স্থির বা স্থাণু ব্যাপার নয়। মিশরের মমিকেও বা তাজমহলকেও আবহাওয়া বা পরিবেশের সংগে খাপ খাওয়ান হচ্ছে এবং সংরক্ষিত করা হচ্ছে। কিন্তু মানবজীবন সম্বন্ধে এ ধরনের উপমা প্রযোজ্য নয়। মানবজীবন ও সমাজের ধর্মই হল পরিবর্তনশীলতা, সৃজনশীলতা। সুতরাং শুধু টিঁকে থাকাই এখানে বড় কথা নয়, সমাজের অগ্রগতি বা প্রগতির প্রশ্ন এখানে জড়িত। তাই শিক্ষার আর একটি প্রধানতম কাজ হল, সমাজ ও ব্যক্তিকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নেওয়া, (নতুন ভাবধারার সন্ধান দেওয়া)।

যে সমাজ বা যে যুগ শুধু প্রাচীনের অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করে এবং একমাত্র সম্বল বলে জীবন চালায়, নতুন চিন্তা বা নতুন আবিষ্কারের বা নতুন অভিজ্ঞতার দ্বার উদ্ঘাটন করে না, সে সমাজ বা সে যুগ নিতান্ত দরিদ্র। টিঁকে থাকার চেষ্টা করে বটে, কিন্তু টিঁকে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে ক্ষয়িষ্ণু, ইতিহাসে তার যবনিকা আসন্ন।

'প্রগতি' (Progress) শব্দের অর্থ কি? সমাজবিজ্ঞান ও সমাজদর্শনে 'প্রগতি' শব্দের ব্যাখ্যা নিয়ে মতানৈক্য বর্তমান। সাধারণ অর্থে 'প্রগতি' বলতে উন্নততর সংগতি সাধন বোঝায়। আমরা নিম্নে ব্যক্তির প্রগতি ও সমাজের প্রগতি আলোচনা করব।

ব্যক্তির অস্তিত্ব নির্ভর করছে পরিবেশের সংগে সার্থক সংগতি সাধনের উপর। এই সংগতিসাধন চলে জীবনভর। পরিবেশের সংগে খাপ খাইয়ে নেবার নিত্য-নতুন পদ্ধতি মানুষ তার অভিজ্ঞতার দ্বারা আবিষ্কার করে। কিন্তু সার্থক সংগতিবিধানের বিভিন্ন মাত্রা আছে। এই মাত্রা আবার নির্ভর করছে সংগতি বিধানের উৎকর্ষ বা কার্যকারিতার উপর। প্রাচীন মানুষ ঝড়ঝঞ্ঝা ও রৌদ্রতাপ থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য গুহায় বাস করত। প্রতিকূল আবহাওয়ার সংগে এই ছিল প্রাচীন মানুষের সংগতিসাধন। তারপর মানুষ ঘর তৈরি করতে শিখল। তারই বিবর্তন আজকের দালানবাড়ি। শীত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য তারা লতাপাতা, গাছের ও প্রাণীর ছাল দিয়ে নিজেদের ঢাকত। তারপর শিখল তুলো থেকে সুতো বের করে বা পশুর লোম দিয়ে বস্ত্র পরিধান করতে। তারই বিবর্তন আজকের নানা বৈচিত্র্যের নানা জাতের পোশাক-পরিচ্ছদের মেলা।

সভ্যতার যে কোন উপকরণ অর্থাৎ ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যদ্রব্য, রাস্তাঘাট, যানবাহন, ঔষধপত্র, আমোদ প্রমোদের সরঞ্জাম ইত্যাদি সম্বন্ধেও এ ব্যাখ্যা প্রযোজ্য। মানুষ পরিবেশের সংগে সংগতিবিধানের জন্য প্রাচীনের অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তিই করে না, নিজের অভিজ্ঞতা যোগ করে সহজতর স্বাচ্ছন্দ্যময় ও অধিকতর কার্যকরী পন্থা উদ্ভাবন করে। ইহা ব্যক্তির অগ্রগতি এবং শিক্ষার সহায়তায় সম্ভব হয়।

কিন্তু ব্যক্তির উন্নতি শুধু বহির্প্রকৃতির সংগে ব্যক্তির সংগতিসাধন নয়। ব্যক্তিকে তার অন্তর-প্রকৃতি বা মানসিক জগতের সংগেও সংগতিবিধান করতে হয়। আদিম কালে মানুষ বহির্জগৎ নিয়েই ব্যস্ত ছিল, তার অন্তরের দিকে তাকানর অবসর ছিল না। তাই তার অন্তরের সংগে বাহ্যিক জগতের মিল সাধনের মান ছিল নিম্নস্তরের। ধীরে ধীরে মানুষের মননশীলতা বৃদ্ধি পায়, সৃষ্টি হয় নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখা—সাহিত্য, দর্শন, মনোবিদ্যা প্রভৃতির। জ্ঞানের গভীরতা ও প্রসারতা মানুষের মনকে এখন অধিকতর উন্নত করে তুলেছে। কুসংস্কার, কু-আচার এবং অর্থহীন প্রথার প্রাচীর থেকে মানুষের মন আজ অধিকতর মুক্ত।

সামাজিক অগ্রগতি নির্ভর করে মানুষের নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন চিন্তা ও জ্ঞান সৃষ্টির উপর। একটা বিশেষ সমাজ তার পূর্বগামী সমাজের সঞ্চিত ও পরীক্ষিত অভিজ্ঞতা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে। এ অভিজ্ঞতা প্রদান ও গ্রহণের উপর নির্ভর করে প্রতিটি সমাজের অস্তিত্ব। যে সমাজ ভবিষ্যতের জন্য তার জ্ঞান, অভিজ্ঞতা বা বক্তব্য রেখে যেতে পারে না সে সমাজ তার কালের ব্যক্তিবর্গের মৃত্যুর সংগে সংগে নিজেও ইতিহাস থেকে বিদায় নেয়। আর যে সমাজ তার পূর্বগামী সমাজের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার গ্রহণ করে না সে বড়ই দরিদ্র, তাকে তার জীবনযাত্রা নতুন করে আবার আরম্ভ করতে হয়, তখন তাকে হয়ত আবার আদিম যুগেই ফিরে যেতে হয়।

তাই প্রতি সমাজ পূর্বগামীদের অর্জিত অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান গ্রহণ করে। কিন্তু অভিজ্ঞতার আহরণই সমাজ জীবনের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। সমাজের শিক্ষা ও জীবনধারণের প্রণালী যদি অতীতের অভিজ্ঞতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তবে সে সমাজ তার জীবনীশক্তিকে হারিয়ে ফেলে। প্রতিটি যুগের নিজস্ব একটা

চাহিদা আছে। সে চাহিদা ও পরিবর্তনের সংগে মিল রেখে অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগান চাই, কৌশল অর্জন করা চাই। তা না হলে পুরাতনের সঞ্চয় একদিন ফুরিয়ে যায়, সমাজের শক্ত বাঁধন আর থাকে না, নতুন যুগের প্রয়োজন ও পরিবর্তন অনেক পুরাতন অভিজ্ঞতাকে বাতিল করে দেয়। প্রাচীনকালের বহু সমাজ পুরাতনকে আঁকড়ে রাখতে গিয়ে নতুন যুগের চাহিদাকে অস্বীকার করেছে। ফলে তারা দুর্বল হয়ে পড়েছে, ইতিহাস থেকে বিদায় নিয়েছে। তাই প্রতিটি সমাজ যেমন অতীতের অভিজ্ঞতা আহরণ করবে, তেমনি নতুন জ্ঞান ও চিন্তার উদ্ভাবন করবে। এভাবেই সমাজ প্রগতি সম্ভব।

প্রশ্নাবলী

1. Give an account of the exact meaning of the term 'Education'
2. Discuss the scope and function of education
3. Education has been used in a wider sense as well as in a narrower sense. Explain clearly the two uses of the word 'education'
4. What is the concept of educaton? Distinguish it from learning.
5. Discuss.
   (a) Education is development.
   (b) Education is an active process.
6. Discuss the meaning of education. How does it differ from instruction?
7. What are the functions of education?
8. Individual adjustment is the primary function of education—Discuss.
9. It is said that the function of education is social preservation. But it is possible only when education leads a society along a path of progress —Discuss.
10. Discuss the nature of education as a science.
11. Distinguish between Education & Instruction.

তৃতীয় অধ্যায়

শিক্ষার লক্ষ্য

(Aims of Education)

শিক্ষা ও মানুষের জীবন আলাদা বস্তু নয়। শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষের জীবনের বিস্তার ঘটে, আবার জীবনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষা ঘটে। তাই শিক্ষা আমাদের অস্তিত্বের সংগে জড়িত। মানুষ যেমন বিভিন্ন যুগে বা বিভিন্ন সমাজে তার জীবনের বিভিন্ন লক্ষ্যের অনুসন্ধান করে, তেমনি বিভিন্ন শিক্ষা-ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন আদর্শের অন্বেষণ করে। তাই মানুষের জীবনের ইতিহাস ও শিক্ষার ইতিহাস সমার্থক। শিক্ষাধারাই মানুষের জীবনের প্রতিফলন এবং জীবনবোধ থেকেই শিক্ষার উৎপত্তি। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ দার্শনিক ডিউই (*Dewey*) এ প্রসংগে বলেন, শিক্ষার আলাদা কোন লক্ষ্য থাকতে পারে না, জীবনের সংগে শিক্ষা সমব্যাপী।

মানব ইতিহাস অধ্যয়ন করলে যেমন বিভিন্ন জীবনাদর্শের সংগে আমরা পরিচিত হই, তেমনি শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখি শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে নানা মতভেদ—নানা আদর্শের সংঘাত। এক্ষণে আমরা প্রাচীন শিক্ষাদর্শ নিয়ে আলোচনা করব :

১। প্রাচীন ভারতের শিক্ষাদর্শ (Aims of Education in Ancient India) :

প্রাচীন ভারতে আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল মোক্ষ বা মুক্তি। মৃত্যুকে জয় করে এক পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক জীবন লাভই ছিল আমাদের সকল সাধনার শেষ কথা।

উপনিষদে এই আত্মজ্ঞান লাভের কথাই বলা হয়েছে। অন্যান্য সব জাগতিক জ্ঞানকে অপরাবিদ্যা বলে অভিহিত করা হত। আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানকে পরাবিদ্যা বা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান বলে স্বীকৃতি দেওয়া হত। যে বিদ্যা আমাদের আত্মজ্ঞান এনে দেয়, সকল অপূর্ণতা দূর করে, তাই প্রকৃত শিক্ষা বা

পরাবিদ্যা। অজ্ঞতা বা অবিদ্যাই আমাদের সকল দুঃখ, সকল বন্ধনের কারণ। এই অবিদ্যাকে পরিহার করে আত্মজ্ঞান লাভ করা চাই, ব্যক্তিকে আত্ম-পরিপূর্ণতা অর্জন করা চাই। প্রাচীন ভারতের শিক্ষা প্রসংগে ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় বলেন—শিক্ষা আমাদের এই আত্ম-পরিপূর্ণতা অর্জনে সহায়তা করবে, নিছক ব্যবহারিক জ্ঞান সংগ্রহে সহায়তা করবে না।

এক কথায় প্রাচীন ভারতের শিক্ষা হল আত্মবিদ্যা। শিক্ষার উদ্দেশ্য হল আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা। আর সে জ্ঞানই আমাদের মুক্তি।

প্রাচীন ভারতে 'অপরাবিদ্যা' বা নিছক প্রয়োজনের বিদ্যাকে স্বীকার করা হয়নি। কেননা এ বিদ্যা আমাদের আত্মজ্ঞান প্রদান করে না—আর আত্মজ্ঞান ছাড়া আমাদের মুক্তি নেই।

২। প্রাচীন পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষাদর্শ (Aims of Education in Ancient Western Countrie·):

প্রাচীন পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল গ্রীস দেশ। গ্রীসদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রে শিক্ষার বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে চর্চা করা হয়েছে। আমরা সংক্ষিপ্ত ভাবে সে সব শিক্ষাদর্শ নিয়ে আলোচনা করছি।

(ক) **সোফিস্ট মতবাদ:** প্রাচীন গ্রীসদেশে সোফিস্ট দার্শনিকরা প্রধানতঃ ছিলেন শিক্ষক। অর্থের বিনিময়ে জ্ঞান বিতরণই তাঁদের কাজ। 'The Homo Mensura' মানুষই সকল সত্যের নিয়ামক—এই ছিল তাঁদের বেদমন্ত্র। আর সে মানুষ ব্যক্তি-মানুষ (Individual man) অর্থাৎ তাঁরা ছিলেন চরম ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপাসক। ব্যক্তির নিজস্ব বিচার বিবেচনা ও অভিজ্ঞতাই ছিল সকল মূল্যের মাপকাঠি। তাঁরা কোন সার্বিক (Universal) নিয়ম বা জ্ঞানে বিশ্বাস করতেন না। ব্যক্তির উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণকে ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী মনে করতেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ জাগ্রত করা। শিক্ষাদর্শনে মানব ও মানবতাই ছিল তাঁদের কাছে প্রধান কথা।

(খ) **এথেন্স রাষ্ট্রের শিক্ষাদর্শ:** সোফিস্টদের শিক্ষাদর্শকে চূড়ান্ত আকার প্রদান করেন সক্রেটিস। তাঁর মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হল 'নিজেকে জানা' (Know Thyself)। মানবের আত্মজ্ঞানই হল শিক্ষার লক্ষ্য।

আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষে 'আত্মানং বিদ্ধি' বা আত্মজ্ঞানের বাণী প্রচার করা হয়েছিল। সক্রেটিসের শিক্ষাদর্শের সংগে তার মিল আছে। সক্রেটিসের জগৎবিখ্যাত শিষ্যযুগল প্লেটো, অ্যারিস্টটল কমবেশী শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে এ মতই পোষণ করেন।

কিন্তু সোফিস্টদের মত এঁরা উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমর্থক ছিলেন না। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপর গুরুত্ব দিলেও সামাজিক নিয়ন্ত্রণকে তাঁরা অস্বীকার করেননি। সামাজিক পটভূমিকায়ই তাঁরা ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবোধকে বিচার করেছেন।

কিন্তু তবুও তাঁরা শিক্ষাদর্শে সমাজ চেতনা এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব দিতে পারেননি। জ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে তাঁরা বড় করে দেখেছেন। প্লেটো পরিষ্কার ভাবে বলেছেন: যে কোন ধরনের জ্ঞান সংগ্রহে আমাদের দেখা উচিত স্বাধীনতা যেন দাসত্ব বরণ না করে। শিক্ষার প্রথম ও প্রধান আদর্শ হল ব্যক্তির প্রকৃতি ও স্বভাব অনুযায়ী তার আভ্যন্তরীণ সম্ভাবনাগুলিকে বিকশিত করা।

(গ) স্পার্টার শিক্ষাদর্শ: সোফিস্টরা শিক্ষাদর্শে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবোধকেই বড় করে দেখেছেন। সমাজ-চেতনা বা সমাজধর্ম তাঁদের শিক্ষাদর্শে স্থান পায়নি। এথেন্সের শিক্ষাদর্শ, সমাজ-চেতনা ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণকে মেনে নিলেও সেখানে ব্যক্তিকে বড় করে দেখান হয়েছে। সমাজ ও ব্যষ্টির দ্বন্দ্ব এথেন্সের শিক্ষা ব্যবস্থায় দানা বেঁধেছে।

স্পার্টার শিক্ষাদর্শ সোফিস্টদের শিক্ষাদর্শের ঠিক বিপরীত। সোফিস্টদের শিক্ষায় ব্যক্তির চাহিদা ও অভিরুচিই ছিল বড় কথা, স্পার্টার শিক্ষায় সমাজ এবং রাষ্ট্রের চাহিদা ও প্রয়োজনই হল বড় কথা। ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবোধ স্পার্টার শিক্ষাদর্শনে অস্বীকৃত হল। ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের প্রয়োজন অনুযায়ী গঠন করা এবং রাষ্ট্রের অনুগত করে তোলা ছিল স্পার্টার শিক্ষার আদর্শ। এজন্য যে সব আদর্শ ও নিয়ম রাষ্ট্র সমর্থন করে, এই সব নিয়ম ও সামরিক কৌশলই শিক্ষা দেওয়া হত। ব্যক্তি সেখানে রাষ্ট্রশক্তির ক্রীড়নকে পরিণত হল। ব্যক্তির কোন স্বাতন্ত্র্য বা মূল্য সে শিক্ষায় ছিল না, সে হল রাষ্ট্রের প্রয়োজন মেটানর উপায় মাত্র।

(ঘ) খ্রীষ্টীয় শিক্ষাদর্শ: পাশ্চাত্যদেশে গ্রীক ও রোমান সভ্যতার পর যে যুগ আসে তাকে বলা হয় অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ। যুক্তির আলোক নির্বাপিত

হল, কুসংস্কার ও প্রথার অন্ধকারে মানুষের জীবন আচ্ছন্ন হল। শিক্ষাজগতে এল খ্রীষ্টধর্মের অনুশাসন, নীতি ও নিয়ন্ত্রণ।

খ্রীষ্টধর্মের আদর্শে নানা শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হল। শিক্ষার উদ্দেশ্য বাইবেলের আদর্শ অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হত। বাইবেলে বলা হয়েছে, ঈশ্বর মানবকে তাঁর নিজস্ব মূর্তিতে গড়েছেন। ঈশ্বরকে জানাই শিক্ষার আদর্শ। মানব ও ঈশ্বরের একাত্মবোধই খ্রীষ্টধর্মের শিক্ষা। যীশু বলেন: আমিই পন্থা, আমিই সত্য এবং আমিই জীবন।

কিন্তু ধর্মের অনুশাসনে এই শিক্ষা কালক্রমে শিক্ষার ব্যাপক দৃষ্টিভংগী থেকে বঞ্চিত হল। ধর্মের নামে পাদ্রীদের গোড়ামী প্রতিষ্ঠিত হল। শিক্ষা নৈতিক নিয়মের নামে অর্থহীন বিচার-বিশ্লেষণে পর্যবসিত হয়ে জীবনবিমুখী হয়ে দাঁড়াল।

৩। শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে মনস্তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব

('sychological & Sociological approach to the problem of aims of Education):

আধুনিক যুগে মনস্তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের আলোকে শিক্ষার আদর্শকে বিচার করা হয়। এ দুই বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষার কাজ হল সংগতিসাধন, সমাজ সংরক্ষণ ও সমাজের অগ্রগতি সাধন।

(ক) **শিক্ষার উদ্দেশ্য সংগতিসাধন:** মনস্তত্ত্বের দিক থেকে ব্যক্তির সংগে পরিবেশের সংগতিসাধন করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। বিশ্বপ্রকৃতির কোলে মানুষ যখন জন্মে তখন সে নিতান্ত অসহায়। তার ক্ষুধা মেটান চাই, রোদ-বৃষ্টি, ঝড়-ঝঞ্ঝা, শীত-গ্রীষ্ম প্রভৃতি নানা ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশের সংগে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া চাই। প্রাকৃতিক পরিবেশের পর আসে সামাজিক পরিবেশ। ব্যক্তির জীবনে সমাজ তার নানা সমস্যা, চাহিদা, প্রচলিত মূল্যবোধ প্রভৃতি নিয়ে উপস্থিত হয়। এদিকে ব্যক্তির নিজেরও কতকগুলি সমস্যা, চাহিদা ও জীবনের উদ্দেশ্য এবং আচরণ সম্বন্ধে মূল্যবোধ থাকে। তাই তাকে নিজের ও সমাজের সংগে সংগতিসাধন করতে হবে।

এখানে কয়েকটি কথা প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ, ব্যক্তির সংগে পরিবেশের সংগতিসাধন জীবনভর চলে। দ্বিতীয়তঃ, এ সংগতিসাধন প্রক্রিয়া যান্ত্রিক নয়।

মানুষ তার আপন মননশীলতা ও সৃজনশীলতার দ্বারা পরিবেশকে যেমন পরিবর্তিত করে নেয় তেমনি সে নিজেও পরিবর্তিত হয়ে যায়। আদিম মানুষও যেমন আজ আর নেই, আদিম পরিবেশও আজ আর নেই। মানুষ পরিবেশের শিকার নয়, পরিবেশের প্রভাব মানুষের জীবনে অসীম, কিন্তু তাই বলে মানুষ পরিবেশ বা প্রকৃতির দাস নহে, স্থলবিশেষে তার প্রভুও। তৃতীয়তঃ, মনস্তত্ত্ব যেভাবে পরিবেশের সংগে ব্যক্তির সংগতিসাধন ব্যাখ্যা করে—শিক্ষাদর্শনে আমরা সংগতিসাধন প্রক্রিয়াকে এরূপ উদ্দেশ্যহীনভাবে ব্যাখ্যা করি না। মনস্তত্ত্ব বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন আলোচনায় তার অধিকার নেই। কিন্তু শিক্ষাদর্শনে আমরা সংগতিসাধন প্রক্রিয়াকে বিশেষ বিশেষ আদর্শের মাধ্যমে বিচার করি। সমাজ ও ব্যক্তির পক্ষে যা শুভ, যে সংগতিসাধন ব্যক্তি ও সমাজের জীবনে কল্যাণকর ও মংগলদায়ক, সে সংগতিসাধনই আমাদের শিক্ষার মাধ্যমে কাম্য।

(খ) সমাজ সংরক্ষণ ও সমাজ প্রগতি: সমাজতত্ত্বের দিক থেকে সমাজকে বাঁচিয়ে রাখাই শিক্ষার কাজ ও উদ্দেশ্য। কিভাবে সমাজ বেঁচে থাকে? সমাজের অস্তিত্ব নির্ভর করে সমাজের ভাবধারা, আদর্শ, সংস্কৃতি, আচার, রীতিনীতি প্রভৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার উপর। তাই আজকের সমাজের যারা ধারক ও বাহক তারা তাদের সন্তান-সন্ততিদের কাছে তাদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারটি তুলে দেবেন। আর শিক্ষার দ্বারাই একাজটি সম্ভবপর হয়। তাই শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সামাজিক ভাবসম্পদ আগামী দিনের সমাজের নাগরিকদের অর্পণ করা। এতে সমাজের অস্তিত্ব রক্ষা পাবে।

কিন্তু সমাজের বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা অপরিণত নাগরিকদের মধ্যে তাদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা বিতরণ করলেই শিক্ষার উদ্দেশ্য শেষ হয় না। শুধু বেঁচে থাকা, শুধু সমাজকে বাঁচিয়ে রাখা শিক্ষার সংকীর্ণ উদ্দেশ্য। শিক্ষার উদ্দেশ্য আরও ব্যাপক। পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হলেই আমাদের পক্ষে সমাজকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়। প্রতিটি যুগের তার নিজস্ব চাহিদা আছে, পরিবর্তনশীল পরিবেশের আছে নিজস্ব আহ্বান। তারপর সৃজনশীলতা হচ্ছে ব্যক্তি-মানুষের (Individual man) ধর্ম। তাই নতুন চিন্তার, নতুন ভাবের ও নতুন দৃষ্টিভংগীর প্রয়োজন। নতুন পরিবেশের সংগে সংগতিসাধনের জন্য নতুন কৌশল চাই, নতুন আবিষ্কার চাই। মানুষের

অভিজ্ঞতার ও জ্ঞানের এভাবে হয় প্রসারণ। তাই শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু সমাজের সংরক্ষণ নয়, সমাজের প্রগতি সাধনও।

৪। শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দার্শনিক বিচার
(Philosophical approach to the problem of aims of Education) :

দর্শনের যে শাখা শিক্ষা সম্বন্ধীয় আলোচনা করে, তাকে শিক্ষামূলক দর্শন (Educational Philosophy বা Philosophy of Education) বলে। হল (*C. L. Hall*) তাঁর '*Conflicting Philosophies of Education*' প্রবন্ধে শিক্ষাসম্বন্ধে বিবিধ দার্শনিক মতবাদের এক আধুনিক আলোচনা করেছেন। শিক্ষাদর্শনের স্বরূপ সম্বন্ধে নানা মতভেদ আছে। কোন কোন দার্শনিক মনে করেন—শিক্ষা হল মূল, দার্শনিক বিচার ইহার ফলস্বরূপ অর্থাৎ শিক্ষাসম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা আগে, পরে হয় তার দার্শনিক পর্যালোচনা। আবার কোন কোন দার্শনিক মনে করেন, পৃথক দার্শনিক বিচার সম্ভব বলেই শিক্ষামূলক দর্শন সম্ভব। অন্যদিকে একদল দার্শনিকের বিশ্বাস, ব্যাপক অর্থে শিক্ষাকে গ্রহণ করলে শিক্ষা ও দর্শন একার্থবাচক।

সে যা হোক, এ সূক্ষ্ম আলোচনায় প্রবৃত্ত না হয়েও আমরা বলতে পারি, শিক্ষাতত্ত্ব ও দর্শন পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। শিক্ষাতত্ত্বের উপর দর্শনের যেমন অবদান রয়েছে, দর্শনের উপর তেমনি শিক্ষাতত্ত্বের অবদান রয়েছে। জীবন ও বিশ্ব সম্বন্ধে দার্শনিকরা যে আলোচনা করেন, সে আলোচনা শিক্ষার আদর্শ নিরূপণ ও পথ পরিক্রমা নির্দেশে সহায়তা করে। বেদান্তদর্শন বিশ্বাস করে জীবই ব্রহ্ম। তাই আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষের শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা। অন্যদিকে শিক্ষাবিদ্‌রা শিক্ষার যে আদর্শ ও পদ্ধতি অনুধাবন করেন, তা আমাদের জীবনদর্শন গঠনে সহায়তা করে।

নানা যুগে নানা দার্শনিক মতবাদকে কেন্দ্র করে শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। এই সব মতবাদ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য বিচার করেছেন।

(ক) স্বভাববাদ (Naturalism) : স্বভাববাদ বা প্রকৃতিবাদ সাধারণতঃ ভাববাদ এবং সূক্ষ্ম বুদ্ধিবাদের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ। দর্শনশাস্ত্রে 'স্বভাববাদ' শব্দটি

অনেক স্থলেই ভাববাদের বৈপরীত্য সূচনা করে। এই মতবাদটি অনেক ক্ষেত্রে জড়বাদ এবং যান্ত্রিকতাবাদের সমগোত্রীয়। কেননা, এই মতবাদে অতি প্রাকৃতিক কোন সত্বা স্বীকার করা হয়নি।

দর্শনশাস্ত্রে একটি বিশেষ দৃষ্টিভংগী থেকে 'স্বভাববাদ' পদটি ব্যবহৃত হয়। মানুষের স্বভাব বা প্রকৃতি বলতে বুঝি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ ও আবেগ এবং সহজ, সরল বিচার-বিবেচনা বোধ। মধ্য যুগে খ্রীষ্টধর্মের কূট যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা ও ভাববিলাসের প্রতিক্রিয়া হিসেবে এ আন্দোলন প্রসার লাভ করেছে।

শিক্ষা সম্বন্ধে স্বভাববাদের বক্তব্য হল: শিশুর স্বাভাবিক বৃত্তি সমূহকে প্রকাশের সুযোগ দেওয়া চাই। শিশুর জীবনে তার প্রকৃতি বিকশিত হওয়ার পথে কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা যেন কোন বাধা সৃষ্টি করা না হয়। শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থী বা শিশুই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। শিশুর বয়স বৃদ্ধির সংগে সংগে তার মানসিক স্তরেরও পরিবর্তন ঘটে এবং সে-স্তর অনুযায়ী ও শিশুর প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষাধারার প্রবর্তন করা চাই। কৃত্রিম সামাজিক নিয়ম ও পাঠ্যসূচীর দ্বারা শিশুর মনকে ভারাক্রান্ত করা শিক্ষা নয়, উহা শিশু মনের উপর অত্যাচার।

প্রকৃতি বলতে আমরা শিশুর অন্তর্প্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি দুই-ই বুঝি। শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুর অন্তর্প্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি উভয়ের মূল্য স্বীকার করা চাই। শিশুর অন্তর্প্রকৃতির স্বাভাবিক বিকাশই শিক্ষা। তার চাহিদা, সহজাত প্রবৃত্তি, তার অন্তরের সম্ভাবনা, তার ইচ্ছা ও আগ্রহই শিক্ষায় স্থান পাবে। এক কথায় শিশুর প্রকৃতিই শিক্ষার নিয়ন্ত্রক—শিশুর প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশই শিক্ষার উদ্দেশ্য। বহিঃপ্রকৃতিতেও শিশুর স্বভাবসুলভ আচরণকে প্রকাশ করার সুযোগ দিতে হবে। সামাজিক কৃত্রিম বিধি-নিষেধ সৃষ্টি করে শিশুর জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করা চলবে না। সামাজিক শৃঙ্খলা শিশুর জীবনে শৃঙ্খলের নামান্তর। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কৃত্রিম এবং শিশুর প্রকৃতির বিকাশ-পথে অনভিপ্রেত।

রুশো (*Rousseau*) এ মতের প্রধান সমর্থক। পরবর্তীকালে পেস্টালৎসী (*Pestalozzi*), ফ্রয়েবেল (*Froebel*), হার্বার্ট (*Herbert*), মন্টেসরি (*Montessori*) প্রভৃতি শিক্ষাতত্ত্ববিদ্‌রা এ মতের আর এক ব্যাপক ও সুনির্দিষ্ট রূপ প্রদান

করেন। তাঁদের প্রবর্তিত মত নব্যশিক্ষাতত্ত্ব (New Education) নামে অভিহিত হয়েছে।

সমালোচনা (Criticism) :

এই মতবাদে শিক্ষার সামাজিক দিককে অস্বীকার করা হয়েছে। সামাজিক পটভূমিকায়ই শিশুর জীবন গড়ে ওঠে। সমাজ কৃত্রিম বস্তু নয়। ব্যক্তির সংগে সমাজের সম্পর্ক অকৃত্রিম। তার বক্তিগত গুণাবলীর সংগে তার সামাজিক সত্তার বিকাশও প্রয়োজনীয়।

শিশুর প্রকৃতিই শিক্ষার আদর্শ বলে এই মতবাদে প্রচার করা হয়েছে। কিন্তু শিশুমনের প্রকাশের কোন সর্ববাদীসম্মত বা সামাজিক রূপ নেই। সুতরাং এ আদর্শ মেনে নিলে শিক্ষার কোন সার্বিক রূপ বা উদ্দেশ্য থাকবে না। কেননা শিশুমনের প্রকাশ ভংগিমা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখা যায়।

যদি শিশুর প্রকৃতিদত্ত সম্ভাবনা ও শক্তির বিকাশই শিক্ষা হয়, তবে বিশেষ উদ্দেশ্যের বিচারে এ বিকাশ সাধন করা চাই। সুতরাং স্বভাববাদীরা শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যায় কোন না কোন আদর্শকে গ্রহণ করতে বাধ্য। শিক্ষক যখন শিক্ষাদান কার্য করেন, সমাজ যখন শিক্ষার ব্যবস্থা করে, তখন সেটা উদ্দেশ্য-হীন হতে পারে না।

তাছাড়া, স্বভাববাদীরা যখন শিশুর স্বভাব বা প্রকৃতির কথা বলেন তখন প্রকৃতিকে কোন্ অর্থে ব্যাখ্যা করেন তা স্পষ্ট নয়। মানব প্রবৃত্তি বা প্রকৃতি নিম্ন স্তরের বা উচ্চ স্তরের হতে পারে। স্বভাববাদীরা নিশ্চয়ই মহৎ প্রবৃত্তির বিকাশ সাধনই কামনা করেন। তখন প্রবৃত্তির সংযমসাধন ও বিচারবিশ্লেষণের প্রশ্ন ওঠে।

এসব ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও স্বভাববাদের অবদান অনস্বীকার্য। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই মতবাদ এক নব যুগের সূচনা করেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুর শিক্ষা ছিল প্রাপ্তবয়স্কদের খেয়াল চরিতার্থ করার ব্যবস্থা মাত্র। শিশুর বক্তব্য ছিল সেখানে অবহেলিত। এই হৃদয়হীন শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে স্বভাববাদ বিদ্রোহ করেছে। তার সমর্থন রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা দর্শনেও বর্তমান।

(খ) **ভাববাদ (Idealism) :** দার্শনিক মতবাদ হিসেবে ভাববাদ প্রাচীনতম। ভাববাদ এক অধ্যাত্ম দৃষ্টিভংগী দ্বারা জীবন ও বিশ্বের ব্যাখ্যা

প্রদান করে। এদিক থেকে ভাববাদ স্বভাববাদ এবং জড়বাদের বৈপরীত্য সূচনা করে।

ভাববাদ বিশ্বাস করে, এই বিশ্ব এক পরমসত্তার প্রকাশ। সে সত্তা ভাবমূলক। যে জগৎ ও জীবন আমরা প্রত্যক্ষ করি, তা খণ্ডিত, সসীম ও ক্ষণস্থায়ী। একমাত্র পরমসত্তাই অবিনশ্বর সত্য এবং অনন্ত। এই পরমসত্তাকে ভাববাদে ঈশ্বর, পরমাত্মা বা ব্রহ্ম ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়।

আমাদের মধ্যে যে আত্মার সন্ধান আমরা পাই, সে আত্মার মধ্যেই পরমাত্মা সুপ্ত। পরমাত্মার সংগে জীবাত্মার অভেদত্ব উপলব্ধি করাই জীবনের লক্ষ্য ও মুক্তি। শিক্ষার উদ্দেশ্যও এই ব্রহ্মজ্ঞান। মানুষ স্বরূপতঃ স্বাধীন, অমর। মানুষের স্বরূপের বিকাশ সাধনই শিক্ষা। ভাববাদে শিক্ষার অন্য নাম আত্মবিদ্যা।

ভাববাদীদের শিক্ষাদর্শনে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। ভাববাদীদের মতে মানুষের উন্নততর জীবন হল আধ্যাত্মিক জীবন। সমাজের সংগে যোগসাধন ছাড়া আধ্যাত্মিক জীবন সম্ভব নয়। একমাত্র নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তি সমাজের সংগে একাত্ম হতে পারে, সামাজিক সংহতি রক্ষা করতে পারে এবং পরমাত্মার সহিত অভেদত্ব উপলব্ধি করতে পারে। একমাত্র ধর্মীয় ও নৈতিক দৃষ্টিভংগী দ্বারা ব্যক্তি বুঝতে পারে, এই মরজীবন অসম্পূর্ণ। কিন্তু এই জীবনই ব্যক্তির শেষ পরিণতি নয়—সে অমরত্বের অধিকারী। একমাত্র পরমাত্মার বা ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা ব্যক্তি অমরত্ব এবং পূর্ণতা লাভ করতে পারে।

সমালোচনা (Criticisn) :

শিক্ষাদর্শনে ভাববাদ সুপ্রাচীন কাল থেকে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অর্জন করেছে। মানুষের জৈবিক সত্তাই যে তার শ্রেষ্ঠ পরিচয় নয়, তার উপর রয়েছে তার পারমার্থিক সত্তা—এই শিক্ষাই ভাববাদের মূল বক্তব্য। মানুষ প্রকৃতির সংগে শুধু সংগতি বিধানের জন্য পৃথিবীতে আসেনি, সে নিছক একটি যন্ত্রবিশেষ নয়, পরমসত্তার সংগে সে একাসীন হতে পারে—এই হচ্ছে ভাববাদের শিক্ষা। সুতরাং আমাদের আধ্যাত্মিক বৃত্তিসমূহের উন্নতিসাধন করা চাই।

কিন্তু ভাববাদ শিক্ষাক্ষেত্রে যে মহান আদর্শের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছে, সে আদর্শ কিভাবে শিক্ষার্থী গ্রহণ করতে পারে এবং শিক্ষক শিক্ষা দিতে পারেন, তা সহজবোধ্য নয়।

তাছাড়া, ব্রহ্মজ্ঞান বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সংগে সামাজিক শিক্ষা ও বৃত্তি-মূলক শিক্ষার কিভাবে সমন্বয় ঘটতে পারে, এ সমস্যার কোন সমাধান ভাববাদে নেই।

তাছাড়া, ভাববাদী দর্শন যাঁরা সমর্থন করেন না তাঁরা এ শিক্ষাদর্শনও প্রত্যাখ্যান করেন।

(খ) জড়বাদ (Materialism): জড়বাদ অনেকাংশে প্রকৃতিবাদ বা স্বভাবাদের সমগোত্রীয়। জড়বাদ এ দৃশ্যমান জড়জগৎকেই মৌলিক সত্তা বলে গ্রহণ করে এবং প্রাকৃতিক নিয়ম ও কার্যকারণ সূত্রের দ্বারা জীবন ও জগতের ব্যাখ্যা করে। ভাববাদের মত কোন আধ্যাত্মিক সত্তা, আত্মার পূর্ণতা বা অমরত্বে এই দর্শন বিশ্বাস করে না। মানুষের জীবন, তার ধর্মবোধ, তার নীতিবোধ সবই জড় জগতের নিয়মের অধীন—প্রাকৃতিক নিয়মেই বিশ্ব চলমান। জড় জগতে যে নিয়ম, মানুষের মনের ক্ষেত্রে সে একই নিয়ম। কার্ল মার্ক্স (*Karl Marx*) বলেন, মানুষের মনে যে ভাব প্রতিফলিত হয় তা বস্তুগত পৃথিবীকেই প্রকাশ করে। বস্তুজগতের সংগে সম্পর্কহীন আধ্যাত্মিক বা অপার্থিব কোন ভাব নেই।

ভাববাদের মত জড়বাদেও শিক্ষার অপরিসীম গুরুত্ব স্বীকার করা হয়েছে। জড়বাদ বিশ্বাস করে, প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণে এনে ব্যক্তি ও সমাজের মংগলে নিয়োজিত করাই আমাদের লক্ষ্য। ভাববাদী দর্শন জীবন ও জগৎকে ব্যাখ্যা করে ক্ষান্ত—জড়বাদী দর্শন জীবন ও জগতে সার্থক পরিবর্তন আনতে ব্যস্ত। ভাববাদীরা বিশ্বাস করে শিক্ষা ব্যক্তির অন্তর্নিহিত পূর্ণতা বিকাশের সহায়ক মাত্র, শিক্ষা দ্বারা নতুন কিছুই সৃষ্ট হয় না। কিন্তু জড়বাদীরা বিশ্বাস করে শিক্ষা দ্বারা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সৃষ্ট হয়—সভ্যতা গড়ে ওঠে। তাছাড়া, গড়ে ওঠে নিয়ন্ত্রিত প্রকৃতির বুকে নতুন মানুষ, উন্নততর জীবন। শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে মানুষের জীবনে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও প্রগতি আনয়ন।

সমালোচনা (Criticism) :

বর্তমান বিশ্বে বৈজ্ঞানিক সভ্যতার যে অকল্পনীয় উন্নতি আমরা লক্ষ্য করি তার মূলে জড়বাদী শিক্ষার প্রচুর ও প্রধান অবদান রয়েছে। একথা স্বীকার্য যে মানুষের দুঃখ, দুর্দশা, পরিশ্রম লাঘব করে স্বল্পস্থায়ী জড়জগতের জীবনকে আরামপ্রদ ও কল্যাণকর করে তোলার জন্য জড়বাদী শিক্ষার চেষ্টার অন্ত নেই।

কিন্তু জীবন থেকে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ নির্বাসিত করে জড়বাদী শিক্ষা সভ্যতার যে ইমারত গঠন করতে চায়, তাতে আমাদের মহতী বিনষ্টি ঘটে। মানুষের ব্যক্তিত্ব ও মহত্ব তার প্রয়োজনের, তার প্রকৃতির সীমানা ছাড়িয়ে যায়। একটা আত্মতৃপ্ত শূকরের চাইতে অতৃপ্ত সক্রেটিস হওয়া উচিত। বস্তুতান্ত্রিক জীবন ব্যাখ্যায় আত্মানুসন্ধানের প্রয়াস নেই—এ দর্শন ইহ সর্বস্ব। এজন্য একদর্শিতাদোষে দুষ্ট। মানুষের ধর্মবোধ, বিবেকবোধ ও নীতিবোধের কোন ব্যাখ্যা এ দর্শনে মেলে না।

(ঘ) প্রয়োগবাদ (Pragmatism) : বিংশ শতাব্দীতে যে মতবাদ শিক্ষার জগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে, সে মতবাদ প্রয়োগবাদ নামে অভিহিত। প্রয়োগবাদের মূল বক্তব্য হল, কোন কিছুর সত্যতা প্রমাণের জন্য তাকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চাই। বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্যতা বা 'মূল্য' বলে কিছুই নেই। অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে সব কিছুর মূল্য পরীক্ষিত হয়। চিরন্তন সত্য বলে কিছুই নেই। পরিবর্তনশীল জগতের মূল্যবোধ এবং সত্যতাও পরিবর্তনশীল। যা ফলপ্রদ, যা সাফল্য আনে—তাই সত্য, যা ফলপ্রসূ নয়, যা প্রয়োজনে লাগে না—তাই মিথ্যা। তাই প্রয়োজনের পরিবর্তনের সংগে বস্তুর মূল্য ও সত্যের পরিবর্তন ঘটে। আজকের যুগে যা সত্য, অন্য যুগে তা অসার্থক এবং অসত্য বলে প্রমাণিত হতে পারে। অভিজ্ঞতার আলোকে সাফল্যের মাধ্যমে যা লাভ করা যায় তাকেই আমরা সত্য বলে গ্রহণ করব। এ মতের সমর্থক হলেন ডিউই (*Dewey*), পার্স (*Peirce*), জেমস্ (*James*) এবং শিলার (*Schiller*)। প্রয়োগবাদী শিক্ষাদর্শনের প্রধান প্রবক্তা হলেন ডিউই।

ডিউই বলেন : শিক্ষা হল অভিজ্ঞতার আলোকে অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন। শিশু এবং তার পরিবেশ—এ দুয়ের প্রতিক্রিয়া ও পরস্পর প্রভাবের ফলেই শিশুর

অভিজ্ঞতা সৃষ্টি হয়। শিশুর স্বভাবই হল তার সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ে পরীক্ষণ করা। শিশুর জীবনে পরিবেশ বা অভিজ্ঞতা যে সমস্যা ও সংঘাত সৃষ্টি করে, তার সমাধানেই কোন কিছুর মূল্য সৃষ্টি হয়। শিশু নিজেই তার অভিজ্ঞতার দ্বারা কোন কিছুর মূল্য বা সত্যতা নিরূপণ করে। অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ কোন মূল্য বা আদর্শ নেই। সকল আদর্শ, সকল মূল্য, সকল সত্য আমরা আমাদের পরিবর্তনশীল অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সৃষ্টি করি। এ সৃজনশীলতাই প্রয়োগবাদের মর্মবাণী।

শিক্ষার লক্ষ্য কি? প্রয়োগবাদের মতে শিক্ষা ছাড়া শিক্ষার কোন লক্ষ্য নেই। আমরা যখন শিক্ষায় নানা লক্ষ্যের অবতারণা করি তখন শিক্ষক, গুরুজন ও নানা চিন্তানায়কের দ্বারা আরোপিত লক্ষ্যের কথাই বলি। শিক্ষা জীবনের অভিজ্ঞতার সংগে সমব্যাপক, জীবনের বা শিক্ষার বাইরে শিক্ষার কোন উদ্দেশ্য নেই। শিক্ষার অধিকতর শিক্ষা ছাড়া আর কোনও লক্ষ্য নেই।

তাহলে শিক্ষকের কর্তব্য কি? নির্ধারিত বা পূর্ব থেকে অনুসৃত কোন উদ্দেশ্য নিয়ে শিক্ষক শিক্ষা দেবেন না। শিশুর চাহিদা অর্থাৎ শিশুর প্রবৃত্তি প্রবণতা মানসিক ও দৈহিক ক্ষমতাকে শিক্ষক এমনভাবে পরিচালিত করবেন যার ফলে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সকল সমস্যা সমাধানে সে সাহসী হয়। পরিবেশের সংঘাতে শিশুর জীবনে যে অভাববোধ জাগে, নব নব সৃষ্টির দ্বারা সে যেন তাকে পূরণ করে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয়ে স্বভাববাদ যেভাবে শিশু বা শিক্ষার্থীর চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়েছে প্রয়োগবাদ তার সমর্থন করে। কিন্তু স্বভাববাদে সামাজিক চাহিদাকে মোটেই গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। প্রয়োগবাদ সেখানে ব্যক্তি চাহিদা ও সামাজিক পরিবেশের সংহতি সাধনের প্রয়োজন স্বীকার করেছে। জড়বাদের মত প্রয়োগবাদও বিশ্বাস করে, অতি প্রাকৃত কোন পরম সত্তা নেই। কিন্তু জড়বাদে মানুষের জীবন সম্বন্ধে যে বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়, প্রয়োগবাদে সে ধরনের কোন প্রয়াস নেই। প্রয়োগবাদে মানসিক ক্রিয়ার স্বতঃস্ফূর্ত অবস্থার এবং মানসিক স্বাধীনতার উপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হয় জড়বাদে সে গুরুত্ব বা স্বীকৃতি নেই।

সমালোচনা (Criticism) :

শিক্ষার মূল্য কেবলমাত্র সাফল্যের মাধ্যমে স্থির করা যায় না। বিশেষ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যই শিক্ষা, তাই শিক্ষাপদ্ধতি উদ্দেশ্যের কতটুকু সহায়ক তা বিবেচনা করা চাই।

কোন কিছু ফলপ্রদ কিনা তা বাস্তবে প্রয়োগ না করেও আমরা যুক্তি বিচারের সাহায্যে গ্রহণ করতে পারি।

তাছাড়া, কোন ঘটনা সাফল্য আনে বলে সত্য, না সত্য বলে সাফল্যজনক —এ প্রশ্নের সমাধান প্রয়োগবাদে নেই।

৫। বিভিন্ন দার্শনিক আলোচনা সম্বন্ধে মন্তব্য (Comment on different Philosophical analysis) :

শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয়ে আমরা কয়েকটি মতবাদ আলোচনা করেছি। এছাড়া শিক্ষাতত্ত্বে আরও কয়েকটি মতবাদ শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করে। যেমন, **বাস্তববাদ** (Realism)। এ মতের প্রধান প্রবক্তা হলেন স্পেন্সার (*I Spencer*)। তিনি বলেন, 'যদি প্রশ্ন করা হয়—কোন্ প্রকার জ্ঞান সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। তবে বৌদ্ধিক, নৈতিক ও ধর্মীয় যে কোন প্রকার দৃষ্টিভংগী থেকে তার জবাব হবে : 'প্রাকৃতিক পরিবেশের পর্যবেক্ষণের উপর যে শিক্ষাপদ্ধতি উপস্থাপিত—তাই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা।' এ বাস্তব শিক্ষার মূল ভিত্তি হবে বিজ্ঞান। আর শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে উপার্জন ক্ষমতা অর্জন করা। বাস্তব-বাদীদের শিক্ষাদর্শন বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। বলা বাহুল্য, এ দর্শনে শিক্ষাকে সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া, বাস্তব-বাদীদের শিক্ষাসূচীতে সাহিত্য, কলা, দর্শন, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতির বিশেষ কোন গুরুত্ব থাকবে না।

জীবিকা নির্বাহ (Vocational Efficiency) :

অনেকে বলেন : শিক্ষার উদ্দেশ্য জীবিকা-নির্বাহ। জীবনে উপার্জনের ক্ষমতা অর্জন করাই শিক্ষা। শিক্ষার দ্বারা মানুষ নানা কৌশল অর্জন করে—বাস্তব জীবনে তা তাকে অর্থ উপার্জনে, রুটি রোজগারে সাহায্য করে। যান্ত্রিক সভ্যতার দ্রুত অগ্রগতির ফলে শিক্ষাকে জীবিকা অর্জনের উপায় (means)

রূপে অনেকেই গণ্য করেন। অর্থকরী শিক্ষার দিকে ঝোঁক আজ সর্বদেশে বিদ্যমান।

কিন্তু এ ধরনের উদ্দেশ্য নিতান্ত সংকীর্ণ। শিক্ষার সাহায্যে উপার্জনের ক্ষমতা আমরা অর্জন করি বটে, কিন্তু সকল শিক্ষাই অর্থ উপার্জনের সহায়তা করে না। জীবন সম্বন্ধে আমরা অনেক তথ্য আহরণ করি, অনেক রহস্য অনুধাবন করি যার অর্থকরী কোন মূল্য নেই। কিন্তু এ ধরনের শিক্ষা অসার্থক নহে। মানুষের মনুষ্যত্ব এবং তার ব্যক্তিত্ব প্রভৃতির সংগে জড়িত যে বিষয়াবলী আমরা অধ্যয়ন করি তার মানবিক মূল্য প্রচুর কিন্তু জীবিকানির্বাহে এগুলি আমাদের কোন সহায়তা করে না। জীবন থেকে এ ধরনের মানবিক মূল্যবোধ বাদ দিলে মানুষের জীবন পশুজীবনের স্তরে নেমে আসবে। আজকের শিক্ষাতত্ত্বে এ ধরনের শিক্ষাদর্শ এক প্রচণ্ড সমস্যার সৃষ্টি করেছে। একদিকে মানব বিজ্ঞানের (Humanities) আদর্শ, অন্যদিকে অর্থকরী শিক্ষার ঝোঁক যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে, তার আশু সমাধান প্রয়োজন।

তারপর আরেকটি মতবাদ হল, **যুক্তিবাদী মানবতাবাদ** (Rational Hum nism)। এ মতবাদ অ্যারিস্টটলের (*Aristolte*) দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষ স্বরূপতঃ যুক্তিশীল জীব। তার যুক্তির বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনই শিক্ষার উদ্দেশ্য। এ ছাড়াও ক্যাথলিক **অতীন্দ্রিয়বাদ** (Catholic Supernaturalism) নামে আরেকটি মতবাদের সংগে আমরা পরিচিত হই। রোমান ক্যাথলিকরা এ মতের প্রবর্তক। তাদের মতে ঈশ্বরের দ্বারা আদিষ্ট সত্যই একমাত্র সত্য। আর এ সত্য চিরন্তন। শিক্ষার উদ্দেশ্য এ সত্য প্রচার করা। বলা বাহুল্য, এ মতবাদ **নির্বিচারবাদ** (Dogmatism) এবং এই বিশেষ ধর্মে যাদের বিশ্বাস তারাই এ শিক্ষাদর্শনে সম্মতি জানাতে পারেন।

আধুনিককালে বিভিন্ন শিক্ষাদর্শনকে সাধারণতঃ দু' শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। প্রথম শ্রেণীকে **প্রগতিবাদ** (Progressivism) বা **পুনর্গঠনবাদ** (**Reconstructionism**) বলা হয়। স্বভাববাদ, জড়বাদ, বাস্তববাদ, প্রয়োগবাদ—এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীকে **সনাতনবাদ** (**Traditioralism**) বা **শাশ্বতবাদ** (**Perennialism**) নামে অভিহিত করা হয়। ভাববাদ, যুক্তিবাদ বা ধর্মীয় শিক্ষাদর্শন—এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

এখন প্রশ্ন হল, শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন্ মতবাদটি শ্রেষ্ঠ? এ প্রশ্নের জবাব দেবার সময় আমাদের লক্ষ্য করা উচিত—কোন মতবাদই স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং ত্রুটিমুক্ত নহে। শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয়ে প্রত্যেকটি মতবাদের নিজস্ব অবদান রয়েছে। তার একটি সমন্বয় প্রয়োজন। শিক্ষাবিদ্ রসের (*J. S. Ross*) নিজস্ব বক্তব্য অনুসরণ করে আমরা বলতে পারি যে, ভাববাদী দৃষ্টিভংগীকে প্রধান দৃষ্টিভংগী হিসেবে আমাদের গ্রহণ করা উচিত এবং তার সহিত যথাসম্ভব প্রয়োগবাদ, স্বভাববাদ প্রভৃতির দৃষ্টিভংগী সংযুক্ত করা উচিত।

৬। শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য (Individualistic & Socialistic aims of Education):

শিক্ষাতত্ত্বের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি আপাতবিরোধী দুই ভাবধারা শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয়ে এক দ্বন্দের সৃষ্টি করেছে—একটি ব্যক্তি-তন্ত্রবাদ, অন্যটি সমাজতন্ত্রবাদ। এ দুই মতবাদ মূলতঃ রাজনীতিবিজ্ঞানের অংগীভূত এবং রাষ্ট্রের কর্তব্যের পরিধি নির্ধারণই এদের মূল বক্তব্য।

শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তিতান্ত্রিক না সমাজতান্ত্রিক এ বিতর্ক খুব প্রাচীন নয়। প্রাচীনকালে এ দ্বন্দ্ব খুব প্রকট ছিল না। আধুনিককালে মনস্তত্ত্ব ও সমাজ-বিজ্ঞানের বহুল অধ্যয়ন, অনুশীলন ও প্রচলনের ফলে এ দ্বন্দ্ব দানা বেঁধেছে। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তির সংগে পরিবেশের সংগতিসাধন এবং এ ব্যাখ্যায় ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। অন্যদিকে সমাজবিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় শিক্ষার উদ্দেশ্য সমাজ সংরক্ষণ ও সমাজ প্রগতি। বলা বাহুল্য এখানে সমাজের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। এই দুয়ের দ্বন্দ্ব শিক্ষাতত্ত্বের ইতিহাসে বারবার উপস্থিত হয়েছে এবং আধুনিক কালে তীব্র আকার ধারণ করেছে। আমরা এই দুই মতবাদ নিয়ে আলোচনা করব।

(ক) ব্যক্তিতন্ত্রবাদ (Individualism): ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদে প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা বলে গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তি তার জন্মের সংগে তার নিজস্ব প্রবৃত্তি, প্রবণতা, অনুভূতি, অনুরাগ, আবেগ নিয়ে এ পৃথিবীতে উপস্থিত হয়। এক কথায় ব্যক্তি তার দৈহিক ও মানসিক কতকগুলি বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মে। সে বৈশিষ্ট্যগুলি তার নিজস্ব এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলির বিকাশ-সাধনের উপর ব্যক্তির অস্তিত্ব নির্ভর করে।

ইতিহাসে এমন এক যুগ ছিল যখন ব্যক্তি ছিল, কিন্তু সমাজ ছিল না। ব্যক্তির প্রয়োজনেই সমাজের সৃষ্টি। অগ্রে ব্যক্তি পরে সমাজ। সমাজের সংগে বা রাষ্ট্রের সংগে ব্যক্তির সম্পর্ক কৃত্রিম, স্বাভাবিক নয়।

ব্যক্তিতন্ত্রবাদ প্রতিটি ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা দাবী করে। ব্যক্তির অন্তর্নিহিত জন্মসূত্রে লব্ধ সকল সম্ভাবনার অব্যাহত বিকাশ প্রয়োজন। তার উপর শুধু ব্যক্তির অস্তিত্ব নির্ভর করে না, ব্যক্তির মংগলও নির্ভর করে। সভ্যতা-সংস্কৃতিতে, সাহিত্য-শিল্প দর্শনে আমরা ব্যক্তিগত প্রতিভার দানই লক্ষ্য করি। যে নব নব আবিষ্কারে এই পৃথিবীতে মানুষের জয়যাত্রা ঘোষিত হচ্ছে তা ব্যক্তিগত স্বাধীন চিন্তা ও প্রতিভার অবদান মাত্র।

শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয়ে ব্যক্তিতন্ত্রবাদের বক্তব্য অত্যন্ত পরিষ্কার। ব্যক্তির মর্যাদা, স্বাধীনতা, ব্যক্তির চাহিদা, ব্যক্তির সম্ভাবনা শিক্ষার প্রধান বিবেচ্য। ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও পরিবেশের সংগে সংগতিবিধানই শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য। সকল প্রকার সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও অনুশাসন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে অনভিপ্রেত।

প্রাচীন ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যক্তির মহিমার উপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বেশী। বেদ, উপনিষদের শিক্ষাদর্শ মূলতঃ ব্যক্তিকেন্দ্রিক। 'আত্মানং বিদ্ধি' বা আত্মোপলব্ধিই প্রাচীন ভারতের শিক্ষাদর্শ। ব্যক্তির আত্মসাধনাই ব্রহ্মসাধনা। শিক্ষার সহায়তায় ব্যক্তি তার নিজস্ব পারমার্থিক মুক্তির অনুসন্ধান করে। সমাজের চাহিদা, সমাজ-চেতনা বা সমাজ-মনের বক্তব্য ও আবেদন এ শিক্ষায় অনাদৃত। প্রাচীন গ্রীসদেশের সোফিস্টরা ছিলেন উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সমর্থক। ব্যষ্টিই তাদের কাছে সকল মূল্যের নিয়ামক। শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তির চাহিদাকে চরিতার্থ করা। গ্রীসদেশের এথেন্স রাষ্ট্রের শিক্ষা-ব্যবস্থায় এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপস্থিতিই আমরা লক্ষ্য করি। এথেন্সের রাষ্ট্রদর্শনে সমাজ বড় কথা নয়; ব্যক্তিই প্রধান বিবেচ্য।

ইদানীং কালে 'সামাজিক চুক্তি' (*Social Contract*) মতবাদের প্রবক্তা লক্ (*Locke*), রুশো (*Rousseau*) প্রভৃতি তাদের শিক্ষাদর্শনে ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদের প্রধান সমর্থক। তাদের বিশ্বাস, মানুষের ইতিহাসে প্রাক্‌সামাজিক একটি অধ্যায় ছিল। সমাজ এসেছে বহুকাল পরে মানুষের প্রয়োজনের উপকরণ রূপে। শিক্ষায় কোন সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বা অনুশাসন থাকবে না। ব্যক্তিকে পূর্ণ

স্বাধীনতা দেওয়া চাই তার সহজাত উপাদানের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য। রুশো তার অবিস্মরণীয় 'এমিল' গ্রন্থে শিশু এমিলের জন্য সামাজিক নিয়ন্ত্রণশূন্য ব্যক্তিতান্ত্রিক শিক্ষার কল্পনা করেছেন।

(খ) সমাজতান্ত্রিক মতবাদ (Socialism) : সমাজতন্ত্রবাদের মতে সমাজ বা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছাড়া ব্যক্তিকে কল্পনা করা যায় না। মানুষ সমাজের মধ্যেই জন্মে। অগ্রে সমাজ পরে ব্যক্তি। সামাজিক মংগল ও সংহতির মধ্যেই ব্যক্তির মংগল ও অস্তিত্ব সম্ভব। ব্যক্তিস্বার্থ সমাজস্বার্থে রূপান্তরিত করতে হবে। সমাজের স্বার্থে ব্যক্তি নিজেকে নিয়োজিত করবে।

সমাজ ছাড়া ব্যক্তির জীবন অসম্ভব। ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংগ্রামের সার্থকতা, নীতিবোধ, ধর্মবোধ, শিক্ষা, সংস্কৃতি সবই সামাজিক জীবনের মাধ্যমে বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে। একমাত্র সমাজই ব্যক্তির নিরাপত্তা, শান্তি, জীবিকার্জন প্রভৃতির চাহিদা মেটাতে পারে।

সমাজের সংগে মানুষের নাড়ির যোগ। মানুষ জন্মে সমাজে, জীবনের বিকাশ খোঁজে সমাজে, মরে সমাজে। তার সকল কর্ম, সকল কল্পনা, সকল ভাবধারণা সমাজের পটভূমিকায় রচিত হয়। সে তার দেহ মন নিয়ে তার নিজস্ব গণ্ডিতে বাস করে না—তার চিন্তার, কর্মের পরিধি নিজস্ব গণ্ডির সীমা ছাড়িয়ে যায়।

সমাজতন্ত্রবাদীদের মধ্যে যারা উগ্রবাদী তারা সমাজকে একটা জীবদেহের সংগে তুলনা করেন। স্পেন্সার (*Spencer*) সমাজকে একটি জীবদেহের সংগে তুলনা করে বলেন, প্রতিটি ব্যষ্টি হচ্ছে জীবদেহের এক একটি অংগ-প্রত্যংগ। দেহ ছাড়া একটি অংগ বা কোষের যেমন মূল্য নেই তেমনি সমাজ ছাড়া ব্যষ্টির কোন মূল্য নেই। একটি জীবকোষ দেহের মধ্যেই যেভাবে প্রাণ পায়, তেমনি ব্যষ্টিও সমাজের মধ্যেই বেঁচে থাকে। ভাববাদী দার্শনিক হেগেল (*Hegel*) সমাজকে একটি আধ্যাত্মিক জীবন বা মন বলে কল্পনা করেছেন। প্রতিটি ব্যষ্টিসত্তা সে আধ্যাত্মিক সত্তারই সীমিত প্রকাশ। সমাজ বা আধ্যাত্মিক জীবন ছাড়া ব্যষ্টির জীবন অবাস্তব এবং মূল্যহীন। ব্যষ্টি সমাজ মনেই তার অস্তিত্ব লাভ করে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সমাজতন্ত্রবাদের বক্তব্য হল, সমাজ-সংরক্ষণ ও সমাজ-প্রগতি। শিক্ষার উদ্দেশ্য সামাজিক চাহিদা ও প্রয়োজনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

সামাজিক মংগলকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য শিক্ষার আয়োজন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে সমাজ ব্যক্তির উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপকরণ—আর সমাজতন্ত্রবাদে ব্যক্তি সমাজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপকরণ এবং শিক্ষা সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার এক বড় হাতিয়ার। ব্যক্তির মঙ্গল ও স্বাধীনতার সহায়ক।

প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধধর্মের শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা সামাজিক চাহিদার প্রভাব লক্ষ্য করি। নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধসমাজের সংহতি ও সামাজিক মংগল সম্বন্ধেই শিক্ষা দেওয়া হত। প্রাচীন গ্রীসদেশে প্লেটো ব্যক্তির চাহিদাকে গুরুত্ব দেননি। সামাজিক শ্রেণী হিসেবেই তিনি ব্যক্তিকে বিবেচনা করেছেন এবং শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের চাহিদাকেই বড় করে দেখেছেন। গ্রীক্‌রাষ্ট্র স্পার্টায় সমাজতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠিত ছিল। ব্যক্তি সেখানে রাষ্ট্রের চাহিদা মেটানর জন্যই জীবনধারণ করত।

আধুনিক যুগে হিটলারের জার্মানীতে ও মুসোলিনীর ইতালীতে সমাজতান্ত্রিক শিক্ষাধারার প্রবর্তন হয়েছিল। রাষ্ট্রশক্তি ও সাম্রাজ্যশক্তি বৃদ্ধির জন্য সেদিন প্রয়োজন ছিল ব্যক্তির চাহিদাকে উপেক্ষা করে সমাজের চাহিদাকে শিক্ষাব্যবস্থায় চালু করা। আধুনিক কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র চীন ও রাশিয়া প্রভৃতি দেশে সমাজতান্ত্রিক শিক্ষার প্রচলনই আমরা লক্ষ্য করি। রাষ্ট্র বা সমাজের প্রয়োজন ও প্রগতির মাপকাঠি অনুযায়ী সে সব রাষ্ট্রে শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

(গ) ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার সমন্বয় (Reconciliation of Individualistic & Socialistic aims of Education): ব্যক্তিতন্ত্রবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ উভয়ই একদর্শিতা দোষে দুষ্ট। প্রথমটি ব্যক্তিকে বড় করে দেখে, দ্বিতীয়টি সমাজকে বড় করে দেখে। আসল কথা, সমাজ ছাড়া যেমন ব্যক্তির অস্তিত্ব সম্ভব নয়, তেমনি ব্যক্তি ছাড়া সমাজও সম্ভব নয়। সমাজ ছাড়া ব্যক্তির অস্তিত্ব অর্থহীন, আর ব্যক্তি ছাড়া সমাজের অস্তিত্ব মূল্যহীন। ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পর পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে, ব্যক্তি যে অর্থে সমাজকে সৃষ্টি করে, সমাজও সেই অর্থে ব্যক্তিকে সৃষ্টি করে। একটা সৃজনশীল সমন্বয়ের মধ্যে ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্ক-বিজড়িত।

শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যক্তিতন্ত্রবাদ ব্যক্তির চাহিদা ও ব্যক্তিত্বের স্বাধীন বিকাশের যে গুরুত্ব দিয়েছে তা সর্বদা সমর্থনযোগ্য। কিন্তু এই মতবাদ সামাজিক চাহিদা

ও নিয়ন্ত্রণকে পুরোপুরি অস্বীকার করেছে। বার্নস্ (*C. D. Burns*) বলেন, ব্যক্তিতন্ত্রবাদ সামাজিক উদ্দেশ্য এবং ব্যক্তির কাজের সামাজিক প্রতিক্রিয়াকে উপেক্ষা করে। আসলে, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে সামাজিক অবদানকে অস্বীকার করা চলে না।

অন্যদিকে সমাজতন্ত্রবাদ সামাজিক চাহিদা ও সমাজ-সংরক্ষণের উপর যে গুরুত্ব দিয়েছে তাও সমর্থনযোগ্য। সমাজ ছাড়া ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ সম্ভব নয়। সুতরাং শিক্ষাব্যবস্থায় সমাজের বক্তব্য ও নিয়ন্ত্রণ থাকবে, এ সত্যকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আধুনিক দৃষ্টিভংগী এই দুই আপাতবিরোধী মতবাদের সংহতি আনার চেষ্টা করেছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তি ও সমাজের চাহিদার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হবে। এ দুয়ের সার্থক সমন্বয়ের উপর নির্ভর করছে শিক্ষার সার্থক উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন হচ্ছে, এ সমন্বয় সম্ভব হবে কিভাবে? ব্যক্তি ও সমাজের বিশেষ ধরনের সম্পর্ক ছাড়া এ সমন্বয় সম্ভব নয়। অর্থাৎ এমন এক সমাজব্যবস্থার প্রয়োজন যে সমাজে ব্যক্তি ও সমাজের মূল্য সমানভাবে স্বীকৃত। যে সমাজে ব্যক্তি সমাজের যূপকাষ্ঠে বলি প্রদত্ত হয় না, যে সমাজ ব্যক্তির মর্যাদা ও অধিকারের মধ্যে আপনার প্রতিষ্ঠা স্থাপন করে, সে সমাজেই এ সমন্বয় সম্ভব। ডিউই বলেন, একমাত্র গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায়ই এই দুই শিক্ষাদর্শের একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ সংহতি সম্ভব।

৭। গণতন্ত্র ও শিক্ষা (Democracy and Education):*

জন ডিউই বলেন, ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক শিক্ষাদর্শের সার্থক সমন্বয় এবং সংহতি যে বিশেষ আদর্শ সমাজব্যবস্থায় সম্ভব যে সমাজব্যবস্থা হবে গণতান্ত্রিক। তাঁর '*Democracy and Education*' বইতে গণতন্ত্রকে ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, গণতন্ত্র নিছক একটা সরকার (Government) নয়, তার চাইতে আরও ব্যাপক। গণতন্ত্র বলতে প্রধানতঃ বোঝায় সংঘবদ্ধ জীবন,

* এ প্রসংগে ডিউইর শিক্ষাদর্শন দ্রষ্টব্য।

যৌথভাবে বাস করার নৈতিক দায়িত্ব এবং অভ্যাস। প্রকৃত গণতন্ত্র বলতে শুধু শাসনতন্ত্র বোঝায় না, উহা একত্রে বাস করা ও ভাব আদানপ্রদানের একটি বিশেষ জীবনদর্শন।

একমাত্র ত্রুটিপূর্ণ সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে বিভেদের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর সৃষ্টি করা হয়েছে। উহা অস্বাভাবিক এবং অসংগত। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব নেই। শিক্ষার দ্বারা নাগরিকদের মন যে পরিমাণে উন্নততর হয়, সমাজও সে পরিমাণে উন্নততর হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিক্ষার লক্ষ্য হবে ব্যক্তি ও সমাজের চাহিদার পরিতৃপ্তি।

গণতান্ত্রিক শিক্ষার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে ডিউই বলেন, যে সমাজ তার প্রতিটি ব্যক্তিকে সামাজিক মংগলসাধনে সমান ভাবে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেয়, সে সমাজ গণতান্ত্রিক। এ সমাজব্যবস্থায় যে বিশেষ ধরনের শিক্ষা প্রবর্তিত হয়, সে শিক্ষা প্রতিটি ব্যক্তির সকল সমাজ-সম্পর্ক ও সমাজ-নিয়ন্ত্রণে নিজস্ব আগ্রহবোধ জন্মায়। এর ফলে সামাজিক ব্যক্তিত্ব (Socialised individuality) গড়ে ওঠে। আর সামাজিক পরিবর্তন সামাজিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে না।

ডিউই-র শিষ্য এবং তাঁর শিক্ষাদর্শের প্রচারক কিল্‌প্যাট্রিক *(Kilpatrick)* আরও সহজভাবে বলেছেন, শিক্ষা ও গণতন্ত্র পরস্পর অস্তিত্ব সূচনা করে। গণতন্ত্রের প্রসারের সংগে শিক্ষারও প্রসার ঘটে এবং শিক্ষার প্রসারের সংগে সংগে গণতন্ত্রের অস্তিত্বও ঘোষিত হয়। একটি আর একটির নিকট অপরিহার্য এবং পরিপূরক।

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় এই দুই বিবাদমান দৃষ্টিভংগীর সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা চলেছে। আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষাকে ব্যক্তিত্বমণ্ডিত এবং শিক্ষার্থীকে সমাজমণ্ডিত করে তোলা। পার্সিনান্ *(Percy Nunn)* যথার্থই বলেছেন, যে কোন সামাজিক আচরণ বলতে বুঝি তার পেছনে রয়েছে এক প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব আর সে প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব সামাজিক কোন মাধ্যম ছাড়া অর্থহীন।

সমাজতান্ত্রিক ও ব্যক্তিতান্ত্রিক দ্বন্দ্বের ঐতিহাসিক মূল্য আছে বটে কিন্তু দার্শনিক কোন মূল্য নেই।

৮। ভারতে শিক্ষার লক্ষ্য কি হওয়া উচিত? (What should be the aim of education in India ?):

শিক্ষার দার্শনিক আলোচনা প্রসূত মতবাদগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কোন মতবাদই স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। কোন একটি বিশেষ মতবাদকে শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য নির্ণায়ক হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। ভাববাদ মানুষের উন্নততর জীবন, আধ্যাত্মিক সত্তার বিকাশকে শিক্ষার উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করেছে। কিন্তু সামাজিক জীবন, বাস্তব ইতিহাস প্রভৃতি ভাববাদীদর্শনে উপেক্ষিত। স্বভাববাদ শিশুর স্বাভাবিক বৃত্তি ও সম্ভাবনার বিকাশকেই শিক্ষার উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করেছে। কিন্তু কোন্ আদর্শে প্রবৃত্তির প্রকাশ ঘটবে এ ব্যাপারে স্বভাববাদ নীরব। জড়বাদ প্রাকৃতিক শক্তিকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রণে এনে ব্যক্তির জীবনে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন করা যায় সে উদ্দেশ্যেই শিক্ষাকে নিয়োজিত করতে চায়। ব্যক্তিসত্তা, ব্যক্তিত্ব বিকাশ প্রভৃতি জড়বাদে কোন স্বীকৃতি পায়নি। প্রয়োগবাদ শিক্ষাকে জীবনের সংগে সমব্যাপক বলে ঘোষণা করেছে—সভ্যতা ও সমাজ প্রগতির শ্রেষ্ঠ হাতিহার হিসেবে শিক্ষাকে স্বীকৃতি দিয়েছে—কিন্তু শিক্ষা যাকে কেন্দ্র করে জীবনধর্মী হয়ে ওঠে সে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ বা আত্মঅভিব্যক্তির বিশেষ কোন মূল্য প্রয়োগবাদে স্বীকৃত হয়নি। এজন্য যদি প্রশ্ন করা হয়: শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন্ মতবাদটি শ্রেষ্ঠ? আমরা তখন শিক্ষাবিদ্ রসের (*T. S. Ross*) অভিমত অনুসরণে বলতে পারি যে, ভাববাদী দৃষ্টি ভংগীকে প্রধান দৃষ্টি ভংগী হিসেবে আমাদের গ্রহণ করা উচিত এবং তার সহিত যথা সম্ভব প্রয়োগবাদ, স্বভাববাদ প্রভৃতির দৃষ্টিভংগী সংযুক্ত করা উচিত। 'ভারতে শিক্ষার কি লক্ষ্য হওয়া উচিত' এ প্রশ্ন সম্বন্ধেও আমাদের অভিমত হল কোন একটি বিশেষ লক্ষ্যকে ভারতীয় শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করা উচিত নয়। স্বাধীনভারতে শিক্ষার সমস্যা সমাধানের জন্য পর:পর তিনটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন (১৯৪৮–৪৯খ্রীঃ), স্যার লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়রের নেতৃত্বে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫২-৫৩খ্রীঃ) ডঃ ডি এস কোঠারীর নেতৃত্বে

শিক্ষাকমিশন (১৯৬৪-৬৬খ্রীঃ) শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয়ে ব্যাপক দার্শনিক দৃষ্টিভংগী অনুসরণ করেছেন। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও চরিত্র সংগঠনের সংগে আমাদের সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য প্রয়োগবাদী, জড়বাদী দৃষ্টিভংগীও এসব কমিশন গ্রহণ করেছেন। ১৯৪৭ খ্রীঃ প্রায় দুশো বছরের পরাধীনতার পর ভারত স্বাধীন হয়। এর ফলে ভারতীয় সমাজে কেবলমাত্র রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন সূচিত হয়নি একটি নতুন জাতি ও দেশ গঠনের দায়িত্বও ভারতীয়দের উপর এসে পড়ে। জাতি হিসেবে আমরা একটি প্রজাতান্ত্রিক গণতন্ত্র সৃষ্টির জন্য শাসনতন্ত্র গ্রহণ করেছি। রাজনৈতিক মুক্তির সংগে সংগে অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তিও আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে ব্রতী হয়েছি। এই পটভূমিকায় ভারতীয় শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণীত হওয়া উচিত।

একটা জাতির পুনর্গঠন ব্যক্তি চরিত্রের যথাযথ বিকাশ ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। বিশেষভাবে গণতান্ত্রিক সমাজে যেখানে প্রতিটি ব্যক্তিকে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ সত্তা বলে গ্রহণ করা হয় সেখানে ব্যক্তিতান্ত্রিক উদ্দেশ্য ও ভাববাদী উদ্দেশ্য শিক্ষায় গ্রহণ করা উচিত। ভারতীয় শিক্ষায় ব্যক্তির আত্মবিকাশ বা আত্মজ্ঞানকে প্রথমতঃ উদ্দেশ্যরূপে স্থির করা চাই।

অন্যদিকে বিজ্ঞানের অকল্পনীয় উন্নতির ফলে শিল্প ও যান্ত্রিক যুগের উদ্ভব হয়েছে। জড়বাদ বিশ্বাস করে প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণে এনে ব্যক্তি ও সমাজের দারিদ্র্য মোচনে শিক্ষাকে কাজে লাগান উচিত। বিদেশী শাসকের অবহেলা ও শোষণের ফলে ভারতের আপামর জনমানব দুঃখ দুর্দশার করাল গ্রাসে পতিত। সুতরাং বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার দ্বারা বৈষয়িক তথা অর্থনৈতিক পরিবর্তন সংসাধিত না হলে দারিদ্র্য থেকে আমাদের মুক্তি নেই। অতএব দেখা যাচ্ছে ভাববাদের সংগে জড়বাদী শিক্ষাদর্শের সামঞ্জস্য ঘটান প্রয়োজন।

ব্যক্তি বিশেষের যেমন বিশেষ বিশেষ চাহিদা বর্তমান, তেমনি বিশেষ বিশেষ যুগের নিজস্ব চাহিদা বর্তমান। বৈজ্ঞানিক যুগের চাহিদা আর কৃষি-যুগের চাহিদা এক নয়। স্বভাববাদ শিশু বা শিক্ষার্থীর চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়েছে। ব্যক্তি বিশেষের চাহিদা শিক্ষায় স্বীকৃত না হলে শিক্ষা অকৃত্রিম ও যান্ত্রিক হয়ে

পড়বে। অন্যদিকে প্রয়োগবাদ ব্যক্তি চাহিদার সংগে সামাজিক চাহিদা বা যুগের চাহিদারও গুরুত্ব দিয়েছে। ভারত কৃষিনির্ভর সমাজ ব্যবস্থা থেকে যান্ত্রিক শিল্পসভ্যতার আঙিনায় প্রবেশ করছে; তার জন্য প্রস্তুতি চাই। অন্যদিকে জনজাগরণের সংগে ব্যক্তির চাহিদাও প্রাধান্য পাবে। সুতরাং ভাববাদের সংগে জড়বাদ, স্বভাববাদ প্রয়োগবাদ প্রভৃতির সম্মিলন ঘটিয়ে ভারতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য নিরূপিত হওয়া উচিত।

প্রশ্নাবলী

1, The goal of education is sometimes said to be adjustment.—Discuss

2. Examime different views rega ding the aims of education.

3. Give a critical estimate of some of the aims of education put forth by different educatonists and say what seems to you to be the most satisfactory aim of education.

4. What do you understand by the individualistic and socialistic aims of education? Which would you advocate and why?

5. Reconcile the invidualistic and socialistic aims of education.

6. "The general aims of educaton should be to offer the fullest possible scope to individuality, while keeping in view the claims and needs of society."—Discuss

7. What do you know of Democratic concept in education?

8. What, in your opinion, should be the aim of education in India?

চতুর্থ অধ্যায়

শিক্ষার উপাদান

(Factors of Educaton)

শিক্ষাকে আমরা জীবনের অভিজ্ঞতা বলেই ব্যাখ্যা করি। নিত্য নতুন পরিবর্তনশীল অভিজ্ঞতা আমরা আহরণ করি। আমরা যে পরিবেশে জন্মগ্রহণ করি ও বাস করি সে পরিবেশের ধর্মই হল গতিশীলতা। সুতরাং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তাকে আমরা কাজে লাগানর চেষ্টা করি—জীবনের সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করি। ব্যক্তির ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য, সমাজের ক্ষেত্রেও তাই। ব্যক্তি ও সমাজের অস্তিত্ব নির্ভর করছে শিক্ষার উপর, অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানর উপর, সদা পরিবর্তনশীল পরিবেশের সংগে সংগতি সাধনের উপর।

শিক্ষার উপাদান বলতে বুঝি শিক্ষার্থী ও তার পরিবেশ। পরিবেশ ও শিক্ষার্থী এ দুয়ের মিথস্ক্রিয়ার ফলেই যে নতুন অবস্থা, যে নতুন জগতের সৃষ্টি হয়, তা-ই শিক্ষা। যে পরিবেশগুলির মধ্যে শিক্ষার্থী তার অভিজ্ঞতা আহরণ করে তাকে বলে শিক্ষার মাধ্যম। শিক্ষার্থী ও শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে সৃষ্টি হয় শিক্ষার জগৎ। একদিকে শিক্ষার্থী অন্যদিকে শিক্ষক, পাঠক্রম এবং অন্যান্য শিক্ষামূলক পরিবেশ হচ্ছে শিক্ষার উপাদান। এক্ষণে এই উপাদানগুলি সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করব।

১। শিক্ষার্থী (Pupil) :

শিক্ষার প্রথম উপাদান হচ্ছে শিক্ষার্থী। সাধারণ অর্থে যে স্কুল কলেজে শিক্ষাগ্রহণ করে তাকেই শিক্ষার্থী বলা হয়। কিন্তু ব্যাপক অর্থে প্রতিটি মানবসন্তানই শিক্ষার্থী। আর এই শিক্ষার্থীর পরিচয় জীবনের একটি নির্দিষ্ট বয়সেই শেষ হয় না। সারা জীবনভরই আমরা শিক্ষার্থী। বেঁচে থাবার আরেক অর্থ হল শিক্ষা গ্রহণ করা।.

মানবশিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন সে অত্যন্ত অসহায়। এ কথা সত্য যে, তার জন্মসূত্রে লব্ধ সহজাত প্রবৃত্তি ও অন্যান্য গুণাবলী তার দেহের

কোষ বৃদ্ধির সংগে সংগে প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে বিকাশের পথে চলে। কিন্তু যে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশে মানব শিশু বর্ধিত হয়, সে পরিবেশ সদা পরিবর্তনশীল। শিশুর জীবন ধারণের পক্ষে সেই পরিবেশ অনুকূল হবে কিনা তার স্থিরতা নেই। সময় বিশেষে এই পরিবেশ শিশুর জীবনের অস্তিত্বের পরিপন্থী। তাই মানব সন্তানকে তার পরিবেশের সংগে সংগতি স্থাপন করতে হবে। পরিবেশকে তার জীবন ধারণের উপযোগী করে কাজে লাগাতে হবে।

পরিবেশকে কাজে লাগানর কৌশলই শিক্ষা। এই শিক্ষার উপর আমাদের ব্যক্তিগত অস্তিত্বই শুধু নির্ভর করে না, সমাজের অস্তিত্বও এর উপর নির্ভরশীল। তাই সমাজের ও ব্যক্তির প্রয়োজন মেটানর জন্যই শিক্ষা।

অন্যান্য ইতর প্রাণীর পক্ষে দেহগত চাহিদার পরিতৃপ্তি হলেই জীবন ধারণ সম্ভব। পরিবেশ অনুযায়ী প্রকৃতি ইতর প্রাণীর বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা সৃষ্টি করেছে। মরুভূমিতেই উটের বাসস্থান—তাই প্রচুর জল বহনের ক্ষমতা তার পাকস্থলীতে আছে। মানুষের সন্তান মরুভূমিতে যা, কলকাতা শহরেও তা। মরুভূমিতে জন্মালেই সে তার পাকস্থলীতে জলবহনের বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে জন্মাবে না। সেখানে জন্মে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে সে অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃতিকে সে যতদূর সম্ভব নিয়ন্ত্রণ করে, তার জীবনের অনুকূল করে তোলে। কিন্তু এখানেই তার কাজ শেষ হয়ে যায় না। মাঝে মাঝে যখন তার প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ জটিল সমস্যা নিয়ে উপস্থিত হয়, তখন তার জন্মগত ক্ষমতা ও অভ্যস্ত আচরণ বিশেষ কোন কাজে লাগে না। তখন সে পুরনো আচরণ পরিত্যাগ করে নতুন আচরণ আয়ত্ত করে। একমাত্র শিক্ষাই তা সম্ভব করে তোলে।

আচরণের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, প্রয়োজন অনুযায়ী পুরাতন আচরণকে পরিবর্জন ও নতুন আচরণ পরিগ্রহণ—একে বলা হয় নমনীয়তা (Plasticity)। একমাত্র মানুষ এই বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। আর এই নমনীয়তাই শিক্ষাকে সম্ভব করে তোলে।

শিক্ষার্থী তার জীবনের প্রয়োজন চরিতার্থ করার জন্য শিক্ষাগ্রহণ করে। শিক্ষার মূলে আছে শিক্ষার্থীর চাহিদা। শিক্ষার্থীর এই চাহিদার একদিকে সে

তার নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখে, অন্যদিকে সমাজও তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে। নমনীয়তা মানুষের সহজাত ধর্ম। এ গুণের অধিকারী বলেই মানুষ সভ্যতা সংস্কৃতির ইতিহাস রচনা করতে পেরেছে।

২। শিক্ষক (Teacher) :

শিক্ষার দ্বিতীয় উপাদান হচ্ছে শিক্ষক। শিক্ষক শিক্ষাব্যবস্থার মেরুদণ্ড। আজকের যুগে যিনি শিক্ষায়তনে শিক্ষার্থীকে শিক্ষাপ্রদান করেন তাঁকেই শিক্ষক বলে। ব্যাপক অর্থে, যিনি তাঁর সঞ্চিত অভিজ্ঞতা মানবশিশুর নিকট উপস্থাপিত করেন তিনিই শিক্ষক। শিশু শিক্ষাগ্রহণ করে তার পরিবেশ থেকে। শিক্ষক সে পরিবেশেরই অংশ বিশেষ। পিতামাতা এবং অন্যান্য যে সমস্ত ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসে শিশু তার অভিজ্ঞতার পরিধি বিস্তার করে তারা সবাই এক অর্থে শিক্ষক। আধুনিক সভ্যতার সমাজের রূপ জটিল এবং আজকে 'শিক্ষক' শব্দকে আমরা বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করি। যিনি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রদান করেন তিনিই শিক্ষক। সমাজের পক্ষ থেকে এসব নির্বাচিত ব্যক্তিরাই শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অভিজ্ঞতাকে তরুণ শিক্ষার্থীর নিকট পরিবেশন করার গুরু কর্মভার শিক্ষককেই নিতে হয়।

শিক্ষায় শিক্ষকের স্থান ও তার গুণাবলী সম্বন্ধে আমরা অন্য অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করব।

৩। পাঠক্রম (Curriculum) :

শিক্ষার তৃতীয় উপাদান হল পাঠ্যসূচী। আভিধানিক অর্থে পাঠক্রমের অর্থ হল : কোন নির্দিষ্ট মানের (values) জন্য শিক্ষার্থীর উপযোগী বিষয়বস্তুর সমাবেশ। কিন্তু পাঠক্রম বা পাঠ্যসূচী এ আভিধানিক অর্থেই সীমিত নয়। শুধু নির্দিষ্ট বিষয়াবলীর আয়োজন নয়—পাঠ্যসূচী বলতে শিক্ষায়তনের পরিবেশ নির্ধারিত পাঠ্যবিষয়ের সংগে সংগে শিশু অন্যান্য যে বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তাও বোঝায়।

জীবনের বিস্তৃত ক্ষেত্রের উপযোগী সুনির্বাচিত বিষয়াবলী ও পরিবেশ পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। শিক্ষার সার্থকতা নির্ভর করে পাঠক্রমের

নির্বাচনের উপর। পাঠক্রম সংকীর্ণ হলে, বাস্তববিমুখী হলে, বৈচিত্র্যহীন হলে শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষার কোন সার্থকতা থাকে না।।

৪। শিক্ষামূলক পরিবেশ (Educational Environment) :

শিক্ষার চতুর্থ উপাদান শিক্ষামূলক পরিবেশ। শিক্ষামূলক পরিবেশ বলতে শিশু-মনে শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা সঞ্চারী পরিবেশকেই বুঝব। এই পরিবেশ শিশুর মনে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে, নানা তথ্য ও সংবাদ পরিবেশন করে শিশুর বা শিক্ষার্থীর কৌতূহল নিবৃত্ত করে, নতুনকে জানার, অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যকে আমন্ত্রণ করার মনোভাব জাগ্রত করে।

শিক্ষামূলক পরিবেশের মধ্যে রয়েছে সামাজিক ও সংস্কৃতিমূলক সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সামাজিক শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান বলতে কেবলমাত্র বিদ্যায়তনকেই বুঝি না, পাঠাগার, সভাসমিতি, খেলারদল, প্রদর্শনী সবই বুঝি। সংস্কৃতিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে ধর্মীয় সংঘ, সংগীত-সভা, সাহিত্য-বাসর ইত্যাদি।

শিক্ষামূলক পরিবেশ পুঁথিগত বিদ্যাদানেই সমাপ্ত নয়। খেলার মাঠ থেকে শুরু করে নাটক, অভিনয়, বিতর্কসভা, সমাজসেবা, সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ প্রভৃতির মধ্যে শিক্ষার্থী বিচিত্র অভিজ্ঞতা আহরণ করে। এ সবই তার শিক্ষামূলক পরিবেশ।

আধুনিক যুগে শিক্ষামূলক পরিবেশ আরও ব্যাপকতর এবং সূক্ষ্ম হয়ে উঠেছে। দৈনিক সংবাদপত্র, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকা, বেতার যন্ত্র, টেলিভিশন এবং অন্যান্য আমোদ ও অবসর বিনোদনের সরঞ্জামের আয়োজনও শিক্ষামূলক পরিবেশ। মানব মনে এগুলির প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া অপরিসীম।

প্রশ্নাবলী

1. Describe the factors of education.

2. What do you understand by a factor of education? How the environmental factors influence the education of the child in modern age?

পঞ্চম অধ্যায়

শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা : শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার ইতিহাস ও তাৎপর্য। শিশু : তাহার বংশধারা ও পরিবেশ

(Child-Centred Education ; History and Significance. The child : His nature and nurture.)

শিক্ষার প্রধান ও প্রথম উপকরণ শিশু বা শিক্ষার্থী। কিন্তু প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুর চাহিদাকে মোটেই গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। সমাজের যারা প্রাচীন, যারা বয়স্ক তাদের ইচ্ছা ও অভিরুচি শিশুর জীবনে প্রতিফলিত করাই ছিল শিক্ষার উদ্দেশ্য। প্রাচীনের বিশ্বাস ছিল তাদের অভিজ্ঞতা এবং অভিলাষের সার্থক সঞ্চালনই শিক্ষা। তারা ভাবতেন, শিক্ষার একমাত্র তাৎপর্য হচ্ছে শিশুর মধ্যে সামাজিক অনুশাসন এবং ধর্মীয় বা নৈতিক শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত করা। শিশু কি শিখতে চায়, তার নিজস্ব কোন চাহিদা আছে কিনা এটা তাদের কাছে বিবেচনার বিষয় ছিল না। তারা শিশুকে কি শিক্ষা দিতে চান, শিশু তাদের কাছ থেকে কোন্ কোন্ অভিজ্ঞতা আহরণ করবে এ সবই ছিল প্রাচীনদের বক্তব্য। শিশু সক্রিয়ভাবে নিজের চাহিদা ও ক্ষমতা অনুযায়ী সে শিক্ষা গ্রহণ করত না, তার মনের উপর এ শিক্ষা চাপিয়ে দেওয়া হত। শিক্ষক হলেন জ্ঞানদাতা, শিশু হল গ্রহীতা। শৃঙ্খলাবাদীগণ শিশুকে শিক্ষার দ্বারা সামাজিক রীতি-নীতি ও অনুশাসন মেনে নেওয়ার দায়িত্ব শেখাতেন। বলা বাহুল্য, এ শৃঙ্খলা ছিল বহির্জাত শৃঙ্খলা ; শৃঙ্খলের নামান্তর মাত্র। তাই শিক্ষা ছিল শিক্ষক-কেন্দ্রিক, গতানুগতিক, প্রাণহীন জড় গতি মাত্র।

আজকের শিক্ষা প্রগতিশীল বা শিশুকেন্দ্রিক। আজ আমরা বিশ্বাস করি হেমলেট্ ছাড়া হেমলেট্ নাটক যেমন অর্থহীন, তেমনি শিশুর চাহিদা ও আগ্রহ ইত্যাদির বিবেচনা ছাড়া শিক্ষাব্যবস্থাও অর্থহীন। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে নানা যুগে নানা দেশে শিক্ষায় শিশুর বক্তব্যকে গুরুত্ব দেওয়ার নীরব চেষ্টা চলেছে। কিন্তু নব্য শিক্ষাতত্ত্বে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা বলে যে প্রগতিশীল শিক্ষা ব্যবস্থার বুনিয়াদ রচিত হয়েছে, তা বিংশ-শতাব্দীর অবিস্মরণীয় দান।

জগতে সবচেয়ে যা পুরাতন সে হচ্ছে শিশু। আদিম শিশু যেমন ছিল কৌতূহলপ্রিয়, আজকের যন্ত্রযুগের শিশুও তেমনি। পুরাতন বলেই তাকে নিয়ে কোন সমস্যার কথা আমরা এতদিন গুরুত্ব দিয়ে ভাবিনি। সে পুরাতন শিশুকে আমরা নতুন ভাবে বিংশ-শতাব্দীতে আবিষ্কার করেছি। তাই বলা হয়, বিংশ-শতাব্দী শিক্ষাজগতে শিশুর নবজাগরণের যুগ (*Renaissance*)। এক্ষণে আমরা শিশুশিক্ষার ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করব।

১। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার ইতিহাস (History of child-centred Education) :

প্রাচীন রোমান্ শিক্ষাবিদ্ কুইন্টিলিয়ানের (*Quintilian*) শিক্ষা-পদ্ধতিতে আমরা শিশুর প্রাধান্য লক্ষ্য করি। গুরুগৃহে শিক্ষা ব্যবস্থার চাইতে বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষাদান কার্যের গুরুত্ব তিনি বেশী দিয়েছেন। শিশুকে দৈহিক শাস্তি দিয়ে ভয়গ্রস্ত না করে শিশুর সামর্থ্য ও আগ্রহ অনুযায়ী তাকে শিক্ষা দেওয়ার কথাও তিনি বলেছেন। শিক্ষক শিশুর মনে শিক্ষার জন্য আগ্রহ সৃষ্টি করবেন, উপযোগী মনোভাব তৈরী করবেন, এসব ভাবধারাও কুইন্টিলিয়ান পোষণ করতেন। নিঃসন্দেহে এ কথা বলা যায় যে, শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার তিনি একজন প্রধান সমর্থক।

শিশু-শিক্ষার ইতিহাসে এর পর যার নাম স্মরণীয় তিনি হলেন পঞ্চদশ-শতাব্দীর মানবতাবাদী শিক্ষক ইরাসমাস (*Erusmus*) মানবতাবাদীরা বুদ্ধিকে জীবনের সম্বল করতে চাইলেন, সকল প্রকার গোঁড়ামি এবং অন্ধপ্রথার দাসত্ব থেকে তাঁরা মুক্তির আন্দোলন শুরু করলেন। শিক্ষাব্যবস্থা ছিল তখন প্রাচীন পুঁথি অধ্যয়নে ও ধর্মের ব্যাখ্যা শ্রবণে সীমাবদ্ধ। ইরাসমাস এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলেন। শিক্ষাকে তিনি বাস্তবজীবনের উপর নির্ভরশীল করতে চাইলেন। শিক্ষায় খেলাধূলা এবং শিশুর স্বাস্থ্যচর্চা ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করলেন। তাঁর মতে শিক্ষকের উচিত প্রথমতঃ, শিশুকে পর্যবেক্ষণ করা, তারপর শিক্ষাপ্রদান করা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইরাসমাস তাঁর কালের ঊর্ধ্বে যেতে পারেননি। শিক্ষাকে বাস্তবধর্মী করে তোলা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। কেননা, তাঁর শিক্ষাও ছিল ধর্মভিত্তিক এবং গতানুগতিক পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মানবতাবাদ সপ্তদশ শতাব্দীতে বাস্তবতাবাদের আন্দোলনে এসে মিলিত হল। শিক্ষা সম্বন্ধে বাস্তববাদীরা বলেন যে জীবনের কর্মক্ষেত্রে যা প্রয়োজন একমাত্র তাই শিক্ষা দেওয়া উচিত। শিক্ষা বলতে একমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা বোঝায় না—মানুষ আর তার পরিবেশকে কেন্দ্র করেই শিক্ষাপদ্ধতি রচিত হওয়া উচিত। বাস্তবতাবাদী শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে যাঁর নাম সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য তিনি হলেন কমেনিয়াস (*Comenius*)। তিনিই সর্বপ্রথম শিশু-শিক্ষার পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁর মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, শিশুকে স্বাভাবিক ভাবে শিক্ষা দিতে হবে। শিশুর সামনে বিষয়বস্তু সরাসরি তুলে ধরতে হবে। বাস্তবের সংগে মিল রেখে শিশুকে শেখাতে হবে। শিশুকে কি কি শেখাতে হবে এসব বিষয় সম্বন্ধে তিনি শুধু বই লিখেননি, তাদের জন্য শিক্ষাপদ্ধতিরও উদ্ভাবন করেছেন। এই শিক্ষাপদ্ধতিকে তিনি 'প্রকৃতির পদ্ধতি' (**Method of Nature**) নামে অভিহিত করেছেন।

শিশু-শিক্ষার ইতিহাসে যাঁর নাম প্রাতঃস্মরণীয় তিনি হলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক রুশো (*Rousseau*)। রুশো ছিলেন প্রকৃতিবাদের সমর্থক। তিনি বিশ্বাস করতেন, সকল প্রকার সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যষ্টির স্বাধীনতার পরিপন্থী—কেননা সমাজ মানুষের কৃত্রিম সৃষ্টি। তাই রুশো তথাকথিত সামাজিক অনুশাসন ও পরিবেশ থেকে শিশুর মুক্তি কামনা করলেন। শিশুকে তিনি প্রকৃতির সহজ পরিবেশের মধ্যে শিক্ষা দিতে বললেন। শিশুর সহজাতপ্রবৃত্তি, প্রবণতা, আবেগ, আগ্রহ ইত্যাদিই নির্ধারণ করবে শিক্ষাধারা। সমাজের বয়স্কদের অভিপ্রায় অনুযায়ী শিশুর উপর কৃত্রিম শিক্ষাব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়া হবে না। রুশোর শিক্ষাদর্শে বহিঃশৃঙ্খলাকে মোটেই গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তিনি বলেছেন, শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশের সংগে সংগে তার অন্তর থেকেই শৃঙ্খলাবোধ জেগে উঠবে। শিশুর চাহিদাই হবে শিক্ষাধারার মূল বিবেচ্যবস্তু, শিক্ষক শিক্ষাকার্যে শিশুর সহায়ক মাত্র, নিয়ন্ত্রক নন্। বলা বাহুল্য, রুশোর এই ভাবধারাই আধুনিক প্রগতিশীল শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার মর্মবাণী।

রুশো জ্ঞানযোগী, তিনি কর্মযোগী ছিলেন না। সনাতন শিক্ষক-কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি এক বিপ্লব আনেন বটে, কিন্তু তার শিক্ষাদর্শকে বাস্তবে রূপ দেবার আয়োজন তিনি করেননি। বহু শতাব্দী ধরে অবহেলিত শিশু মুক্তি পেল বটে, কিন্তু তার মুক্তিকে স্বীকৃতি জানাবে কে? তাই নানা

দেশে রুশোর আদর্শে অনুরাগী শিক্ষাবিদ্‌রা রুশোর পরবর্তী যুগে তাঁর শিক্ষাদর্শকে বাস্তবে রূপ দেবার প্রচেষ্টা করেন। রুশোর মূল বক্তব্য ছিল, শিক্ষক শিক্ষা দেবার আগে শিশুর চাহিদা, তার অনুযোগ, অনুরাগ ইত্যাদি জেনে নেবার চেষ্টা করবেন। এক কথায় শিশুর মনকে বিবেচনা করেই শিক্ষক শিক্ষা দেবেন। অর্থাৎ শিক্ষাকে মনস্তাত্ত্বিক নিয়মাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত করা চাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত কয়েকজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদের কঠিন সাধনার ফলে রুশোর শিক্ষাদর্শ বাস্তব রূপ লাভ করে এবং বিশ্বপ্রসারী হয়ে ওঠে। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন পেস্টালৎসী (*Pestalozzi*), হার্বাট (*Herbert*) এবং ফ্রয়েবেল (*Froebel*)।

পেস্টালৎসী বলেন, শিশুর সামর্থ্য ও সম্ভাবনার একটা সুসংহত বিকাশই শিক্ষা। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে তিনি শিশুকে শুধু পুঁথিপত্রের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন নি, সংগে সংগে নানারকম কাজকর্মের ব্যবস্থাও করেন। শিশুর মনোভাবকে গভীর দরদ দিয়ে বিবেচনা করতে হবে; সহানুভূতির সাহায্যে শিশুর মনে শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত করতে হবে, সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়-সংযোগের দ্বারা শিক্ষা দিতে হবে, এ ছিল পেস্টালৎসীর শিক্ষাদর্শের মূলকথা।

জার্মান শিক্ষাবিদ হার্বাট তাঁর প্রসিদ্ধ মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব আত্মবীক্ষণের সাহায্যে (*Theory of Appeception*) শিশু-শিক্ষার ব্যাখ্যা করেন। শিশুর আগ্রহই হবে শিক্ষার নির্ধারক। হার্বাট ঘোষণা করলেন, যে শিক্ষার পিছনে কোন আগ্রহ নেই, সে শিক্ষার কোন মূল্য নেই।

হার্বাটের সমসাময়িক তাঁর স্বদেশীয় শিক্ষাবিদ্ ফ্রয়েবেল যে শিক্ষা ধারার প্রবর্তন করেন তা কিণ্ডার-গার্টেন নামে বিখ্যাত। শিক্ষা তাঁর মতে শিশুর আত্মবিকাশের সমার্থক। আর শিশুর আত্মবিকাশ সম্ভব হয় সৃজনশীল প্রচেষ্টার মাধ্যমে এবং সামাজিক সহযোগিতায়। বলা বাহুল্য, পুস্তকপাঠের সংগে সংগে খেলাধূলা, সংগীত-চর্চা, হাতের কাজ, সমবায় কর্মপদ্ধতিও তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষার মাধ্যমরূপে পরিগণিত হল।

উনবিংশ শতাব্দীতে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার ভিত্তি রচিত হলেও দেশে তার আন্দোলনের স্বীকৃতি বিংশ শতাব্দীতেই দেখা যায়। 'শিশুকেন্দ্রিক-শিক্ষা' শিক্ষাতত্ত্বে ও শিক্ষা ব্যবস্থায় বিংশ শতাব্দীতেই বাস্তবরূপ লাভ করে। বিংশ শতাব্দীতে অগণ্য শিক্ষাবিদ্ ও মানবতাবাদী কর্মযোগীদের প্রচেষ্টায়

শিশু-শিক্ষার আমূল পরিবর্তন হয়। এদের মধ্যে আমেরিকার শিক্ষাবিদ্ ডিউই ও ইটালীর শিক্ষাবিদ্ মন্টেসরী এবং ভারতের রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

বিংশ শতাব্দীতে শিশুশিক্ষায় যাঁর অবদান সবচেয়ে বেশী তিনি হলেন ডিউই। শিক্ষার পদ্ধতি, বিষয়বস্তু এবং উদ্দেশ্যকে তিনিই সর্বপ্রথম দার্শনিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক দিক থেকে ব্যাখ্যা করেন। ডিউই-র শিক্ষা পরিকল্পনা বর্তমান যুগে সকল দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার পথনির্দেশক।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শান্তিনিকেতনে প্রবর্তিত শিশুশিক্ষায় শিশুর সংগে প্রকৃতির (nature) নিবিড় সংযোগ স্থাপন করতে চেয়েছেন। শিশুর স্বাধীনতাবোধ, মুক্ত পরিবেশে শিশুর দৈহিক, মানসিক এবং আত্মিক বিকাশই রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত শিশুশিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। গান্ধীজী তাঁর বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের মাধ্যমে ভারতের সাংস্কৃতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে শিশু শিক্ষাকে কর্মভিত্তিক করে তোলার চেষ্টা করেন। তিনি শিশুদের-শিক্ষা যৌথকর্ম ও শিল্পের মাধ্যমে প্রদান করার ব্যবস্থা করেন।

ইটালীর প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ মণ্টেসরী *(Montessori)* শিশু শিক্ষায় আর এক নতুন ভাববন্যা আনেন। তিনি বলেন, শিশু শিক্ষা হবে স্বয়ং শিক্ষণ (auto-education)। শিশু তার নিজের আগ্রহ ও চেষ্টায় শিখবে। শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুর স্বাধীনতাকে আমরা স্বীকৃতি দেব—শিশুর উপর কোনরূপ নিয়ম আরোপ করা হবে না। বাধা নিষেধের গণ্ডিতে শিশুকে আবদ্ধ না রেখে তাকে স্বাধীনভাবে শিখতে দেওয়া হবে।

শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার গতিপ্রবাহ এবং ইতিহাস অতি সংক্ষিপ্তভাবে আমরা আলোচনা করেছি। শিশু-শিক্ষা সম্বন্ধে শেষ কথা আজও বলা হয়নি এবং কোনদিন বলা শেষও হবে না। এ নিয়ে নানা দেশে আজও গবেষণা, নানাজাতের পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ চলছে। আগামী দিনের মানব-সমাজ তাই নতুন তত্ত্ব ও তথ্যের প্রয়োগ উপভোগ করবে।

২। শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার তাৎপর্য (Significance of Child-centred Education):

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার তাৎপর্য আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই এ শিক্ষার শিশুই মধ্যমণি। শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশ, শিশুর স্বাধীনতা, তার

চাহিদা, আগ্রহ, অনুরাগ প্রভৃতিই শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার বিষয়বস্তু। শিশুকে কেন্দ্র করে যে পরিবেশ সব কিছুই শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় আলোচ্য বিষয়বস্তু। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বিভিন্ন চিন্তাধারা এর মূলে ক্রিয়াশীল। এই চিন্তাধারা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন শিক্ষাবিদের শিক্ষা-চিন্তায় এসে উপস্থিত হয়েছে এবং আজকের শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা এসব চিন্তাধারার এক সুন্দর সমন্বয়। এসব চিন্তাধারাকে আমরা মোটামুটি চারভাগে ভাগ করতে পারি—দার্শনিক বিচারপ্রসূত, মনস্তাত্ত্বিক, জীবতত্ত্বমূলক এবং সমাজতত্ত্বমূলক।

দার্শনিক চিন্তাধারা থেকে বলা হয়েছে শিশুর ব্যক্তিত্ব বা সম্ভাবনার বিকাশ সাধনই শিক্ষার উদ্দেশ্য। শিশুর ব্যক্তিত্বের দৈহিক, মানসিক এবং সামাজিক দিকগুলির এক সুসংহত বিকাশই শিক্ষা। প্রয়োগবাদী দার্শনিক ডিউই বলেন : শিক্ষা শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের সঙ্গে সমার্থক। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, স্বাধীনতা ছাড়া শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশ সম্ভব নয়। 'শিশুর স্বাধীনতার স্বীকৃতিই প্রগতিশীল শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার প্রধান তাৎপর্য। স্বভাববাদ, বাস্তবতাবাদ, জড়বাদ, প্রয়োগবাদ ইত্যাদি মতবাদ বিশ্বাস করে যে সত্যিকার জ্ঞান আসে একমাত্র সক্রিয়তার মাধ্যমে। সৃজনশীলতাই শিশুর ধর্ম। সক্রিয়ভাবে বাস্তবজগতের অভিজ্ঞতার দ্বারাই জ্ঞানলাভ করতে হয়।

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে মনোস্তত্ত্বের গবেষণা ও চর্চার ফলে শিশুর চরিত্র ও আচরণ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভংগীর আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। শিশু আর কাদামাটি নয় যে, শিক্ষক-শিল্পী তাঁর অভিরুচি অনুযায়ী শিশুকে গড়ে তুলবেন। শিশুর নিজেরও বক্তব্য আছে। এতদিন শিশুর মন ছিল আমাদের কাছে উপেক্ষিত, অবিবেচিত। মনোবিদ্যার গবেষণার ফলে শিশুকে আমরা আবার নতুন করে আবিষ্কার করেছি। শিশুর সহজাত প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ, আগ্রহ প্রভৃতি সম্বন্ধে মূল্যবান্ তথ্য আজ মনোবিদ্যা আমাদের উপহার দিয়েছে। ফলে শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা আর শিশুর চাহিদা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়। শিশুর উদ্দেশ্য নির্ণয়েই মনোবিদ্যা শুধু সহায়তা করেনি, শিক্ষার পদ্ধতিতে এনেছে যুগান্তকারী পরিবর্তন। শিশুর আগ্রহের ও চাহিদার দ্বারা শিক্ষাপদ্ধতি আগে নিয়ন্ত্রিত হত না। শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষায় মনোবিদ্যাসম্মত নীতিই গৃহীত হয়। শিশুর মনোযোগ কেন হয়, কেন সে কোন ব্যাপারে আগ্রহশীল হয়, কেন সে ভুলে যায়, তার শিক্ষণ-প্রক্রিয়া কি এবং কিভাবে ঘটে

ইত্যাদি বিষয়ে মনোবিদ্যা শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার পরম সহায়ক। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সংগে সংগে তার দৈহিক ও মানসিক চাহিদা এবং সমস্যা অনুযায়ী আমরা শিক্ষাধারারও স্তরবিন্যাস করি। এ ব্যাপারে ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ (*Psycho-analysis*) পদ্ধতির অসীম অবদান। শিশুকে শাস্তি ও পুরস্কারের ভয় এবং লোভ দেখিয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশুর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ গৃহীত হয়েছে। শিশু-মনের এ স্বীকৃতি শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার আর এক গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য।

জীবতত্ত্বমূলক বিজ্ঞানের দুটি ভাবধারা শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। একটি হচ্ছে কৃষ্টি-যুগ তত্ত্ব (Cultural Epoch theory) এবং অন্যটি বিলম্বিত-শৈশব তত্ত্ব (Theory of delayed infancy)। জীবতত্ত্বমূলক বিজ্ঞান শিশুর আচরণকে বিবর্তনের ধারায় ব্যাখ্যা করে। প্রাণীর জীব-কোষে (cell) তার সকল সম্ভাবনা শৈশবেই লুকিয়ে থাকে। বয়োবৃদ্ধির সংগে সংগে তার জীবনের বিভিন্ন আচরণ দেখা দিতে থাকে। এই আচরণের মধ্য দিয়ে জীব তার পূর্বপুরুষদের আচরণকেই অনুসরণ করে। মানবশিশু সম্বন্ধেও এ সত্য প্রযোজ্য। শিশু তার ক্রমবিকাশের পথে তার পূর্বপুরুষের প্রধান প্রধান আচরণকেই প্রকাশ করে, পূর্বপুরুষের মৌলিক আচরণকে বর্জন করা সম্ভব নয়। একেই বলে কৃষ্টি যুগতত্ত্ব। এ তত্ত্ব শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্বাচনে প্রধান সহায়ক। মানুষের জীবনে বিবর্তনের ধারায় যে সব প্রধান প্রধান অভিজ্ঞতা ও আচরণ দেখা যায়, সেগুলিই হবে শিশুর পাঠ্যবিষয়। হাতের কাজ, পুতুল তৈরি, মাটি বা পাতা দিয়ে বাড়ি তৈরি খেলাধুলা, দলবেঁধে কাজ করা ইত্যাদি হবে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার বিষয়বস্তু।

বিলম্বিত-শৈশব তত্ত্ব অনুযায়ী যে প্রাণীর শৈশব যত দীর্ঘস্থায়ী তার জীবন সংগ্রামও তত উন্নত ধরনের এবং তার অস্তিত্বও অন্যান্য প্রাণীর চাইতে নিরাপদ। যে সব প্রাণীর শৈশব স্বল্পস্থায়ী তারা জীবন সংগ্রামে পর্যাপ্ত শক্তিশালী নয়, তাদের অস্তিত্বও নিরাপদ নয়। মানবশিশুর শৈশব দীর্ঘ এবং বৈচিত্র্যময়, তাই তার জীবনসংগ্রামে দক্ষতা বেশী, অস্তিত্ব অনেক নিরাপদ। এজন্য শিক্ষাকে বিলম্বিত এবং বৈচিত্র্যময় করা চাই।

সমাজতত্ত্বমূলক বিজ্ঞান আজ শিশুকে সমাজের পটভূমিকায় বিবেচনা করে। সমাজের চাহিদার সংগে শিক্ষার্থীর চাহিদার সুষ্ঠু, সামঞ্জস্য বিধান ন

হলে শিক্ষা সমাপনান্তে শিক্ষার্থী বৃহত্তর সমাজে প্রবেশের অধিকার পাবে না। তার শিক্ষা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়বে এবং সামাজিক কর্তব্যে সে হবে অক্ষম। শিক্ষায় গণতন্ত্রমূলক আদর্শ, 'বিদ্যালয়ই সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ' ইত্যাদি সমাজতত্ত্বমূলক বিজ্ঞানের অবদান। "শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষায় সমাজের সংগে শিশুর অবিচ্ছেদ্য বন্ধনকে নানা প্রচেষ্টার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়।

৩। শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Child Centred Education) :

শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার তাৎপর্যকে আমরা দর্শনমূলক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে এবং সমাজতত্ত্ব ও জীবতত্ত্বের দিক থেকে আলোচনা করেছি। প্রাচীন গতানুগতিক শিক্ষার সংগে আধুনিক শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার তুলনা করলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি ধরা পড়বে।

(১) শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, এখানে শিশুরই প্রাধান্য। শিশুর জীবনকে কেন্দ্র করেই এ শিক্ষার আদর্শ গড়ে উঠেছে। শিশুর স্বাধীনতাই শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার মর্মবাণী। শিশুকে শাস্তি ও পুরস্কারের ভয় এবং লোভ দেখিয়ে নিয়ন্ত্রিত করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ বা ক্রমবিকাশের পথে কোন বাধা সৃষ্টি করা হয় না।

কিন্তু গতানুগতিক শিক্ষায় ছিল শিক্ষক-কেন্দ্রিক। শিশুর স্বাধীনতা, আগ্রহ বা ব্যক্তিত্ব-বিকাশ প্রভৃতির কোন মূল্যই সে শিক্ষায় স্বীকৃত হত না। সমাজের প্রবীণদের অভিপ্রায় এবং শিক্ষকের অভিরুচিই ছিল শিশু-শিক্ষার নিয়ন্ত্রক। তাঁরা তাঁদের বাঁধাধরা পথে শিশুকে শিক্ষা দিতেন।

(২) শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল, শৃংখলা এবং স্বাধীনতার সমন্বয়। এ শিক্ষাদর্শে স্বাধীনতা অন্তর্জাত, বহির্জাত নয়। শিশুর অন্তর থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বাধীনতার উন্মোচনই শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য। কঠোর শাসন ও পরলোকের ভয় দেখিয়ে এখানে শিশুর উপর শৃংখলা আরোপ করা হয় না।

কিন্তু গতানুগতিক শিক্ষায় শৃংখলা ছিল বহির্জাত। সে শৃংখলা ছিল সামাজিক অনুশাসনের যান্ত্রিক ও প্রাণহীন কৃত্রিম ব্যবস্থা। শাস্তি, ভয়, সমাজের নিন্দা

এবং শিক্ষকের রক্তচক্ষুর সাহায্যে সে শৃংখলা শিশুর মনে চাপিয়ে দেওয়া হত। এ ধরনের শৃংখলাকে আজ উৎপীড়ন বলে মনে করা হয়।

(৩) শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল, এ শিক্ষা অভিজ্ঞতা-কেন্দ্রিক। নিঃসন্দেহে এ শিক্ষায় শিক্ষক শিশুর অভিজ্ঞতা সংগ্রহে পরম সহায়ক। শিক্ষক জ্ঞান দাতা এবং শিশু গ্রহীতা এ ধারণা নিতান্ত ভুল। অভিজ্ঞতা-কেন্দ্রিক বলেই এ শিক্ষা বাস্তবধর্মী। শিশু যে পরিবেশে শিক্ষালাভ করে সে পরিবেশও শিক্ষার উপাদান। বাস্তব জগৎ এবং সমাজ জীবনের বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতার সংগে শিশু পরিচিত হবে। এক কথায় শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের সংগে সংগে তাকে সমাজধর্মী করে তোলার চেষ্টা করা হয়। শিক্ষায়তনকে শিশুর কাছে সমাজের প্রতিচ্ছবি রূপে উপস্থিত করতে হয়।

কিন্তু গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এ ধরনের কোন প্রয়াস নেই। সামাজিক চাহিদা, বাস্তব দৃষ্টিভংগী, শিশুর সামাজিক বিকাশের দিক, কোনটিই সেখানে স্থান পায়নি। শিক্ষায়তন বা তার পরিবেশকে সমাজধর্মী করে তোলার কোন প্রচেষ্টা সেখানে ছিল না। শিক্ষকের অভিজ্ঞতা, পরিবর্তনশীল পরিবেশে যতই অবাস্তব হোক্ না কেন তারই বিতরণ ছিল গতানুগতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য।

(৪) শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল, এ শিক্ষা কর্ম ভিত্তিক। কাজকর্মের মাধ্যমে, খেলাধূলার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়াই উচিত। সৃজনশীলতা শিশুর ধর্ম। তাই তাকে নানা রকম কাজের সুযোগ দিতে হবে যাতে সে তার সৃষ্টিমূলক ইচ্ছাকে বাস্তবরূপ দিতে পারে। ডিউই বলেন, সক্রিয়তা ছাড়া কোন অভিজ্ঞতা অর্জন বা শিক্ষা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের শ্রীনিকেতনের শিক্ষাদর্শে এবং গান্ধিজীর বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনায় এই কর্ম ভিত্তিক শিক্ষারই প্রচার আমরা লক্ষ্য করি। অর্থাৎ শিশু শুধু পুস্তক পাঠ করেই শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষায় সন্তুষ্ট থাকতে পারেনা, তাকে সক্রিয়ভাবে নানা কাজকর্মের বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে বাস্তবক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়।

কিন্তু গতানুগতিক শিক্ষায় সক্রিয়তাকে অবহেলা করা হয়েছে। সেখানে পুস্তক পাঠ ও শিক্ষকের বক্তৃতা শ্রবণই ছিল শিশুর শিক্ষা। এমনকি

খেলা-ধূলাকেও সে শিক্ষায় নিন্দা করা হত। আজকের শিশু নানা কাজের সুযোগ পায় তার বিদ্যালয়ে। মাটির বা প্লাস্টিকের পুতুল তৈরি, খেলার সামগ্রী তৈরি, বাড়ি তৈরি ইত্যাদির মাধ্যমে শিশু তার সৃজনী শক্তি প্রকাশের সুযোগ খোঁজে। বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক দলসৃষ্টি, বা যৌথ কর্মপ্রচেষ্টা বা অন্যান্য কাজকর্মের দ্বারা আজকের শিশু-শিক্ষা হয়েছে কর্মমুখর। গতানুগতিক শিক্ষা ছিল জ্ঞান-ভিত্তিক এবং নিষ্ক্রিয়।

(৫) শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হল, এ শিক্ষা চাহিদা-কেন্দ্রিক (Needs Centric)। মনস্তত্ত্ব ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে পার্থক্য (individual difference) স্বীকার করে, শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষায় রয়েছে তারই সমর্থন। শিক্ষার্থীকে নিজ নিজ চাহিদা, আগ্রহ এবং ক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষা দিতে হয়। পার্সিনান এ প্রসংগে বলেছেন, শিক্ষাকে ব্যক্তিত্বমণ্ডিত (individualised) করা চাই। একই শ্রেণীকক্ষে একই সংগে শিক্ষকগণ শিশুকে যে দলগতভাবে শিক্ষা দেন তা বিজ্ঞানসম্মত নয়।

কিন্তু গতানুগতিক শিক্ষাধারায় শিশুর চাহিদা, আগ্রহ এবং সামর্থ্যকে বিবেচনা না করে শিক্ষক কতকগুলি ভাবধারার সংগে শিশুর পরিচিতি ঘটানকেই সার্থক শিক্ষা মনে করতেন। এ ছিল শিশুমনের উপর অবিচার।

(৬) শিশু-কেন্দ্রিকশিক্ষার ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য হল, এ শিক্ষা শিশুর জীবনের সামগ্রিক বিকাশের উপর গুরুত্ব প্রদান করে। শিশুর ব্যক্তিত্বের দৈহিক, মানসিক, পরিবেশগত এবং বংশগত প্রভাবকে বিবেচনা করে শিশুর ব্যক্তিত্বের সমগ্র সত্তার বিকাশসাধন শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার উদ্দেশ্য।

কিন্তু গতানুগতিক শিক্ষায় শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিক বিবেচনা করা হত না। মানসিক শৃংখলাবাদীরা শিশুর মানসিক উৎকর্ষের উপর গুরুত্ব দিতেন। ফলে শিক্ষার উদ্দেশ্য সংকীর্ণ এবং একঘেয়ে হয়ে পড়েছিল।

পূর্বে আমরা শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার (Paedo-Centric বা Child-Centric) প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করেছি। শিক্ষার ইতিহাসে বিংশ শতাব্দীকে শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার যুগ বলা হয়। আগে শিক্ষার বিষয়বস্তুই ছিল প্রধান বিবেচ্য, কিন্তু আজকের শিক্ষা প্রধানতঃ এবং মূলতঃ শিশু-কেন্দ্রিক।

শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার জনক রুশো সর্বপ্রথম ঘোষণা করলেন : শিক্ষা শিশুর জন্মগত অধিকার (birth right)। নব্য শিক্ষা-তত্ত্ব একে মূলমন্ত্র বলে গ্রহণ করেছে। শিশুর এই মানবিক অধিকার ক্ষুণ্ণ না করে তার মর্যাদা প্রদানই শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষায় স্বীকৃত সত্য।

৪। শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষকের স্থান (The Place of teacher in child-centred Education) :

শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষক জ্ঞান-দাতা বলে আজ আর স্বীকৃত নন। শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার অন্যতম জনক জন ডিউই বলেন, কেউ কাউকে কিছুই শিক্ষা দিতে পারে না। তাই গতানুগতিক শিক্ষায় শিক্ষকের যে স্থান ছিল, শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষায় তার সে স্থান নেই। শিক্ষক এখানে শিশুর সহায়ক, বন্ধু এবং পথ-প্রদর্শক মাত্র। শিক্ষার্থী শিক্ষকের নীরব শ্রোতা নয়, শিক্ষকের সামনে সে উপস্থিত হয়, তার জিজ্ঞাসু-মন ও সমস্যা নিয়ে।

গতানুগতিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষক স্বীয় অভিরুচি অনুযায়ী কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান শিশুকে দিয়েই ক্ষান্ত হতেন। কিন্তু শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষায় এ ধরনের শিক্ষা-পদ্ধতি অচল। এখানে শিক্ষককে শিশুর চাহিদা, আগ্রহ এবং সামর্থ্য বিবেচনা করে শিক্ষা দিতে হয়—গভীর সহানুভূতি দিয়ে শিশুমনকে তাঁর জানতে হয়। এজন্য শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষকের দায়িত্ব অপরিসীম এবং সমাজ-জীবনে এই দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা শিক্ষকের এই গুরুদায়িত্ব পালনের উপর নির্ভর করছে ভবিষ্যৎ সমাজের পরিণতি ও প্রগতি।

শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর সম্পর্ক খুব সহজ এবং মধুর। গতানুগতিক শিক্ষায় শাস্তি এবং পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে শিক্ষা দেওয়া হত। তাই শিক্ষকের সংগে শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ছিল ভয়াশ্রিত। আজকে শিক্ষকের ও ছাত্রের মধ্যে এ ধরনের শাসক এবং শাসিতের সম্পর্ক নেই, তাদের মধ্যে সম্পর্ক বন্ধুত্বের ও প্রীতির।

গতানুগতিক শিক্ষা ছিল শিক্ষক-কেন্দ্রিক। শিশুর কোন আলাদা সত্তা আছে বলে সেখানে কোন স্বীকৃতি ছিল না। কিন্তু শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশুই প্রধান। শিশুকে কেন্দ্র করেই শিক্ষকের স্থান, শিক্ষকের জীবনের ব্যাপ্তি।

প্রশ্নাবলী

1. Why the present century is called the age of paedo-centric education.

2. Explain what is meant by child-centric education' and consider the place of the teacher in modern education.

3. What are the characteristic features that mark off new Teaching from the old.

4. Write an essay on child-centric education.

5. Discuss the significance of child-centric education and the place of teacher in the modern education.

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিশু : তার বংশধারা ও পরিবেশ*

(The Child : His nature & nurture)

শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশুর সমগ্র ব্যক্তিসত্তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু শিশুর ব্যক্তিসত্তা সংগঠনে দুই আপাত-বিরোধী ভাবধারা এক সমস্যা সৃষ্টি করেছে। একটি বংশধারা এবং অন্যটি পরিবেশ। অর্থাৎ শিশুর জীবনে পরিবেশ বড়, না বংশধারা বড়? এ দ্বন্দ্ব সমাধানের আগে আমরা বংশধারা ও পরিবেশের বক্তব্য আলোচনা করব :

১। বংশধারা এবং পরিবেশ (Heridity and Environment) :

প্রকৃতির বুকে শিশু যখন জন্মে তখন সে তার মাতাপিতার কাছ থেকে কতকগুলি জৈবিক এবং মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য তার অগোচরে বহন করে আনে। এই সহজাত এবং প্রকৃতি-দত্ত উপাদান (Natural endowments)-ই তার বংশধারা। শিশুর দেহগত আকৃতি, গঠন, রঙ, বিভিন্ন গ্রন্থি, তার চিন্তা-কল্পনা-ইচ্ছাশক্তি, তার প্রভোক্ষ, প্রবৃত্তি সবই বংশধারা। এ বংশধারা শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে যথেষ্ট প্রভাবশালী এবং ক্রিয়াশীল।

শিশু তার জন্মের সংগে সংগেই পরিবেশের মধ্যে এসে পড়ে। পরিবেশ বলতে আমরা সাধারণ অর্থে বুঝি কোন বস্তুর চতুষ্পার্শ্ব—যা সাক্ষাৎভাবে বস্তুর উপর তার প্রভাব ফেলে। কিন্তু মানুষের পরিবেশ এর চাইতে আরও ব্যাপক এবং গভীর। আমাদের পরিবেশ, সাক্ষাৎ বা দূরবর্তী বস্তুর এক জটিল সমষ্টি যা আমাদের জীবন এবং কর্মক্ষমতাকে কোন না কোন ভাবে প্রভাবিত করে।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা পরিবেশ প্রসংগে যখন মন্তব্য করেছি তখন পরিবেশকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করেছি—প্রাকৃতিক এবং সামাজিক :

* এ প্রসঙ্গে বিশদ বিবরণের জন্য সেনগুপ্ত ও রায় প্রণীত 'শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান' চতুর্থ অধ্যায় ১১৬-৩৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

একটু বিশেষভাবে চিন্তা করলে বোঝা যাবে, প্রাকৃতিক পরিবেশের সংগে জড়িয়ে আছে কৃত্রিম পরিবেশ এবং সামাজিক পরিবেশের সংগে জড়িয়ে আছে মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ।

(ক) প্রাকৃতিক পরিবেশ (Natural environment) : প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে বুঝি সমস্ত প্রাকৃতিক এবং বাহ্যিক বস্তু যা মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। যেমন—সূর্য, তারকা, নদ-নদী, পর্বত, সমুদ্র ইত্যাদি। আবার গাছপালা, পশু, প্রাণীও প্রাকৃতিক পরিবেশ। তাই প্রাকৃতিক পরিবেশ আংশিক-ভাবে মানুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে, কিন্তু সাধারণভাবে এ পরিবেশ মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

(খ) কৃত্রিম পরিবেশ (Artificial environment) : কৃত্রিম পরিবেশ বলতে আমরা বুঝি প্রাকৃতিক পরিবেশের যে অংশকে মানুষ তার কর্মক্ষমতা এবং প্রকৃতির উপর প্রতিক্রিয়ার দ্বারা নিজের অধীনে এনেছে, পরিবর্তিত করেছে, নিজের প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রিত করে উপভোগ করছে। আমাদের কৃষি, শিল্প ও যান্ত্রিক সভ্যতায় প্রকৃতির যে অংশ এসে নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তিত হয়েছে, তা কৃত্রিম পরিবেশ। কৃত্রিম-পরিবেশ বলতে আমরা নতুন কিছু সৃষ্টি বুঝি না। মানুষ একটি পরমাণুও সৃষ্টি করতে পারে না। তাই কৃত্রিম পরিবেশ প্রাকৃতিক পরিবেশের নিয়ন্ত্রিত, পরিবর্তিত রূপ মাত্র।

(গ) সামাজিক পরিবেশ (Social environment) : সামাজিক পরিবেশ বলতে বুঝি, আমাদের প্রতিবেশী জনসমাজ যা নিয়ত আমাদের উপর তাদের প্রভাব ফেলে। সামাজিক পরিবেশ শুধু আমাদের বাহ্যিক এবং অর্থনীতিক পরিবেশের উপর প্রতিক্রিয়া করে না, আমাদের মানসিক এবং নৈতিক পরিবর্ধনেও প্রভাব বিস্তার করে। আজকের যান্ত্রিক যুগে আমাদের মানসিক স্তরে এবং নৈতিক মূল্যবোধে যে পরিবর্তন এসেছে, কৃষিসভ্যতায় তার অনেকটাই ছিল অনুপস্থিত।

(ঘ) মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ (Psychological environment) : মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ সম্বন্ধে সচরাচর আমরা অবহিত নই। কিন্তু অনেক সময় আমরা যে আচরণ করি, যে মনোভাব প্রকাশ করি তা আমাদের পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতারই প্রতিফলন। আমাদের মানসিক আচরণগুলিকে যদি আমরা পরখ

করে দেখি, তবে বুঝতে পারি এ আচরণগুলি আমাদের পূর্ববর্তী শিক্ষা বা অভিজ্ঞতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বাস্তবজগতে পরিবেশ এক জটিল অবস্থা, কোন্ ঘটনা প্রাকৃতিক বা সামাজিক তা সহজে স্থির করা যায় না— একটি আর একটির সংগে জড়িয়ে থাকে। তাই একই ঘটনা বা বস্তু বিভিন্ন পরিবেশের সংমিশ্রণ হতে পারে।

২। পরিবেশ এবং বংশধারার যুগ্ম প্রস্তাব (Mixed Influence of Environment and Heridity) :

পরিবেশ এবং বংশধারা মানুষের ব্যক্তিত্ব এবং আচরণকে প্রভাবিত করে। সুতরাং স্বভাবতই প্রশ্ন দাঁড়ায়—কোন্‌টি প্রধান, কোন্‌টি মানুষের আচরণ বা শিক্ষার উপর অধিকতর প্রভাবশালী? বলাবাহুল্য, পরিবেশবাদীরা পরিবেশকেই প্রধান বলে স্বীকার করেন এবং বংশধারাবাদীরা বংশধারাকে প্রাধান্য দেন।

পরিবেশবাদ (Environmentalism) : পরিবেশবাদীরা বলেন, শিশুর ব্যক্তিত্ব সংগঠনে এবং শিক্ষায় বংশধারার কোন মূল্য নেই। বংশধারা নিরপেক্ষভাবে উপযুক্ত পরিবেশে শিশুকে তার শিক্ষার মাধ্যমে ইচ্ছানুযায়ী গড়ে তোলা যায়। ব্যবহারবাদী মনস্তাত্ত্বিক জে. বি. ওয়াটসন (*J. B. Watson*) বংশ-প্রভাবের পরিবর্তে পরিবেশকে ব্যক্তিত্বের একমাত্র উপাদান বলে মনে করেন। তিনি তাঁর 'Behaviourism' গ্রন্থে বলেন, নির্ধারিত পরিবেশের মাধ্যমে তিনি ডাক্তার, আইন-জীবি, শিল্পী, বণিক এমন কি ভিক্ষুক চোর-রূপেও একটি ব্যক্তিকে গড়ে তুলতে পারবেন। শিশুর পূর্বপুরুষের প্রতিভা, প্রবণতা, বৃত্তি এ ব্যাপারে অর্থহীন। পরিবেশবাদীরা মানুষকে একটি সজীব যন্ত্র বলে মনে করেন। যন্ত্রের পরিচয় তার ব্যবহারের মাধ্যমে। মানুষের বেলায়ও তাই—তার পরিচয় তার পরিবেশের দ্বারা। একমাত্র শিক্ষার দ্বারা এবং পরিবেশের সহায়তায় ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। শিক্ষাই ব্যক্তির জীবনে নতুন অবদান নিয়ে আসে, বংশধারা ব্যক্তির জীবনে নতুন কিছুই সংযোগ করতে পারে না, সৃষ্টি করতে পারে না।

শুধু ব্যবহারবাদীরা যে পরিবেশকে সমর্থন করেন তা নয়, সাধারণভাবে আমারাও অনেক সময় পরিবেশকেই বড় করে দেখি। কার্ল মার্ক্স (*Karl*

Marx) মানুষের সমস্ত ধারণা (Ideas) এবং সমাজ চেতনাকে মানুষের পরিবেশ বা অর্থনৈতিক অবস্থা দিয়েই ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি আরও বিশ্বাস করতেন, পরিবেশ মানুষের জীবনে মৌলিক পরিবর্তন আনতে সমর্থ।

বংশধারাবাদ (Heredetarianism) ঃ বংশধারাবাদ শিশুর ব্যক্তিত্ব সংগঠনে বংশধারাকেই একমাত্র উপাদান বলে গ্রহণ করে। শিশু তার জন্মের সংগে প্রকৃতি-দত্ত যে উপাদান নিয়ে আসে উহার দ্বারাই তার ব্যক্তিসত্ত্বা গঠিত হয়। শিশুর প্রকৃতিতে যা নেই পরিবেশ বা শিক্ষা তা দিতে পারে না। ব্যক্তিসত্ত্বা সংগঠনে শিক্ষা বা পরিবেশের কোন মূল্য নেই। শিশু-প্রকৃতি পরিবেশ নিরপেক্ষভাবেই বর্ধিত হয়। শিশুর বুদ্ধির উপর পরিবেশের বিশেষ কোন প্রভাব নাই বলেই অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানী মনে করেন। বুদ্ধি ব্যক্তিত্বের একটি প্রধান পরিচায়ক, আর এই বুদ্ধি মানুষের সহজাত। সুতরাং ব্যক্তিত্ব সংগঠনে পরিবেশ বা শিক্ষার কোন গুরুত্ব নেই।

বংশধারাবাদীরা কুলপঞ্জী এবং যমজ পর্যবেক্ষণের দ্বারা মূলতঃ তাদের অভিমতকে দাঁড় করান। এফ. গ্যাল্টন (*F. Galton*) বিখ্যাত মনীষিদের কুলপঞ্জী অনুধাবন করে বলেছেন যে, সে সব বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবন ও ব্যক্তিত্ব তাঁদের উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে। সমকোষী যমজসন্তানকে বিভিন্ন পরিবেশে রেখে দেখা গেছে তাদের প্রকৃতি একই। অতএব এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, পরিবেশ বংশধারার পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। বংশধারা মানুষের জীবনে অপরিবর্তনীয় এবং তার বিধান অমোঘ।

প্লেটো শিক্ষার্থীর প্রকৃতির উপর জোর দিয়ে বলেছিলেন, প্রকৃতি হচ্ছে পরিবেশের চাইতে গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার প্রধান কাজ হচ্ছে শিক্ষার্থীর প্রকৃতিকে উপযুক্ত পরিবেশ প্রদান করা।

এ দ্বন্দ্বের সমাধান ঃ

বংশধারা ও পরিবেশের আপেক্ষিক প্রভাব নির্ধারণ করার জন্য কেলোগ (*Kellog*) দম্পতি এক অভিনব পরীক্ষা করেন। তাঁরা তাঁদের শিশু-সন্তানকে এক শিম্পাঞ্জী-শিশুর সংগে একই পরিবেশে লালন-পালন করতে থাকেন। যদিও খেলাধূলা ও ইন্দ্রিয়-সংবেদন-জনিত ক্ষেত্রে উভয়ই সমান দক্ষতা প্রদর্শন

করেছিল—কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের মৌলিক পার্থক্য ছিল। দৈহিক-শক্তির প্রয়োজন যে-সব কাজে লাগে, সে-সব কাজে শিম্পাঞ্জী-শিশু অধিকতর দক্ষতা দেখাল, অন্যদিকে কেলোগ-সন্তান ভাষা শিখতে, স্মৃতিশক্তির ক্ষমতা দেখাতে সক্ষম হল—যা শিম্পাঞ্জী-শিশুর বেলা সম্ভব হল না। এতে প্রমাণিত হল, বংশধারা বিভিন্ন হওয়ার ফলে একই পরিবেশে একই প্রকার ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব নয়।

কিন্তু অন্যদিকে দেখা গেছে, মানব-শিশু সমাজের বাইরে বানর বা অন্য কোন পশু কর্তৃক অপহৃত হয়ে যখন লালিত-পালিত হয়েছে, তখন মানব-শিশুর জীবনে মনুষ্যোচিত গুণের বিকাশ ঘটেনি। পরে মানব-সমাজে ফিরে এসে লালিত-পালিত হয়ে মানব-গুণের অধিকারী হয়েছে। এতে প্রমাণিত হল, পশু সমাজের পরিবেশে মানব-শিশুর বংশধারার বিকাশ ব্যাহত হয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ব্যক্তিসত্তা সংগঠনের মূলে বংশধারা ও পরিবেশ উভয়ই কার্যকরী।

৩। শিক্ষাতত্ত্বে বংশধারা ও পরিবেশের গুরুত্ব (Importance of Heridity and Environment in Education) :

আধুনিক শিক্ষাদর্শনে আমরা বংশধারা ও পরিবেশ উভয়ের প্রভাবই স্বীকার করি। কোন্‌টির ক্রিয়া বা প্রভাব সবচেয়ে বেশী তা সঠিক বলা যায় না। শিশুর শিক্ষায় তার বংশধারার প্রভাব যথেষ্ট। মানুষের মধ্যে বংশধারা যে কতকগুলি শক্তি বা সম্ভাবনা এনে দেয় তাকে আমরা অতিক্রম করতে পারি না। কিন্তু পরিবেশের প্রভাবে সে-সব প্রকৃতি-দত্ত উপাদানের বিকাশ ও সংশোধন সম্ভব। এজন্য শিক্ষা দ্বারা শিশুর সম্ভাবনাকে উদ্বোধিত করে তোলা প্রয়োজন। শিক্ষাদানের পূর্বে শিশুর মানসিক ক্ষমতা, আগ্রহ, প্রক্ষোভ ইত্যাদি শিক্ষকের বিবেচনা করতে হয়। আধুনিক মনস্তত্ত্ব ব্যক্তিত্বে, বুদ্ধির পরিমাপ করতে চায়। শিক্ষককে শিশুর এসব বংশধারার প্রভাব স্বীকার করেই পথ নির্দেশ বা শিক্ষার ধারা নির্ধারণ করতে হয়।

শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশুর বংশধারা এবং অন্যান্য মানসিক দিকগুলির যেমন বিবেচনা করতে হয়, তেমনি পরিবেশের গুরুত্বও সেখানে স্বীকৃত। শিক্ষক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে এমন একটি পরিবেশ গড়ে তুলবেন যা শিশুর

স্বাভাবিক এবং অন্তর্নিহিত ক্ষমতার বিকাশে সহায়তা করে। শিক্ষাকে এদিক থেকে বিবেচনা করলে, তা পারিবেশিক উপাদান ছাড়া আর কিছুই নয়।

পরিবেশ এবং বংশধারার দ্বন্দ্ব নিরর্থক। একটা গাছের বীজ যেমন উপযুক্ত পরিবেশে ছাড়া অংকুরিত হতে পারে না, তেমনি শিশুর ব্যক্তিত্ব উপযুক্ত শিক্ষা-পরিবেশ ছাড়া বিকশিত হতে পারে না। আর বীজের মধ্যে যদি অংকুরিত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তবে পরিবেশ যতই উপযুক্ত হোক না কেন সে বীজ থেকে গাছ জন্মাবে না। তেমনি প্রকৃতি-দত্ত ক্ষমতা ও মানসিক সম্ভাবনাকে বিচার না করেই যদি শিশুকে আমরা শিক্ষা দিতে থাকি বা কৃত্রিম পরিবেশের মধ্যে রাখি তবে শিক্ষাও ব্যর্থ হবে। শিক্ষক যেমন শিশুর চাহিদা, রুচি, সামর্থ্য ও ব্যক্তিগত বৈষম্য অনুযায়ী শিক্ষাধারা প্রবর্তন এবং শ্রেণী-বিভাজন করবেন, তেমনি উপযুক্ত পরিবেশের সৃষ্টি করেই শিক্ষা দেবেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে শিক্ষাও একটি পরিবেশ। উহা সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ। ব্যক্তির সামাজিকও মানসিক বিকাশে সহায়ক যে পরিবেশ ব্যাপক অর্থে তা-ই শিক্ষা। শিক্ষা-পরিবেশ (Nurture) ব্যক্তির প্রকৃতি দত্ত সকল সম্ভাবনাকে (Nature) ব্যক্তির ও সমাজের মঙ্গলাদর্শে প্রতিপালন করে। গতানুগতিক শিক্ষায় শিক্ষাকে একটি কৃত্রিম পরিবেশ রূপে গণ্য করা হত। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষা পরিবেশ জীবন ধর্মী—শিশুর জীবন বিকাশের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the relative influence of heredity and environment on the educational attainments of children.

2. What do you understand by nature and nurture? Discuss whether nature or nurture has the more potent effect on determining a child's development.

3. What do you understand by heredity and environment? Discuss their relative influence on the dovelopment of a child.

সপ্তম অধ্যায়

শিক্ষার মাধ্যম

(Agencies of Education)

মানুষ তার অর্জিত অভিজ্ঞতাকে তার বংশধরদের কাছে অর্পণ করবার চেষ্টা আদিমকাল থেকে করে আসছে। মানব সন্তানরাও আদিমকাল থেকে তার পূর্বপুরুষের দ্বারা লব্ধ অভিজ্ঞতা, শিক্ষা বা জ্ঞানকে সংগ্রহ করার চেষ্টা করে আসছে। আর শিক্ষালাভের মাধ্যমরূপে সে লাভ করেছে তার পরিবার, বিদ্যালয়, সমাজ, ধর্মীয় সংস্থা এবং রাষ্ট্র ইত্যাদি। মানুষের পূর্বপুরুষদের অভিজ্ঞতার বাহন হচ্ছে এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলি।

বলাবাহুল্য, শিক্ষার বিভিন্ন বাহনগুলি বিবর্তনের ধারায় ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে মানব সভ্যতায় এসে উপস্থিত হয়েছে। আদিমকালে শিক্ষাদান কাজ সম্পাদনের জন্য আধুনিক কালের মত কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠান ছিল না। সেদিন মানুষ তার অতি নিকট পরিবেশ অর্থাৎ পরিবার, ধর্মীয় সংস্থা, সামাজিক উৎসব, মেলামেশা, কথাবার্তা, জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমেই শিক্ষাগ্রহণ করত। পরিবার বা ধর্মীয় সংস্থার প্রয়োজন ছিল কতকগুলি সামাজিক চাহিদা মেটানর জন্য। কিন্তু পরোক্ষভাবে এসবের মাধ্যমে শিক্ষাদান সম্পাদিত হত বলে আজকের যুগে এগুলিকে আমরা বলি শিক্ষার পরোক্ষ মাধ্যম (**Informal agency**)। এই প্রতিষ্ঠানগুলির সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য শিক্ষাদান নয়। পরিবারের মুখ্য উদ্দেশ্য প্রজনন ও সন্তান পালন; ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য ধর্ম প্রচার ও ঈশ্বর আরাধনার সুযোগ প্রদান। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানও পরোক্ষভাবে দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষার মাধ্যম বা বাহনরূপে কাজ করে আসছে। তারপর সভ্যতার অগ্রগতির সংগে সংগে মানুষের জীবনের পরিবর্তন জটিলতর হতে লাগল। মানুষের ভাষা, চিন্তা, শিল্পকলা প্রভৃতিতে জটিলতার সৃষ্টি হল। মানুষের জীবনসংগ্রাম পদ্ধতিতে নিত্য নতুন পরিবর্তন উপস্থিত হতে লাগল। মানুষের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার শুধু জটিল হল না, স্ফীত-কলেবর হয়ে চলল। শিক্ষার পরোক্ষ মাধ্যমগুলি শিক্ষার চাহিদাকে আর মেটাতে পারল না। শিক্ষাদানকে মুখ্য উদ্দেশ্য করে সৃষ্টি হল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের—বিদ্যালয়, পাঠশালা,

টোল প্রভৃতির। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই হল শিক্ষার প্রত্যক্ষ (Formal) মাধ্যম। আমরা এ অধ্যায়ে শিক্ষার পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ মাধ্যমগুলি নিয়ে আলোচনা করব :

১। পরিবার (Family) :

বিদ্যালয় সৃষ্টির বহু পূর্ব থেকেই পরিবার শিক্ষার গুরুদায়িত্ব বহন করে আসছে। শিশু যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করে সেই পরিবারই তাকে বৃহত্তর জগতের সংগে পরিচয় করিয়ে দেয়। তার সামাজিক, নৈতিক এবং ধর্মীয় সকল প্রকার মূল্যবোধের সৃষ্টিতে পরিবারই তাকে সহায়তা করে। এমন কি তার বৃত্তিমূলক শিক্ষাও পরিবার থেকে সে লাভ করত।

শিশু তার পিতামাতা, আত্মীয়-পরিজন এবং অন্যান্য প্রতিবেশীদের কাছে তার প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করে। বৃহত্তর জীবনের প্রস্তুতি সে পরিবার থেকেই পেয়ে থাকে। পরিবারের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তার গঠনমূলক প্রভাব (Formative influence)। শিশুর চরিত্র, ব্যক্তিসত্বা ও জীবনের দৃষ্টিভংগী পরিবারেই অনেকটা সৃষ্ট হয়ে যায়। পরিণত জীবনেও এসব প্রভাব থেকে শিশু সহজে মুক্তি পেতে পারে না। শিশু পরিবার থেকেই সামাজিক রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, দায়িত্ব ও বিচারবোধ বংশানুক্রমে লাভ করে আসছে। আর পরিবার এভাবে শিক্ষাধারাকে কালস্রোতে বাঁচিয়ে রাখছে। পরিবার সমাজেরই একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ—পারিবারিক সম্পর্কের ব্যাপ্তিই সামাজিক সম্পর্ক।

কিন্তু বিগত শতাব্দী থেকে শিক্ষায় পরিবারের আর একাধিপত্য নেই। পরিবারের কাঠামোতে ভাংগন শুরু হয়েছে। যান্ত্রিক সভ্যতায় পরিবার আর উৎপাদন কেন্দ্র নহে। কৃষিসভ্যতা পেরিয়ে আমরা শিল্প-সভ্যতায় এসে পৌচেছি। পুরুষ আজ কাজের সন্ধানে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে, সংগে সংগে নারীও চলেছে কাজের সন্ধানে। নারীর স্বাধীনতা আজ পিতৃ-তান্ত্রিক (Patriarchal) সমাজ ব্যবস্থার বিলুপ্ত ঘটিয়েছে। তাই পারিবারিক বন্ধনে আজ শিথিলতার পরিচয় আমরা পাই বিবাহবিচ্ছেদের ক্রমবর্ধমান ঘটনায়। বিদ্যালয়, হাসপাতাল, আরোগ্যনিকেতন, ভোজনাগার, শিল্প বা উৎপাদনকেন্দ্র প্রভৃতি সামাজিক সংস্থা সৃষ্টি হবার ফলে পারিবারিক কর্মের পরিধি খুবই সংকুচিত হয়ে গেছে।

কিন্তু তবুও পরিবারের গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। শিশুই হচ্ছে পরিবারের ভিত্তি। মানব শিশুর জন্যই পরিবার বেঁচে থাকবে। আজকের পরিবারের ভাংগনের মধ্য দিয়ে নতুন পরিবারের কাঠামো সৃষ্টি হচ্ছে। শিশুর জীবনে পরিবারের শিক্ষামূলক প্রভাবকে কোনদিন অস্বীকার করা যাবে না। পরিবার ছাড়া শিশুর আবেগ ও প্রক্ষোভ জনিত চাহিদা অতৃপ্ত থাকবে। শিশু তার মাতাপিতা এবং অন্যান্য পরিজনদের কাছ থেকে অত্যন্ত সহজ ভাবে ও সহানুভূতির মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করে।

পরিবারের এ ধরনের শিক্ষামূলক প্রভাব ও প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে অনেক শিক্ষাবিদ্ আবাসিক বিদ্যালয় গঠনের প্রস্তাব করেছেন। জন ডিউই পরিবারের সংগে বিদ্যালয়ের তাই যথার্থ সংযোগ স্থাপনের উপদেশ দিয়েছেন। অন্যদিকে মন্টেসরী, ফ্রয়েবেল প্রমুখ শিক্ষাবিদ্‌রা বিদ্যালয়ের মধ্যে পরিবারের সহজ সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন।

ডঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় তাঁর 'New Horizon of Marriage' বইতে মানব ইতিহাসে পরিবারের অপরিহার্যতা উল্লেখ করে বলেন, ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব চাহিদা, কল্পনা এবং শিশু প্রতিপালনের অনন্য দায়িত্ব পূরণের জন্য পরিবার বেঁচে থাকবে। শিশুর জীবনে প্রথম কয়েকটি বছর পারিবারিক জীবন অত্যাবশ্যক। শিশুর আবেগ, আব্দার, স্বচ্ছন্দ আচরণ একমাত্র পরিবারকে ভিত্তি করে নানা বিচিত্র ধারায় তার জীবনে প্রকাশিত হতে থাকে। শিশুর আচরণের সকল বৈশিষ্ট্য, তার চারিত্রিক গুণাবলী, তার অনুসন্ধিৎসা, আগ্রহ পরিবারকে কেন্দ্র করেই প্রকাশিত হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে স্থায়ী রূপ প্রাপ্ত হয়। রেমন্ট *(Raymont)* এ প্রসঙ্গে বলেন, দুটো শিশু একই সঙ্গে একই বিদ্যালয়ে যেতে পারে, একই শিক্ষক বা সংগঠনের প্রভাবে বর্ধিত হতে পারে, একই বিষয় অধ্যয়ন বা একই ধরনের কাজ করতে পারে, কিন্তু তবুও এ দুই শিশুর মধ্যে তাদের সাধারণ জ্ঞান, আগ্রহ, কথাবার্তা, চালচলন, নৈতিক বোধ প্রভৃতির মধ্যে লক্ষণীয় পার্থক্য দেখা যাবে। আর এ পার্থক্যের মূলে রয়েছে তাদের পরিবারের বিভিন্নতা।

শিশুর সকল সহজাত প্রবৃত্তি, রসবোধ (sentiment), কামনা, বাসনা, বুদ্ধি, বিবেক সব কিছু মাতাপিতা ও গৃহপরিজনকে কেন্দ্র করে নানা সৃজনশীলতার মধ্যে প্রকাশিত হতো। এ সময়ে মায়ের প্রভাব শিশুর উপর অপরিসীম ও

অনন্ত। এজন্য প্রবাদ রয়েছে একজন সুমাতা শত সু শিক্ষকের সমান। পিতার প্রভাব শিশুর উপর রইলেও শিশু সাধারণতঃ পিতাকে ভয় মিশ্রিত সম্মান (awe inspiration) দিয়ে পিতার সঙ্গে কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখে।

সে যা হোক, গৃহকে কেন্দ্র করেই শিশুর মধ্যে স্নেহ মমতাবোধ, সংকীর্ণতা ও মহত্ত্বের মধ্যে পার্থক্যবোধ, ন্যায় অন্যায় বোধ, সত্যমিথ্যাবোধ, সর্বোপরি সহানুভূতি জাগ্রত হতে থাকে। বাস্তব জীবনের সঙ্গে পরিচিত গৃহেই সম্ভব। বার্ট্রাণ্ড রাসেল *(Bertrand Russell)* তাঁর **'Education and Social Order'** বইতে প্রধানতঃ শিশু-বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করলেও শিশুর জীবন বিকাশে গৃহের সুদূর প্রসারী প্রভাবকে তিনি অস্বীকার করেননি। রাসেল্ বলেন, গৃহই শিশুর মনে স্নেহ মমতার অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত করে—গৃহের সীমিত পরিবেশে শিশু প্রাধান্য লাভ করে এবং এর ফলে তার অহংবোধ পরিতৃপ্ত হয়। বিভিন্ন বয়সের নারীপুরুষের সংশ্রবে আসার সুযোগ শিশুর পক্ষে গৃহের মাধ্যমেই সম্ভব। আর পরিণত জীবনের বহুমুখী কাজের সঙ্গে এ সম্পর্ক শিশুর পরিচিতি ঘটায়। বিদ্যালয় জীবনে এ পরিচয় ঘটলেও তা প্রধানতঃ কৃত্রিম। গৃহের বাস্তব পরিবেশ বিদ্যালয় জীবনের অভিজ্ঞতার সহায়ক ও সংশোধন কারক।

শিশুর শিক্ষায় গৃহের অপরিসীম প্রভাব থাকার ফলে শিশু-শিক্ষায় মাতা-পিতার সহযোগিতা অপরিহার্য। শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের সঙ্গে মাতাপিতার সার্থক সহযোগিতা থাকা, গৃহ পরিবেশকে সুশিক্ষার অনুকূলে নিয়ন্ত্রিত করা শিশু-শিক্ষার সহায়ক। এজন্য আমরা নিয়ে মাতাপিতার সহযোগিতা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি।

মাতাপিতার সহযোগিতা (Parental Co-operation) : শিশু-শিক্ষায় গৃহের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। শৈশবে শিশু তার মাতাপিতাকে কেন্দ্র করেই তার আপন পৃথিবী রচনা করে। সে অতি অনুকরণ প্রিয়—তার গৃহ-পরিজনদের আচার-আচরণ সে অনুকরণ করে—গৃহই তার সকল কর্ম প্রচেষ্টার ক্ষেত্র। গৃহ-ই অসহায় শিশুকে নিরাপত্তা প্রদান করে। এজন্য শিশুমনের উপর তার মাতাপিতা [illegible] মাতার প্রভাব খুবই গভীর।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে শিশুর যথাযথ শিক্ষার জন্য, শিশুর আচরণ, কল্পনা, সহজাত প্রবৃত্তি, প্রবণতা প্রভৃতিকে সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য মাতাপিতাকে শিক্ষিত,

সংস্কৃতিসম্পন্ন হতে হবে। তারা তাদের নিজেদের আচরণের দ্বারা শিশুর আচরণে অভিপ্রেত পরিবর্তন আনবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে মাতাপিতার মধ্যে শতকরা ৮০ জনই নিরক্ষর এবং তারা শিশু-প্রতিপালনে, শিশুর ব্যক্তিত্ব সংগঠনে নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে শুধু অপারগ নয়, উদাসীনও। এজন্য শিক্ষাসংস্কারকরা বলেন শিশুর শিক্ষা-সমস্যার চাইতে ভারতে মাতাপিতার শিক্ষাসমস্যা অধিকতর প্রকট। বয়স্ক শিক্ষা (Adult education) শিশু-শিক্ষার একটি শর্ত। ভারত সরকার নানা পরিকল্পনা ও সংগঠনের মাধ্যমে বয়স্ক শিক্ষা প্রসারে ব্রতী হয়েছেন, এ আশার কথা। কিন্তু জনসাধারণের দারিদ্র্য, এবং দারিদ্রের সংগী রোগ, জরা, সামাজিক গোঁড়ামি, শিশু-শ্রমের (child labour) অস্তিত্ব প্রভৃতি দীর্ঘদিন ভারতে শিশু-শিক্ষার সার্থক রূপায়ণে প্রতিবন্ধক হয়ে থাকবে।

কিন্তু শিশু-শিক্ষার সার্থক পরিণতির জন্য মাতাপিতার সহযোগিতা আবশ্যক। শিশুর সমস্যা, তার অভাব অভিযোগ, তার প্রবণতা আগ্রহ প্রভৃতির সঙ্গে সাক্ষাৎ সংযোগ প্রথম ঘটে মাতাপিতার। বিদ্যালয় গৃহের যতই বিস্তৃতি হোক না কোন গৃহেই শিশুর আচরণ স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক গতিতে বিকশিত হয়। তাছাড়া বিদ্যালয়ে শিশুর মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, শিশু যত অকপটে মাতাপিতার কাছে তা প্রকাশ করে অন্য কারো কাছে নয়। এজন্য শিক্ষকের সঙ্গে মাতাপিতার সংযোগ থাকা উচিত। এ সংযোগের ফলে শিক্ষকের পক্ষে শিশুর সমস্যা অনুধাবন করা যেমন সহজ হবে, মাতাপিতার পক্ষে শিক্ষকের পরিপূরক হয়ে কাজ করাও সহজ হবে। মাতাপিতা, শিক্ষক শিশুর শিক্ষায় সমানভাবে অংশ গ্রহণ করার ফলে গৃহ ও বিদ্যালয়ের কৃত্রিম পার্থক্য তিরোহিত হবে। শিক্ষক যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রচেষ্টায় ব্রতী, সে উদ্দেশ্যগুলি মাতাপিতা তাদের সহানুভূতি-পূর্ণ চেষ্টার দ্বারা গৃহে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে শিশুর আচরণে প্রতিফলিত করতে পারেন। শিক্ষিত মাতাপিতার পক্ষে বিদ্যালয়ের কতকগুলি অনিবার্য সীমাবদ্ধতা সহজে অনুমান করা সম্ভব এবং শিশুর সম্বন্ধে তাদের নিজস্ব জ্ঞান সরবরাহ করে তারা বিদ্যালয়ের কাজ এগিয়ে দিতে পারেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে শিক্ষক ও মাতাপিতার সংগে, গৃহ ও বিদ্যালয়ের সংগে কিভাবে সংযোগ স্থাপন করা যায়? কিভাবে শিক্ষায় মাতাপিতার সহযোগিতা লাভ করা যায়? যেখানে অধিকাংশ মাতাপিতা নিরক্ষর, সন্তানের শিক্ষায়

নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন নয়, সেখানে বিদ্যালয়কে অগ্রণী হয়ে মাতাপিতার সহযোগিতা লাভ করার চেষ্টা করতে হবে। বিদ্যালয়ের কি পরিকল্পনা, কি আদর্শ, বিদ্যালয় কি কি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, প্রভৃতি ব্যাখ্যার জন্য এবং মাতাপিতার আস্থা ও সাহায্য লাভের জন্য বিদ্যালয়ে মাতাপিতার সমবেত উপস্থিতির ব্যবস্থা বিদ্যালয় করতে পারে। আধুনিক বিদ্যালয়গুলিতে মাতা-পিতার এ ধরনের সমবেত হওয়াকে 'মাতাপিতার দিবস' (Parents' day) বলা হয়। তাছাড়া 'মাতাপিতা-শিক্ষক সংঘ' (Teacher-Parent Association) সংগঠনের দ্বারা মাতাপিতা, অভিভাবক এবং শিক্ষকদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা যেতে পারে। তাছাড়া প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকা প্রতিদিন একটি সময় নির্দিষ্ট করে দিতে পারেন, তখন মাতাপিতা বা অভিভাবক তাঁর সংগে দেখা করে তাদের সন্তানদের সমস্যার সংগে শিক্ষক-শিক্ষিকাকে পরিচিত করতে পারেন।

২। বিদ্যালয় (School) ঃ

বিদ্যালয় শিক্ষার প্রত্যক্ষ বাহন। পরিবারের শিক্ষামূলক গুরুদায়িত্বকে বহন করার জন্যই বিদ্যালয়ের সৃষ্টি। ইংরেজী 'স্কুল' শব্দটি গ্রীক্ সখোল *(Shkole)* শব্দ থেকে উদ্ভূত। প্রাচীন গ্রীকরা আগুন পোহানর সময় যে আলোচনা বৈঠক করত সেটাই আজকের স্কুলের আদি জনক বলে মনে হয়।

বিদ্যালয় সৃষ্টির মূলে রয়েছে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা। সমাজের অগ্রগতির সংগে সংগে মানুষের জীবনে নানা জটিলতার সৃষ্টি হল। শিক্ষার বিষয়বস্তু তাই হল জটিল এবং আয়তনে বিপুল। আমাদের সমাজের আদিম স্তরে মানুষের অভিজ্ঞতা, ভাবধারা, কলাকৌশল ইত্যাদির আদান প্রদানের কোন নির্দিষ্ট মাধ্যম ছিল না। মানুষ তখন পরিবারের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে তাদের অর্জিত অভিজ্ঞতা বা কলাকৌশল পরবর্তী বংশধরদের অর্পণ করেই ক্ষান্ত হত। আগে ব্যক্তি ছিল পরিবার-কেন্দ্রিক, কিন্তু সমাজের অগ্রগতির সংগে সংগে সমাজও ব্যক্তির জীবনে তার নিজস্ব চাহিদা উপস্থিত হল। ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা পারিবারিক প্রতিষ্ঠান এ সব চাহিদা মেটাতে পারে না। তাই সৃষ্টি হল বিদ্যালয় ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং এসব প্রতিষ্ঠান সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করেছে।

সমাজের জটিলতা বৃদ্ধির সংগে সংগে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের নানা জটিল সমস্যা দেখা দেয়, জীবিকা অর্জনের দুরূহতা বৃদ্ধি পায়। পরিবারের বয়স্ক সদস্যরা অর্থ উপার্জনে, জীবন সংগ্রামে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। তাছাড়া, যন্ত্র সভ্যতার অগ্রগতির ফলে শ্রমিক ও শ্রম আর পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ নেই—গৃহ আর উৎপাদনের কেন্দ্র নয়, উপভোগের স্থল মাত্র। তাই প্রয়োজন শিক্ষায়তনের সেখানে মানব শিশু শিক্ষা অর্জন করতে পারে।

শিশু মনস্তত্ত্বের (Child Psychology) প্রচলন ও প্রচারের ফলে আজ আমরা শিশু মনের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক কথাই জেনেছি। শিশুর পরিণত বয়সের ব্যক্তিসত্তার বুনিয়াদ শৈশবেই রচিত হয়। তার আবেগ, প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ প্রভৃতির বিভিন্ন চাহিদার পরিতৃপ্তির মাধ্যমেই ব্যক্তিসত্তা গড়ে ওঠে। আমাদের আগে ধারণা ছিল শিশুর জীবনে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু ফ্রয়েড দেখিয়েছেন, শিশুর জীবনও নানা ধরনের মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা-বিজড়িত। এ সমস্যাগুলির সার্থক ও সুষ্ঠু সমাধানের উপর নির্ভর করছে শিশুর ভবিষ্যৎ ব্যক্তি-সত্তার রূপ। শিশুর প্রবৃত্তিমূলক বা প্রক্ষোভ জনিত অভিজ্ঞতাকে ও চাহিদাকে সুসংহত না করলে ভবিষ্যতে এগুলি তার জীবনে অবাঞ্ছিত এবং অসামাজিক প্রভাব আনবে। কিন্তু জীবন সংগ্রামে ব্যস্ত মাতাপিতা বা পরিজনের পক্ষে শিশুর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া সম্ভব নয়। আবার অনেক মাতাপিতা এ সব ব্যাপারে অজ্ঞ এবং উদাসীন, অনেকের আবার সন্তান-সন্ততি বেশী। সুতরাং শিশুকে মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে গভীর মনোনিবেশ ও সহানুভূতি সহকারে শিক্ষা দেওয়ার প্রচুর অবসর, সুযোগ বা ক্ষমতা তাদের নেই। তাই প্রয়োজন হয়ে পড়ল বিদ্যালয়ের।

এ সব ছাড়াও রয়েছে বিদ্যালয় সৃষ্টির পেছনে যুগের চাহিদা। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তি নাগরিকদের সামাজিক দায়িত্বসম্পন্ন করে তোলার জন্য বিদ্যালয় সৃষ্টি করেছে।

বিদ্যালয়ের উৎপত্তির কারণ যা হোক না কেন, আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় শিশুর জীবনের সর্বোতমুখী বিকাশের জন্য বিদ্যালয় অপরিহার্য। গৃহের সীমিত পরিবেশ থেকে বিদ্যালয়ই শিশুকে মুক্তি দেয়, বিদ্যালয়ই তার কাছে বৃহত্তর সমাজ জীবনের পটভূমিকা গ্রহণ করে। স্কটিশ শিক্ষাবিদ ডেভিড স্টো *(David*

Stow) একটি অভিনব মতবাদের দ্বারা বিদ্যালয়ের অপরিহার্যতা ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর এ মতবাদের নাম সংখ্যাগত সহানুভূতি (Sympathy of Numbers)। এর অর্থ হল সংখ্যার একটি বিশেষ ক্ষমতা (power) বিদ্যমান যা ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষা গ্রহণ বা শিক্ষণে সম্ভব নয়। শিশু যখন বিদ্যালয়ে অন্যান্য সহপাঠীর সংগে মিলিত হয় তখন তার মনে যে বৌদ্ধিক ও নৈতিক সহানুভূতি জাগ্রত হয়, গৃহের পরিবেশে তা সম্ভব নয়। শিশু যখন তার সমবয়স্ক সংগীদের সংগে মিলিত হয় সে তার বন্ধু, খেলার সাথী, বিশেষ খেলা বা কাজ নির্বাচিত করে এবং এ নির্বাচন কার্য সহানুভূতির দ্বারা সম্ভব। আর এ সহানুভূতি অন্যান্য শিশুদের সংগে সমবেত হবার ফলে শিশুর মনে জাগ্রত হয়। এদিক থেকে শিশুর জীবনে বিদ্যালয়ে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা বর্তমান। বার্ট্রাণ্ড রাসেল তাঁর 'Education and Social Order' বইতে বলেন একটি সাধারণ গৃহশিশুর মানসিক ও দৈহিক বিকাশের পক্ষে সহায়ক নয়। বিদ্যালয়ই সকল শিশুকে উপযুক্ত আলো, হাওয়া, উপযুক্ত খাদ্য, উন্মুক্ত খেলার স্থান, অন্যান্য শিশুদের সাহচর্য, মাতা-পিতার বিশেষ স্বার্থ থেকে মুক্তি, আনন্দ বিনোদন প্রভৃতির সুযোগ দিতে পারে। শৈশবে এ সব সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলে শিশু রুগ্ন, উদ্যমহীন ও স্নায়বিক দুর্বল হয়ে পড়বে।

পরিবার ও বিদ্যালয়ের সম্পর্ক (Relation between Family and School) : বিদ্যালয় সৃষ্টির ফলে পরিবারের শিক্ষামূলক কর্তব্য অনেক কমে গেছে—শিশুকে শিক্ষা দেবার দায়িত্ব আজ আর পরিবারের উপর নেই। প্রত্যেক মাতাপিতাই শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে তার শিক্ষার গুরুভার থেকে নিজেরা অনেকটা মুক্ত থাকেন।

এ কথা সত্য যে সমাজগত ভাবে বিদ্যালয়কেই আজ আমরা শিক্ষার প্রধান মাধ্যম বলে স্বীকার করে নিয়েছি। কিন্তু তা বলে শিক্ষায় পরিবারের প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। শিশু পরিবারেই জন্মগ্রহণ করে, পরিবারেই বর্ধিত হয়, মাতাপিতা ও প্রিয়জনদের সান্নিধ্যে এবং সহায়তায় সে তার শৈশবসুলভ চাহিদার পরিতৃপ্তি খোঁজে। শিশুর আবেগ, অনুভূতি, আব্দার, অনুযোগ সব কিছু দিয়েই পরিবারের অস্তিত্ব। তাই শিশু মনের উপর পরিবারের প্রচণ্ড প্রভাব।

অন্যদিকে বিদ্যালয় শুধু একটি কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান নয়, বিদ্যালয়কে তার শ্রেণীকক্ষে পারিবারিক আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হয়। শিক্ষককে হওয়া চাই মাতাপিতার মত গভীর দরদী ও স্নেহসম্পন্ন। শিশু যেন বিদ্যালয়কে আপনার গৃহের মধ্যে স্থানান্তর বলেই বুঝতে পারে।

বিদ্যালয় ও সমাজের সম্পর্ক (Relation between School and Society): বিদ্যালয় পরিবার ও সমাজের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে। শিশুর চাহিদা ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া বিদ্যালয়ের প্রধান কাজ। কিন্তু সে সংগে তাকে সমাজের ভাবধারার সংগে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং সমাজ-চেতনা সম্পন্ন করে তোলাও বিদ্যালয়ের কর্তব্য। সমাজে শিশু কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করবে, জীবিকার জন্য কোন্ বৃত্তি অবলম্বন করবে, সমাজ প্রগতিতে সে কিভাবে কতটুকু সহায়তা করতে পারে— এসব ব্যাপারেও বিদ্যালয়ের কর্তব্য রয়েছে।

আসল কথা, শিশু যখন গৃহ ছেড়ে বিদ্যালয়ে আসে তখন শিশুকে নিছক একটি পরিবারের সমস্যা বলে গণ্য করা হয় না। তখন তাকে সামাজিক পটভূমিকায় বিবেচনা করা হয়। সকল সামাজিক সমস্যা, পরিবেশ এবং ভাব-ধারার সংগে বাস্তব দৃষ্টিভংগী নিয়ে শিশুর পরিচিতি ঘটান বিদ্যালয়ের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। শিশু যেন পরিণত বয়সে দায়িত্বশীল নাগরিক হয়ে সমাজ ও তার পরিবারের সেবা করতে পারে—এখানেই বিদ্যালয়ের অস্তিত্বের সার্থকতা।

গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বিদ্যালয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য অপরিসীম। গণতন্ত্র নির্ভর করে পরমত সহিষ্ণুতা ও জীবনের কতকগুলি মূল্যবোধের জ্ঞানের উপর। একমাত্র বিদ্যালয়ই ভাবী নাগরিকদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে গণতন্ত্রের উপযুক্ত নাগরিক গঠনে সহায়তা করতে পারে।

বিদ্যালয়ের কর্তব্যগুলি অলোচনার পর আমরা দেখতে পাই বিদ্যালয় সমাজের প্রতিনিধিত্বই করে। এজন্য বিদ্যালয়কে সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ (Miniature society) বলা হয়। পার্সি নান যথার্থ বলেছেন: বিদ্যালয় হবে একটি কৃত্রিম সমাজ, এই অর্থে যে, উহা সত্যিকার ভাবে বাইরের পৃথিবীকে প্রতিফলিত করবে, কিন্তু সমাজে যাহা মংগলজনক এবং যাহা গুরুত্বপূর্ণ তাহাই

শুধু বিদ্যালয় প্রতিফলিত করবে। জন ডিউই বিদ্যালয়কে সমাজের মধ্যেই দেখতে চেয়েছেন। বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে যেন কোন দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর সৃষ্টি করা না হয়। একমাত্র বিদ্যালয়েই বাস্তবজীবনের প্রতিফলন সম্ভব। শিক্ষাকে ব্যাপক অর্থে ব্যাখ্যা করে ডিউই এক জায়গায় বলেছেন : শিক্ষা হচ্ছে জীবনের সামাজিক স্থিতির উপায়। শিক্ষা ছাড়া আমাদের জীবনে সামাজিক কোন অস্তিত্ব নেই।

বৃহত্তর সমাজে প্রবেশ করবার আগে শিশুর কাছে বিদ্যালয়ই সমাজ পরস্পর মেলামেশা, ভাবের আদান-প্রদান, খেলাধূলা, যৌথ কর্ম ও বিদ্যালয়ের নানাবিধ নিয়ম ও শৃংখলার মাধ্যমে শিশু তার জীবনের প্রস্তুতিই শেখে এবং এগুলি নিয়েই তার ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি রচিত হয়। ডিউই তাই চমৎকার বলেছেন, শিক্ষা শুধু জীবনের প্রস্তুতি নয়, শিক্ষাই জীবন।

বিদ্যালয় সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলে আমরা উল্লেখ করেছি। সমাজ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে কোন কৃত্রিম পার্থক্য থাকা উচিত নয়। ডিউই বলেন, বিদ্যালয়ের পরিবেশ যদি সমাজধর্মী হয় তবে ছাত্রদের মধ্যে শৃংখলা বজায় থাকে। সকল অসামাজিক পরিবেশই বিশৃংখলার জন্য দায়ী। ছাত্রদের মধ্যে কর্তব্যবোধ, দায়িত্ববোধ একমাত্র সমাজধর্মী পরিবেশেই জাগ্রত হয়। মানুষের জীবনের সংগে রয়েছে সমাজের অন্তরের যোগ। তার সমস্ত কর্ম, আশা-আকাঙ্ক্ষা, জীবনদর্শন সামাজিক পটভূমিকাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। সুতরাং শিক্ষা যদি মানুষকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এক [illegible] সন্ধান দেয়, সে শিক্ষা ব্যর্থ হতে বাধ্য। শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। তাই সমাজের চাহিদা বিদ্যালয়ের মাধ্যমে রূপ পাবে। বিদ্যালয় হবে সমাজের প্রতিচ্ছবি।

শিক্ষা সমাপনান্তে প্রতিটি শিক্ষার্থী বৃহত্তর সমাজ জীবনে বাস্তব সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে। সুতরাং সে সমাজের সংগে যদি শিক্ষা-জীবনে শিক্ষার্থীর পরিচয় না ঘটে, বাস্তব জীবনের সমস্যার সংগে যদি কোন সংস্রব না থাকে, তবে শিক্ষা হবে অসামাজিক, বাস্তব বিমুখী। তাই বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীকে সকল সামাজিক পরিস্থিতির সংগে পরিচয় করিয়ে দিতে হয়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই প্রকৃত শিক্ষক। বিদ্যালয়ে সামাজিক রীতি-নীতি, সমস্যা, জটিল পরিস্থিতি প্রভৃতির পরিচয় যদি শিক্ষার্থী লাভ করে, তবে বাস্তব জীবনে,

পরিণত বয়সে, সামাজিক অপ্রতিকূল পরিবেশের সংগেও শিক্ষার্থী সংগতিসাধন করতে পারে।

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনে বিদ্যালয়ে সমাজ-ধর্মী পরিবেশ সৃষ্টি করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বিদ্যালয়কে কিভাবে সমাজ ধর্মী করে তোলা যায়? 'সমাজ' যখন বলি তখন আমরা বুঝি পরস্পর পরস্পরের সংগে চেতনাসম্পন্ন হওয়া (mutual awareness)। উহা সহানুভূতির মাধ্যমে সম্ভব। আর সহানুভূতি বা সমাজ-চেতনার মূর্তরূপ হল গোষ্ঠীভুক্ত জীবনযাপন। ছাত্ররা যদি বিদ্যালয়ে একই পরিবারভুক্ত বা গোষ্ঠীভুক্ত বলে ভাবতে শিখে, তারা আচার-আচরণে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে, তবে বিদ্যালয়ই হবে সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবি।

জন ডিউই বলেন, একমাত্র গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তির চাহিদার সংগে সামাজিক চাহিদার সার্থক সমন্বয় সম্ভব। সুতরাং শিক্ষায়তনে যদি আমরা গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করি, তবে ব্যষ্টি ও সমাজের সম্পর্কের একটি সুন্দর সামঞ্জস্য বিধান হবে। শিক্ষার্থীকে গণতন্ত্রসম্মত ভাবে বিদ্যালয়ের যৌথ জীবন পরিচালনায়, শাসন পরিচালনায় অধিকার দিতে হবে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মত বিদ্যালয় পরিচালন ব্যবস্থায়ও ছাত্রদের মধ্যে প্রধান মন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, ক্রীড়ামন্ত্রী, শৃংখলারক্ষার মন্ত্রী, বিচার-মন্ত্রী, আমোদ-প্রমোদ মন্ত্রী ইত্যাদির স্থান থাকা চাই। বিদ্যালয়ে যদি শিক্ষার্থীরা একটি সামাজিক সংস্থার পরিচালনার অধিকার পায় তবে বৃহত্তর সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ হবে বিদ্যালয়।

তাছাড়া, বিদ্যালয়কে সমাজের প্রতিচ্ছবি করে গড়ে তুলতে হলে সকল সামাজিক কর্ম এবং আচরণকে বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রবর্তন করা চাই। সহপাঠ্য-সূচীর অন্তর্গত কার্যাবলী হবে এ ব্যাপারে পরম সহায়ক। খেলাধূলা, সমাজসেবা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, রাষ্ট্রজীবনের কর্তব্য পালনের শিক্ষা, জনসংযোগের ব্যবস্থা, বনভোজন, ভ্রমণ প্রভৃতির মাধ্যমেই বিদ্যালয়ে সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

একটি কথা এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে গভীর সংযোগ থাকা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকা উচিত এবং এ পার্থক্য নিঃসন্দেহে কৃত্রিম। আমরা বিশ্বাস করি, স্বাভাবিক সমাজ জীবন

বিদ্যালয়ে প্রবর্তিত হবে। কিন্তু সংগে সংগে ইহাও আমরা বিশ্বাস করি, সমাজে যাহা শুভ, যাহা মংগলদায়ক, যাহা আদর্শমূলক তারই প্রতিচ্ছবি হবে বিদ্যালয়। সমাজে আমরা যে দুর্নীতি, যে অনাচার, যে আদর্শভ্রষ্ট আচরণ ও পাপাচার প্রত্যক্ষ করি বিদ্যালয়ের পরিবেশে যেন তার উপস্থিতি না থাকে। শিক্ষার্থীর জীবনে সামাজিক শুভ আচরণই আমরা কামনা করি। সমাজের কুপ্রথা যেন বিদ্যালয়ে প্রবেশ না করে। সামাজিক মংগলের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে শিক্ষার্থী নতুন সার্থক সমাজের সোপান সৃষ্টি করবে।

৩। সমাজ (Society) :

সমাজ শিক্ষার একটি অপরিহার্য মাধ্যম। সমাজ ব্যক্তির সংগে ব্যক্তির বিভিন্ন জটিল সম্পর্কের সমষ্টি মাত্র। সমাজ ব্যক্তির আচরণ ও কর্মক্ষমতাকে যেমন নিয়ন্ত্রিত করে, তেমনি তাদের প্রকাশ ও বাস্তবরূপ সম্ভব করে। সমাজ ছাড়া ব্যক্তির অস্তিত্ব সম্ভব নয় এবং ব্যক্তির জীবনের মধ্য দিয়েই সমাজ মূর্ত হয়ে ওঠে।

শিক্ষার একটি প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজ সংরক্ষণ এবং সমাজ প্রগতি। সুতরাং ব্যক্তির জীবনে সমাজ তার নিজস্ব চাহিদা নিয়ে উপস্থিত হয়। ব্যষ্টির চাহিদা ও সমাজের চাহিদার মধ্যে মাঝে মাঝে সংঘাত সৃষ্টি হয়। সুতরাং উভয়ের মধ্যে একটি সার্থক সমন্বয় প্রয়োজন। শিক্ষার সহায়তায় তা সম্ভব।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে সমাজের স্থান গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সমাজের বিশাল পটভূমিকায় ব্যাপ্ত হয়। ব্যক্তির মংগল সামাজিক মংগলের সংগে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সামাজিক সংগঠনই ব্যক্তিকে সমাজধর্মী করে তোলে।

৪। রাষ্ট্র (State) :

প্রাচীনকালে রাষ্ট্র শাসন ব্যাপার নিয়েই ব্যস্ত থাকত। যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যেই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব প্রধানতঃ সূচিত হত। কিন্তু বর্তমান সভ্যতায় রাষ্ট্র একটি প্রচণ্ড শক্তিশালী সামাজিক সংগঠন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ঘটনায় আমরা পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভাবে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করছি। রাষ্ট্রের

হত্ত আজ আমাদের জীবনের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম, শিক্ষা, আচার-আচরণ, শিক্ষাদীক্ষা সর্বস্তরে প্রসারিত। এজন্য রাষ্ট্রকে শিক্ষার একটি অপরিহার্য মাধ্যমরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় রাষ্ট্র শিক্ষার একটি প্রধান বাহন।

শিক্ষিত নাগরিক ব্যতীত কোন রাষ্ট্র তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে এবং উন্নতি লাভ করতে পারে না। সুতরাং রাষ্ট্র তার নাগরিকদের শিক্ষার ব্যাপারে উদাসীন থাকতে পারে না বা থাকা উচিতও নয়। রাষ্ট্র শিক্ষা প্রচারে ও প্রসারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু রাষ্ট্র শিক্ষার প্রসারকার্যে সহায়তা করুক, এ ব্যাপারে সবাই একমত হলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সক্রিয় হস্তক্ষেপ করার বিষয়ে মতদ্বৈত আছে। একদল চিন্তানায়ক বিশ্বাস করেন, রাষ্ট্র সক্রিয়ভাবে শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করবে, অন্যদল বলেন, শিক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ব্যক্তি-স্বাধীনতার পরিপন্থী।

দার্শনিক হেগেল *(Hegel)* বলেছিলেন, রাষ্ট্রের কাজ শিক্ষামূলক। একনায়কত্ববিশিষ্ট (Totalitarian) রাষ্ট্রের সমর্থকরা বলেন, শিক্ষা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকা উচিত। প্রতিটি শিশুকে রাষ্ট্র তার নিজস্ব রাজনৈতিক মতবাদ অনুযায়ী শিক্ষা দেবে। রাষ্ট্রের প্রয়োজন ও আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থা নির্ধারিত হওয়া চাই। তার ফলে প্রতিটি শিশু ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের আজ্ঞাবহ নাগরিকে পরিণত হবে।

অপরপক্ষে যাঁরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে (Individualism) বিশ্বাসী, তাঁরা বলেন, রাষ্ট্র যদি ব্যক্তির শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত করে তবে ব্যক্তির স্বাধীনতা বলে কিছুই থাকবে না। ব্যক্তি নিজের অভিরুচি অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ করবে, ব্যক্তির মত ও পথের স্বাধীনতাই রাষ্ট্রের মংগল নির্ধারণ করবে।

এই দুই মতবাদই চরম মতবাদ। শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের যেমন স্বাধীনতা থাকা চাই, তেমনি কিছুটা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণও কাম্য। পারিবারিক বা অন্যান্য সামাজিক সংস্থার ক্ষেত্রে এবং শিল্প সংস্থার ক্ষেত্রে যেমন অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা সমর্থন করা যায় না, তেমনি শিক্ষার ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্যও রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে রাষ্ট্র শিক্ষা কার্য পরিচালনা করবে,

শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করবে। রাষ্ট্র শিক্ষায়তনগুলিকে অর্থ সাহায্য করবে, উপযুক্ত শিক্ষক সংগ্রহের ব্যবস্থা করবে, শিক্ষার উদ্দেশ্য যাতে সমাজধর্মী হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখবে এবং শিক্ষা সম্প্রসারণে ব্রতী হইবে। কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের একচেটিয়া ক্ষমতা থাকা উচিত নয়।

এই দুই মতবাদের একটি সমন্বয় গণতান্ত্রিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে সম্ভব। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শিক্ষা ব্যবস্থা রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলেও সেখানে শিক্ষার স্বাধীনতা (Academic Freedom) স্বীকৃত হয়।

আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্র শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করে না বটে, তবে রাষ্ট্র শিক্ষার ব্যাপারে নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে না। জনকল্যাণকামী সংগঠন হিসাবে রাষ্ট্র নাগরিকদের শিক্ষাকে তার অন্যতম দায়িত্ব বলে গ্রহণ করে। এক্ষণে দেখা যাক্ রাষ্ট্র কিভাবে এবং কতটুকু দায়িত্ব পালন করতে পারে।

প্রথমতঃ রাষ্ট্র বিভিন্ন অঞ্চলের প্রয়োজন অনুসারে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কারিগরী (technical) বিদ্যালয় এবং কলেজ প্রতিষ্ঠা করবে। অর্থাৎ রাষ্ট্রের শিক্ষামূলক প্রথম কাজ হল উপযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের পর রাষ্ট্র অজ্ঞ, উদাসীন মাতাপিতাকে তাদের সন্তানদের শিক্ষায় সুযোগ গ্রহণ করাতে বাধ্য করাতে পারে। আমাদের শাসনতন্ত্রে ১৪ বছর বয়স অবধি প্রতিটি ভারতীয় সন্তানের বাধ্যতামূলক শিক্ষা দেবার নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হয়নি। তার একটি অন্যতম কারণ, নিরক্ষর ও দায়িত্বজ্ঞানহীন মাতাপিতা তাদের ছেলেমেয়ের শিক্ষার ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। এসব স্থলে রাষ্ট্র এ ধরনের মাতাপিতাকে তাদের ছেলেমেয়েকে বিদ্যালয়ে পাঠাতে বাধ্য করতে পারে।

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্র শিক্ষাব্যয় নির্বাহের জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়কে আর্থিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা করবে। যে সব স্থলে অভিভাবকের পক্ষে বিদ্যালয়ের বেতন দেওয়া সম্ভব নয়, সেখানে রাষ্ট্রই সকল ব্যয় বহন করবে এবং বিনা বেতনে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেবে।

চতুর্থতঃ, বিভিন্ন বিদ্যালয়কে পরিচালনা ও আর্থিক সাহায্যের জন্য, তাদের মধ্যে সংহতি স্থাপনের জন্য রাষ্ট্র আপন শিক্ষা বিভাগের দ্বারা বিদ্যালয়গুলি

নিয়ন্ত্রিত করবে। আর্থিক সাহায্য যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা, শিক্ষাকার্য যথাযথ চলছে কিনা ইত্যাদি রাষ্ট্রই তদারকী করবে।

পঞ্চমতঃ, উপযুক্ত শিক্ষক সরবরাহের ব্যবস্থা রাষ্ট্রকেই করতে হবে। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা, বিদ্যালয়ে ছাত্রের ব্যবস্থা করা। আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা, পরিশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা, শিক্ষার উপকরণ হিসেবে যথেষ্ট। কিন্তু তাতেই সার্থক শিক্ষা হতে পারে না। শিক্ষার সকল আয়োজনের কেন্দ্রে শিক্ষক। শিক্ষককে কেন্দ্র করেই শিক্ষার আয়োজন সার্থক রূপ পেতে পারে। সুতরাং উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

কিন্তু এখানে উল্লেখযোগ্য যে রাষ্ট্রের শিক্ষামূলক কাজ যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, উহা সীমাবদ্ধ। পাঠ্যসূচী প্রণয়নে, শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণে, শিক্ষার উদ্দেশ্য নিরূপণে রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রয়োগ শিক্ষা স্বাধীনতাকে ব্যাহত করবে। এসব ক্ষেত্রে সকল দায়িত্ব শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্‌দের উপর অর্পিত করতে হবে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মত শিক্ষা ব্যবস্থার পূর্ণ বিকেন্দ্রীয়করণ যেমন আমরা সমর্থন করিনা, তেমনি সমাজতন্ত্রবাদের মত শিক্ষার কেন্দ্রীয়করণও আমরা সমর্থন করিনা। আমরা মধ্যপন্থায় বিশ্বাসী। রাষ্ট্রের সীমাহীন নিয়ন্ত্রণে শিক্ষা রাষ্ট্রের একটি হাতিয়ারে পর্যবসিত হবে, পাঠ্যসূচী, শিক্ষাপদ্ধতি, বিদ্যালয় প্রাণহীন যান্ত্রিক কর্মধারায় রূপান্তরিত হবে। অন্যদিকে ব্যক্তিগত উদ্যমের উপর কোন নিয়ন্ত্রণহীন শিক্ষা ব্যবস্থা সমর্থন করলে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোন সংহতি থাকবে না, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনেক ক্ষেত্রে ব্যবসায়ে রূপান্তরিত হবে, দরিদ্ররা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে।

৫। ধর্মীয় সংস্থা (Religious Institutions) :

শিক্ষার সক্রিয় বাহনরূপে বিদ্যালয় সৃষ্টির বহু পূর্ব থেকেই ধর্মীয় সংস্থা শিক্ষা প্রচার করে আসছে। বর্তমান সমাজে শিক্ষার পরোক্ষ মাধ্যমরূপে রাষ্ট্রকে মূলতঃ গণ্য করা হয়। কিন্তু অতীতকালে পরিবারের পরেই শিক্ষার পরোক্ষ মাধ্যম ছিল মন্দির, মসজিদ, গির্জা প্রভৃতি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি। প্রাচীনকালে মানুষের সামাজিক, নৈতিক এবং রাষ্ট্রজীবনেও ছিল ধর্মের অপরিসীম প্রভাব। প্রাচীন ভারতবর্ষে বৌদ্ধ বিহারগুলির মাধ্যমে, হিন্দুদের মঠ বা মন্দিরের মাধ্যমে

শিক্ষার কাজ চলত। মধ্যযুগে ইউরোপে গির্জাগুলিই শিক্ষার ভার গ্রহণ করত।

আজকের দিনে শিক্ষা-জগতে ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের প্রভাব খুবই কম। প্রাচীন ধর্ম ছিল মিষ্টিক *(Mystic)*, জড়জগৎ ও বুদ্ধি-বিচারের উপর ধর্মের আস্থা ছিল না। তাই অনেক সময় ধর্ম ছিল নির্বিচারবাদের (dogmatism) নামান্তর। জড়বাদী বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবাদের সম্প্রসারের ফলে ধর্মের একচেটিয়া অধিকার মানুষের জীবন থেকে আজ নির্বাসিত হয়েছে। আজকের দিনের বুদ্ধিবাদী মানুষের প্রবণতা ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারার (Secularism) প্রতি নিবদ্ধ।

কিন্তু এজন্য একথা বলা চলে না যে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আজ আর শিক্ষার বাহন নয়। এখন শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা বিশেষ ধর্মকে প্রাধান্য না দিয়ে মানব-ধর্মের কথাই বলি। ইহা আধ্যাত্মিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান-গুলি মানুষের মনে এই আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে। সুতরাং শিক্ষার বাহনরূপে ধর্মীয় সংস্থাগুলির প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য।

প্রশ্নাবলী

1. **Discuss the different agencies of education.**
2. **'The school is a miniature society'.—Discuss.**
3. **Write an essay on 'Home and School.'**
4. **Discuss the importance of home as a social agency of education.**
5. **Discuss the role of the state in education.**
6. **Discuss the role of home in education.**
7. **Discuss Parental co-operation.**

ছিল [illegible]। শিশুর চাহিদা সেখানে উপেক্ষিত। সমাজ, রাষ্ট্র বা শিক্ষকের চাহিদা এবং অভিরুচি পরিতৃপ্তির একটা উপায় (means) ছিল শিশু, শিক্ষায় তাকে অন্তিম (end) বলে গণ্য করা হত না।

গতানুগতিক পাঠ্যসূচী ছিল পুঁথিগত জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। পাঠ্যতালিকায় নির্বাচিত বই অধ্যয়ন, শিক্ষকের বক্তৃতা শ্রবণ—এসব নিয়েই ছিল গতানুগতিক পাঠ্যসূচী।

বাস্তব অভিজ্ঞতা, শিশুর সক্রিয়তা (activity) প্রভৃতি গতানুগতিক পাঠ্যসূচী থেকে ছিল নির্বাসিত। ফলে শিশু যা শিখত তার সংগে তার বাস্তবজীবনের কোন যোগসূত্র ছিল না। তার জীবনের সংগে তার শিক্ষার ছিল এক নিতান্ত অসংগত বিরোধ।

গতানুগতিক পাঠ্যসূচীতে ব্যক্তিগত বৈষম্যের (Individual difference) নীতি ছিল অস্বীকৃত। কতকগুলি অনাবশ্যক তথ্য-ভারে ভারাক্রান্ত পাঠক্রম নির্বিচারে সকল শিশুকে অনুসরণ করতে হত। এ পাঠক্রমে শিশুর হৃদয়ের সংগে শিক্ষার বিষয়বস্তুর তাই মিল ছিল না।

গতানুগতিক পাঠক্রমে শিক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যে কোন সমন্বয় সাধনের প্রয়াস নেই। চেষ্টিতবাদ মনের বিভিন্ন ক্রিয়ার মধ্যে শ্রেণী ভাগ করেছে, আর গতানুগতিক পাঠক্রম সে অনুযায়ী শিক্ষার বিষয়বস্তুর রাজ্যেও নানা ধরনের বিভাগ সৃষ্টি করেছে। এজন্য শিশু এ পাঠক্রমে যে জ্ঞান পায় তা এক-দেশদর্শিতা দোষে দুষ্ট, উহা সংকীর্ণ এবং শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান এ ধরনের শ্রেণীবিভাগ সমর্থন করে না।

গতানুগতিক পাঠক্রমে বাস্তবজীবনের সমস্যার সংগে, জীবনসংগ্রামের প্রস্তুতির সংগে কোন সম্পর্ক ছিল না। তাই শিক্ষার সার্থকতা সেখানে নির্ভর করত পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার উপর। ফলে পরীক্ষায় কৃতকার্যতা লাভ করাই সেই পাঠ্যসূচীতে মূল উদ্দেশ্য বলে স্বীকৃতি পেয়েছে।

গতানুগতিক পাঠ্যসূচীর বিরুদ্ধে আন্দোলন এসেছে নানা দিক থেকে। বস্তুবাদী, প্রয়োগবাদী, বাস্তববাদী দর্শনের প্রসারের ও প্রচারের ফলে গতানুগতিক পাঠ্যসূচীর সংস্কারের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। দার্শনিক আন্দোলন ছাড়াও মনস্তাত্ত্বিক এবং সমাজতাত্ত্বিক বিজ্ঞানও গতানুগতিক পাঠ্যসূচীকে ভ্রান্ত বলে ঘোষণা করেছে। পাঠ্যসূচী সম্বন্ধে আলোচনা প্রসংগে আমরা

প্রধান প্রধান দার্শনিক মতবাদগুলি আলোচনা করেছি। নিম্নে আমরা পাঠ্যসূচীর মনস্তাত্ত্বিক এবং সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি আলোচনা করছি।

৩। পাঠ্যসূচীর মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি (Psychological basis of Curriculum) :

আধুনিক মনস্তত্ত্ব বিশ্বাস করে যে শিশুর শিক্ষা নিষ্ক্রিয় ভাবে অধ্যয়ন মাত্র নয়। শিশুর শিক্ষা কর্মকেন্দ্রিক এবং কর্মভিত্তিক (activity centred and activity-based) হওয়া চাই। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষায় শিশু-মনের বিবেচনাই প্রধান। সুতরাং পাঠ্যসূচী শিশুর চাহিদাকেন্দ্রিক (needs-centred) হওয়া চাই। তৃতীয়তঃ, শিশুর মন কতকগুলি মানসিক কর্মক্ষমতার সমষ্টি নয়। মানব মন একটি একক সত্বা (whole)। সুতরাং পাঠ্যসূচীতে কৃত্রিম বিষয় বিভাজন সার্থক শিক্ষার বিরোধী। সুতরাং পাঠ্যসূচীতে বিষয়গুলি মধ্যে একটি সমন্বয় বা অনুবন্ধ (correlation) থাকা চাই। মনস্তত্ত্বের এই তিনটি বক্তব্য আধুনিক শিক্ষায় তিনটি আন্দোলনরূপে খ্যাত। এজন্য আলাদাভাবে এই বক্তব্যগুলির আলোচনা করা হচ্ছে :

কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যসূচী (Activity based Curriculum) : শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষায় যে পাঠ্যসূচী নির্ধারিত হয় তাতে শিশুর সক্রিয়তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। গতানুগতিক পাঠ্যসূচীতে শিশু ছিল শিক্ষার ব্যাপারে গ্রহীতা আর শিক্ষক ছিলেন দাতা। নির্বাচিত বিষয়াবলীর জ্ঞান শিশু নিষ্ক্রিয়ভাবে গ্রহণ করত। কিন্তু আধুনিক মনস্তত্ত্ব বিশ্বাস করে যে, শিক্ষা শিশু, তার কর্মপ্রবৃত্তির প্রেরণা ছাড়া গ্রহণ করে তার সংগে তার জীবনের সম্পর্ক নেই। কর্মই জীবন আর শিক্ষা কর্মভিত্তিক না হলে তা জীবন বিরোধী।

কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যসূচীর প্রধান প্রবক্তা হচ্ছেন জন ডিউই। তাঁর প্রবর্তিত পাঠ্যসূচীতে কি কি পুস্তক পড়ান হবে তার কোন স্থান নেই। পাঠ্যসূচীতে শিশু এবং তার কর্মবৃত্তিই স্থান পেয়েছে। ডিউই দেখিয়েছেন, শিশু তার কর্মবৃত্তির মাধ্যমে কিছু সৃষ্টি করতে চায়। সৃজনশীলতাই মানবের ধর্ম। সুতরাং পাঠ্যসূচীতে শিশুর সক্রিয়তাই প্রধান। কেননা সক্রিয়তাই শিশুজীবনের প্রাণ (Activity is the salt of child life)।

শিশু তার কর্মবৃত্তির সাহায্যে নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা আহরণ করে এবং তাকে বাস্তবে প্রয়োগ করারও চেষ্টা করে। অভিজ্ঞতার সার্থক প্রয়োগ ও পরিবর্তনই শিক্ষা। সুতরাং পাঠ্যসূচী কর্মকেন্দ্রিক তথা অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক হওয়া চাই।

নব্যশিক্ষাতত্ত্বে কর্মকেন্দ্রিক বা অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠ্যসূচীকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থন করা হয়েছে। একমাত্র কর্মবৃত্তির মধ্যে, সক্রিয়তার মধ্যে আমরা আমাদের মনের সামগ্রিক প্রকাশ পাই। আবার অনুভূতি, ইচ্ছা, এবং চিন্তার সার্থক সমন্বয় কর্মবৃত্তির মধ্যেই ধরা পড়ে। পুস্তক-কেন্দ্রিক বা বিষয়-কেন্দ্রিক পাঠ্যসূচীতে তা সম্ভব নয়।

শিক্ষায় আমরা যে সুস্থমন বা মানসিক শৃংখলার কথা বলি তা সুস্থ দেহ ছাড়া সম্ভব নয়। তাই শিশুর মানসিক ও দৈহিক বিকাশ এবং সুস্থতা আমাদের কাম্য। সুতরাং পাঠ্যসূচীতে শিশুর অংগপ্রত্যংগ সঞ্চালনের স্থান থাকা চাই। খেলাধূলা এবং অন্যান্য স্বতঃপ্রণোদিত কর্মের ও উদ্যমশীলতার উপযুক্ত মর্যাদা পাঠ্যসূচীতে স্বীকৃত হওয়া চাই।

কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যসূচীতে শিশুর ব্যক্তিত্ব-বিকাশই বড় কথা। নানা সৃজনশীল কাজের মধ্য দিয়ে, নানা সংঘাতময় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিশুর ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। তাছাড়া গড়ে ওঠে জীবন ও সমাজ সম্বন্ধে শিশুর নানা ধরনের মূল্যবোধ। তাই এ পাঠ্যসূচীতে নানা ধরনের সৃজনশীল কাজের সুযোগ থাকে। বিদ্যালয়ে অভিনয়, নৃত্যগীত, খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সাহিত্য-বাসর, পুতুল তৈরী, ছবি আঁকা প্রভৃতির ব্যবস্থা রাখা হয়।

কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যসূচীর শিক্ষা কেন্দ্রে এক বা একাধিক কাজের সুযোগ থাকে। অনেক ক্ষেত্রে এই কাজের বিনিময়ে শিক্ষা গ্রহণের সংগে সংগে শিশু অর্থ উপার্জনও করতে পারে। শিল্পকেন্দ্রিক (craft-centred) শিক্ষার গোড়ার কথা এখানেই নিহিত। কর্মের মাধ্যমে শিক্ষাকে (learning by doing) বাস্তব শিক্ষা বলে এই পাঠ্যসূচীতে মেনে নেওয়া হয়।

কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশু শুধু সক্রিয়ভাবে শিক্ষা গ্রহণ করে তা নয়, সে তার বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যাপারেও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। পরিণত জীবনে সমাজে প্রবেশ করে যে ন্যায়-নীতি, দায়িত্ববোধ ও নেতৃত্ব শিশুর জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজন সে সব শিশুকে তার বিদ্যালয় পরিচালনার মাধ্যমে শিখিয়ে

দেওয়া হয়। অর্থাৎ কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় বিদ্যালয় ও সমাজ, শিক্ষা ও বাস্তব জীবনের মধ্যে কোন প্রাচীর সৃষ্টি করা হয় না। বিদ্যালয় পরিচালন (School Government) শিশুর উপর ছেড়ে দেবার ফলে শিশু সব সামাজিক আচরণে অভ্যস্ত হবার সুযোগ পায়।

চাহিদাকেন্দ্রিক পাঠ্যসূচী (Needs-centric Curriculum): গতানুগতিক শিক্ষক-কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা এবং বিষয়বস্তু-কেন্দ্রিক পাঠ্যসূচীর বিরুদ্ধে মনস্তাত্ত্বিক আন্দোলনের অন্যতম ফল হল চাহিদা-কেন্দ্রিক পাঠ্যসূচীর প্রবর্তন।

প্রাচীন মনস্তত্ত্বে নানা ধরনের দার্শনিক বিকৃত ব্যাখ্যার প্রভাব ছিল। তার একটা কারণ হল, মনস্তত্ত্ব সেদিন ছিল দর্শনের কুক্ষিগত। প্রাচীন মনস্তত্ত্বের বিশ্বাস ছিল দেহ ও মনের আলাদা সত্তা বিদ্যমান। তাই পাঠ্যসূচীতে বুদ্ধিগত চর্চার উপর গুরুত্ব দেওয়া হত। তাছাড়া, শিশু-মন বলে যে আলাদা একটি বস্তু আছে তার কোন স্বীকৃতি ছিল না প্রাচীন মনস্তত্ত্বে। পরিণত বয়সের যে মন তার সংগে কল্পনা বিলাসী, স্বপ্নবিলাসী শিশুমনের একটা পার্থক্য আছে। তার স্বপ্ন, তার আব্দার, আবেগ, অনুযোগ, চাহিদা প্রভৃতির মূল্যকে বাদ দিলে শিশু-মনকেই অস্বীকার করা হয়। আধুনিক শিশু-মনস্তত্ত্বের (Child Psychology) প্রচুর গবেষণার ফলে শিশু-মন সম্বন্ধে আমরা অনেক তথ্য এবং শিশুর জীবনে তার গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত। ফলে পাঠ্যসূচীতে শিশু-মনের চাহিদাকেই সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তাই শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুর স্থানই সর্বাগ্রে।

গতানুগতিক পাঠ্যসূচীতে সমাজ, রাষ্ট্র, অভিভাবক বা শিক্ষকের চাহিদাই শিশুর বা শিক্ষার্থীর জীবনে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করা হত। শিক্ষার্থীকে নিষ্ক্রিয়ভাবে তাদের অভিরুচি অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ করতে হত। ফলে শিশুর নিজের অভিরুচি বা চাহিদা থাকত অতৃপ্ত, মন থাকত অভুক্ত।

কিন্তু আধুনিক মনস্তত্ত্ব প্রমাণ করেছে যে, শিশু-মনের বিবেচনা ও বক্তব্য যদি পাঠ্যসূচীতে না থাকে তবে সে পাঠ্যসূচী শিশুর মনের উপর উৎপীড়ন মাত্র। উহা কৃত্রিম, যেহেতু শিশুর মনের সংগে তার কোন যোগসূত্র নেই। উহা শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক নয়, বরং পরিপন্থী। কেননা শিশুর স্বাভাবিক মানসিক গতিপ্রকৃতির সংগে এ ধরনের পাঠ্যসূচীর মিল নেই।

বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর সৃষ্টি করা হবে। পার্সিনান্ এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করে বলেছেন, বিদ্যালয়ের মধ্যে সকল সামাজিক কর্মের স্থান থাকবে, বিদ্যালয় হবে সমাজের প্রতিচ্ছবি।

প্রতিটি যুগ, প্রতিটি সমাজ তার নতুন আহ্বান, নতুন আবেদন, নতুন সমস্যা নিয়ে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়। তার চাহিদার সংগে সংগতিবিধান করা চাই, তার সমস্যার সমাধান করা চাই। তা না হলে আমরা পিছিয়ে পড়ব, জীবনের গতিশীলতা থেকে আমরা বিচ্যুত হব। ইতিহাস এই সাক্ষ্য দেয় যে, কোন জাতি, কোন সমাজ, কোন ব্যক্তি স্থাণু হয়ে থাকতে পারে না। সুতরাং চলমান জীবন ও জগতের নানাবিধ সমস্যা ও চাহিদার সংগে শিক্ষার্থীর পরিচয় না থাকলে শিক্ষা সমাপনান্তে সে যখন বৃহত্তর জীবনে প্রবেশ করবে তখন সে দেখবে তার অর্জিত শিক্ষার সংগে তার জীবনের কোন মিল নেই। বিংশ শতাব্দীতে যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে বসে যদি আমরা কৃষি-সভ্যতার যুগের শিক্ষাধারা মেনে নেই তবে বাস্তব সমাজ আমাদের ক্ষমা করবে না। সমাজতাত্ত্বিক আন্দোলনের গোড়ার কথা এই যে, পাঠ্যসূচীতে সামাজিক চাহিদা, সামাজিক সমস্যার স্থান থাকবে।

৩। পাঠ্যসূচী নির্ধারণের মৌলিক নীতি (Principles of Curriculum Construction) :

পাঠ্যসূচী নির্ধারণ শিক্ষাতত্ত্বে এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। শিক্ষাতত্ত্বে বিশেষজ্ঞরাই পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করার যোগ্য। একটি সমাজের মানব সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবন অর্থাৎ সমাজের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জীবন পাঠ্যসূচীর উপর নির্ভর করে। আমরা নিম্নে সর্বসম্মত কতকগুলি মৌলিক নীতি উল্লেখ করব। আমাদের বিশ্বাস, পাঠ্যসূচী এই নীতিগুলির উপর নির্ভরশীল হলে শিশু-শিক্ষা সার্থক ও সুন্দর হবে।

প্রথমতঃ, পাঠ্যসূচী শিক্ষা-দর্শন ও মনস্তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে। শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ভর করে শিক্ষার লক্ষ্যের ওপর। শিক্ষা-দর্শন শিক্ষার লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা করে। সুতরাং পাঠ্যসূচী শিক্ষাদর্শনের বিচার বিশ্লেষণের ওপর নির্ভরশীল হবে। একটা জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা, তার প্রগতি, নাগরিকের ব্যক্তিত্ব বিকাশ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংহতি সবকিছু পাঠ্যসূচীর মাধ্যমে

প্রতিফলিত হয়। সুতরাং পাঠ্যসূচীর বিষয়গুলি উদ্দেশ্যমুখী হবে এবং সে ব্যাপারে একমাত্র শিক্ষাদর্শনই তার সহায়ক।

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের বক্তব্য অনুযায়ী পাঠ্যসূচী চাহিদা-কেন্দ্রিক, কর্ম-কেন্দ্রিক এবং ব্যক্তি-বৈষম্য নীতির ওপর ভিত্তিশীল হওয়া চাই। শিশুই শিক্ষার প্রধান উপাত্ত (data)। সেজন্য পাঠ্যসূচী শিশুর চাহিদাকে সর্বাগ্রে স্থান দেবে। শিশুর মানসিক ও দৈহিক স্বাধীনতা পাঠ্যসূচীতে অনুপস্থিত থাকলে সে পাঠ্যসূচী শিশু-মনের ওপর উৎপীড়ন স্বরূপ। কর্মকেন্দ্রিক বা অভিজ্ঞতা কেন্দ্রিক পাঠ্যসূচীই বাস্তব শিক্ষা দিতে পারে। পাঠ্যসূচীতে বিষয় বিভাগ (subject areas) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র না হয়ে ব্যাপক (broad) হওয়া চাই। শিক্ষা যে অখণ্ড এবং শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত মৌলিক সম্পর্ক বর্তমান তার স্বীকৃতি পাঠ্যসূচীতে একান্ত প্রয়োজন। পাঠ্যসূচীতে বিষয় বিভাগ তর্কশাস্ত্র সম্মত (logical), হতে পারে কিন্তু মনোবিজ্ঞান সম্মত (psychological) নয়। সুতরাং যতদূর সম্ভব শিক্ষাদান পদ্ধতিতে ও পাঠ্যসূচী সংগঠনে অনুবন্ধ নীতি (principle of correletion) অনুসৃত হওয়া উচিত।[1]

দ্বিতীয়তঃ, পাঠ্যসূচীর একটি সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি থাকা চাই। সামাজিক এবং ব্যক্তিগত চাহিদার সমন্বয়েই গড়ে উঠবে সার্থক শিক্ষাসূচী। পাঠ্যসূচীর মধ্যে শিশু সামাজিক প্রস্তুতির উপাদান পাবে। এর অর্থ হল পাঠ্যসূচীর মধ্যে নানা সৃজনশীল কাজের অবতারণা প্রয়োজন। গঠনমূলক কাজ সামাজিক জীবনের ভিত্তিভূমি। শিশু যে সমাজে জন্মে সে সমাজেরই ভবিষ্যৎ নাগরিক সে। সুতরাং পাঠ্যসূচীর মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করার যথেষ্ট সুযোগ থাকা চাই। পাঠ্যসূচীতে শিক্ষার্থী যে শুধু দায়িত্বশীল নাগরিক হবার শিক্ষা পাবে তা নয়, কিভাবে সমাজকে প্রগতির পথে প্রধাবিত করা যায়, কিভাবে সমাজসংস্কার করা যায় তার ইংগিতও সে পাঠ্যসূচীতে লাভ করবে।

1. Subjects should be interrelated and, within each subject, the contents should so far as possible be envisaged as "bread fields" units which can be correlated better with life rather than narrow items of information.

Report of the Secondary Education Commission Page 66 (1952-53)

৭। সহপাঠ্যসূচীর বিভিন্ন রূপ (Types of Co-curricular Activities) :

সহপাঠ্যসূচীর অন্তর্গত বিষয়গুলির তালিকা এত ব্যাপক এবং বিস্তৃত যে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অনেক কিছুই বাদ পড়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। তাছাড়া, অধুনিক শিক্ষা পরিকল্পনায় নানাদেশে বিভিন্ন ধরনের পাঠ্যসূচীকে অনুসরণ করা হচ্ছে। তার পরিসংখ্যান প্রদান অসম্ভব। তবু আধুনিক ধারায় পরিচালিত বিদ্যালয়ে যে সমস্ত সহপাঠ্যসূচীকে গ্রহণ করা হয় তার সংক্ষিপ্ত একটি তালিকা আমরা আলোচনা করছি।

(ক) খেলাধুলা : মুক্ত পরিবেশে অর্থাৎ মাঠে বা গৃহের অভ্যন্তরেও খেলাধুলার ব্যবস্থা করা যায়। এই সব খেলাধুলার মাধ্যমে দেহ ও মনের চর্চা হয়। পরস্পরের মধ্যে প্রীতিবোধ ও সমাজবোধ জাগে। তাছাড়া, বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দলগতভাবে কাজ করার মনোবৃত্তি বৃদ্ধি পায়। তাই খেলাধুলা শিক্ষার অপরিহার্য অংগ।

(খ) শিক্ষামূলক সভা-সমিতি : বিদ্যালয়ে ছাত্রদের মধ্যে প্রীতিসম্মেলন, সামাজিক সম্মেলন, সাহিত্যসভা, সাংস্কৃতিক সম্মেলন, মহাপুরুষদের স্মৃতিতর্পণ সভা, ঋতু উৎসব, নৃত্যগীত, অভিনয় প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হয় এবং তাদের মনে আনন্দের সঞ্চার হয়। শ্রেণীকক্ষে পরস্পরকে জানবার বা বোঝবার যে সুযোগ শিক্ষার্থীরা পায় না, এসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সে সুযোগ তারা পায়। তাছাড়া, এসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থী তার ব্যক্তিগত স্বার্থের উপরে যাবার সুযোগ পায়, একটা কাজ সম্বন্ধে নিঃস্বার্থভাবে চিন্তা করার অবসর পায়।

(গ) সমাজ কল্যাণকর কার্যাবলী : সমাজসেবামূলক কাজ—যেমন, নিরক্ষরতা দূরীকরণে উদ্যোগী হওয়া, বিদ্যালয় পরিষ্কার রাখা, রাস্তাঘাট বাঁধা, সকলের মধ্যে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম প্রচার, মহামারী ও প্লাবনের সময় সেবা করা, বা প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান ও সম্ভাব্য সাহায্য দান প্রভৃতি নানাবিধ কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী সমাজের কথা ভাবতে শেখে, তার মনে সমাজপ্রীতি ও দেশপ্রেম জেগে ওঠে।

(ঘ) বিদ্যালয় পরিচালনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ : ছাত্ররা বিদ্যালয়ের শাসন ব্যাপারে যদি অংশ গ্রহণ করে তবে তাদের মধ্যে দায়িত্ব

বোধের ও মর্যাদা (dignity) বোধের সঞ্চার হয়। বিদ্যালয়ে দোকান খোলা, পত্র-পত্রিকা বাহির করা, সমবায় সমিতি গঠন, শৃংখলা বজায় রাখা, বিচারসভা প্রভৃতি কাজের মধ্য দিয়ে তারা বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা আহরণ করতে পারে।

অন্যান্য কার্যাবলী : সহপাঠ্যসূচীতে আরও নানাবিধ কর্মসূচী থাকে ; যেমন—ভ্রমণ, প্রদর্শনী, মেলা, বনভোজন প্রভৃতির আয়োজন।

৮। সহপাঠ্যসূচীর প্রয়োজনীয়তা (Utility of Cocurricular Syllabus) :

সহপাঠ্যসূচীকে আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বে শিক্ষার একটি অংশ বলে গণ্য করা হয়। নির্ধারিত পাঠ্যসূচীর সংগে সহপাঠ্যসূচীকে শুধু উৎসাহই দেওয়া হয় না, বিদ্যালয়ে সহপাঠ্যসূচীকে সার্থক শিক্ষার অত্যাবশ্যক বিষয় বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সহপাঠ্যসূচীর প্রয়োজনীয়তার কারণগুলির মধ্যে প্রধান কারণগুলি আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি।

জন ডিউই বলেছেন, অভিজ্ঞতা যদি সক্রিয়ভাবে গ্রহণ করা না যায় তবে শিক্ষা কখনই সার্থক হয় না। সহপাঠ্যসূচীই শিক্ষার্থীকে সক্রিয় করে তোলে। কাজের মাধ্যমে সে অভিজ্ঞতা আহরণ করে। সহপাঠ্যসূচীর সহায়তায় জীবনের সংগে শিক্ষার মিলন হয়।

সহপাঠ্যসূচীর বিষয়গুলির সহায়তায় শিক্ষার্থীর অংগ সঞ্চালন সম্ভব। মনের বিকাশের সংগে দৈহিক বিকাশসাধনও হয়। মানুষের ব্যক্তিত্ব তার দেহ-মনেরই অভিব্যক্তি। একমাত্র সহপাঠ্যসূচীর সাহায্যেই শিক্ষার্থী উভয়ের চর্চা করতে পারে। ফলে তার ব্যক্তিত্ব সংগঠিত হয়।

শিশুর বা শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভা, তার প্রক্ষোভ, আবেগ, কল্পনা প্রভৃতি সহপাঠ্যসূচীর বিষয়াবলীতে বাস্তবরূপ ধারণ করার সুযোগ পায়। এই সব কাজের মধ্যে শিশুর সংগঠনী শক্তি, প্রতিকূল অবস্থার সংগে সংগ্রামী মনোভাব জাগ্রত হয় এবং সে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করার প্রয়াস পায়। এর ফলে পরিণত বয়সে সমাজের নেতৃত্ব বহনের অধিকার সে লাভ করে।

সহপাঠ্যসূচীর কার্যাবলীর মধ্যে শিক্ষার্থী ভাবের আদান-প্রদানের, সকলের সংগে সমবেত হবার, দলবদ্ধভাবে কাজ করার সুযোগ পায়। এর ফলে

সামাজিক চেতনা এবং মূল্যবোধের সঞ্চার হয়, শিশুর চঞ্চলতা বিপথগামী হতে পারে না।

সহপাঠ্যসূচীর মাধ্যমেই শিশু বাস্তব জগতের সংস্পর্শে আসে—বৃহত্তর সমাজের সংগে পরিচিত হবার সুযোগ পায়। তার ব্যক্তিকেন্দ্রিক চাহিদা এবং অনুভূতি সামাজিক স্তরে উন্নীত হয়। ফলে জীবন ও জগতকে উপলব্ধি করার একটি সামাজিক দৃষ্টিভংগী সে লাভ করে এবং তখনই তার পক্ষে ভাবসংহতি (emotional integration) রক্ষা করা সম্ভব হয়।

তাছাড়া, সহপাঠ্যসূচী শিক্ষার্থীর জীবনে বৈচিত্র্য আনে। একঘেয়ে গতানুগতিক পাঠ্যসূচীর মধ্যে ইহা আনন্দদায়ক, আকর্ষণীয়, শিশুর শিক্ষাগ্রহণে উদ্দীপনা সঞ্চারক এবং ক্লান্তি বিদারক।

প্রশ্নাবলী

1. What are the basic principles which should guide us in Curriculum construction ?

2. What are the necessities to modify the traditional curriculum ?

3. Why are craft and creative activities forming part of school curriculum ? Indicate the educational value of knowledge correlated to natural activities of children.

4. Discuss the major trends that have found expression in the modern reformation of curriculum.

5. What do you understand by activity-based and needs centric curricula ?

6. In the early states the curriculum should be thought of in terms of activities rather than subjects. Do you agree ? Give reasons of your answer.

7. "A rationally conceived curriculum must be the resultant of these two forces : the nature of the child and the requirements of the community."—Discuss.

8. Write a short essay on Co-curricular activities.

9. Describe the utility of extra-curricular activities in School.

10. Write an essay on the place of extra-curricular activities in educational institution. Why are these activities now-a days called Co-curricular activities ?

11. Why are extra-curricular activities now generally called Co-curricular ? Cite some types of such pursuits that can be introduced in our schools.

নবম অধ্যায়

খেলা এবং খেলাভিত্তিক শিক্ষা

(Play and Playway in Education)

খেলা শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে অপরিহার্য। শিক্ষা মনোবিজ্ঞান (Educational Psychology) আজ শিশুর জীবনে খেলার গুরুত্বকে স্বীকার করে নিয়েছে। প্রাচীন ও গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় খেলার মধ্যে কোন শিক্ষা মূলক প্রভাবকে কল্পনা করা হয়নি। প্রাচীন [illegible] মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাস ছিল—খেলা শয়তানের লীলা। তাছাড়া, অভিভাবক ও পণ্ডিতরা বিশ্বাস করতেন, খেলা সময় ও শক্তির অপব্যবহার মাত্র।

কিন্তু আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষানীতিতে খেলাকে আর আপাঙ্‌ক্তেয় করে রাখা হয়নি। শিক্ষাকে যেমন মানুষের আদিম ও অকৃত্রিম আচরণ বলে গণ্য করা হয়, তেমনি খেলাকেও মানুষের আদিম ও স্বাভাবিক আচরণ বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। প্রাচীন শিক্ষানীতিতে খেলা এবং শিক্ষার মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব দেখা যেত। এ দ্বন্দ্বের মূলে ছিল খেলা এবং শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী। মনস্তত্ত্বের সম্প্রসারের ফলে মানুষের মন ও তার আচরণ সম্বন্ধে আমরা অনেক তথ্য অবগত হয়েছি। খেলাকে সেদিন উদ্দেশ্যহীন নিছক একটি অসার্থক আচরণ রূপে কল্পনা করা হত। আর শিক্ষা ছিল উদ্দেশ্য পূর্ণ, সংযত এবং সার্থক আচরণ। সুতরাং যে-শিশু শিখবে, সে খেলবে না, আর যে-শিশু খেলবে সে আর শিখবে না। এই চূড়ান্তবাদীদের মাঝামাঝি একদল বলতেন, খেলার সময় খেলা, পড়ার সময় পড়া। তাই সেদিন সকলেরই বিশ্বাস ছিল শিক্ষানীতিতে খেলার কোন স্থান নেই।

কিন্তু আধুনিক চিন্তাধারা খেলা ও শিক্ষার দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়েছে। আজ বিশ্বাস করা হয় খেলাধুলা শিশুর নানাবিধ ভাবধারা প্রকাশের একটি মাধ্যম। সুতরাং শিক্ষার সংগে খেলার সম্পর্ক অতি নিবিড়। খেলা এবং শিক্ষা পরস্পরবিরোধী নয়, একটি আর একটির সম্পূরক। ক্যাল্ডওয়েল কুক (Caldwell Cook) শিক্ষা প্রসংগে 'খেলাভিত্তিক শিক্ষা' কথাটির প্রয়োগ

করেন। 'খেলাভিত্তিক শিক্ষা' আলোচনার পূর্বে আমরা খেলা এবং কাজের পার্থক্য আলোচনা করব।

১। খেলা ও কাজ (Play and Work):

খেলার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে, খেলার তৃপ্তি খেলাতেই। খেলার বাইরে কোন উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু কাজের উদ্দেশ্য কাজের মধ্যে নিহিত নেই; কাজের একটি বহিঃমুখী উদ্দেশ্য বর্তমান। আমরা যখন কাজ করি তখন কাজের বাইরে একটা না একটা উদ্দেশ্য থাকে এবং সেই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্য আমরা কাজ করি।

খেলাধুলা সম্বন্ধে আমরা নানা ধরনের ব্যাখ্যা পেয়ে থাকি। কিন্তু একটা কথা সবাই বিশ্বাস করেন যে খেলার আনন্দেই শিশু খেলতে চায়। খেলা শিশুর শারীরিক, সামাজিক কর্মের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। খেলার মধ্যে শিশুর আপন অন্তরের স্বাধীনতা রয়েছে, কোন কর্তব্যের তাগিদ নেই। কিন্তু কাজের মধ্যে রয়েছে কর্তব্যের তাগিদ, পরিবেশের চাহিদা বা বাইরের চাপ।

কিন্তু খেলা ও কাজের এ ধরনের পার্থক্য মোটেই সংগত নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে খেলা কাজের পর্যায়ে পড়ে, আবার কাজ খেলার পর্যায়ে পড়ে। যখন জীবিকা অর্জনের জন্য কেহ খেলাকে অবলম্বন করে, তখন খেলা কাজ; আবার কাজের মধ্যে যখন মানুষ আনন্দ পায়, যখন কোন কর্তব্যকে সে আপন অন্তর দিয়ে গ্রহণ করে, তখন সেই কাজ খেলার পর্যায়ে পড়ে। পার্সি নান্ খেলা ও কাজের পার্থক্য বর্ণনা প্রসংগে খেলার একটি স্তরবিন্যাস করেছেন। এমন অনেক খেলা আছে যার একমাত্র উদ্দেশ্য সময় কাটান, আবার অনেক খেলা আছে যার উদ্দেশ্য শিক্ষামূলক, যা আমাদের দেহ-মনের বিকাশ সাধনে সহায়তা করে। আবার অনেক ধরনের খেলা আছে, যা আমরা গভীর নিষ্ঠা এবং ধৈর্য সহকারে অনুশীলন করি। তেমনি অন্তরের সংগে মিল না থাকলেও শুধুমাত্র প্রাণধারণের জন্য কতকগুলি আনন্দহীন কাজ আমরা করে যাই যার শুধু সময় বা জীবন কাটানই উদ্দেশ্য। আবার অন্য দিকে কাব্যে, শিল্পে বা নানা ধরনের আবিষ্কারের মধ্যে আমরা আনন্দ পাই। তখন কর্ম স্বতঃস্ফূর্ত হয় এবং অন্তরের তাগিদেই চলে। সে তাগিদ সৃষ্টির।

সেখানে কর্ম এবং খেলার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাছাড়া, খেলা এবং কাজ উভয়ই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হতে পারে।

হর্নী খেলা এবং কাজের মধ্যে কোন বিভেদ টানতে চান না। তিনি বলেন, খেলা এবং কাজের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক পার্থক্য ছাড়া কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে এ দুয়ের পার্থক্য হল এই : খেলা মানুষের জীবনে দীর্ঘস্থায়ী হয় না কিন্তু কাজ দীর্ঘস্থায়ী। কাজের পেছনে একটি কর্তব্যের তাগিদ আছে, খেলাকে সে ধরনের কর্তব্যের তালিকায় ফেলা যায় না। অন্যদিকে পার্সি নান্ বলেন, খেলা আসলে কাজের একঘেয়েমি নষ্ট করে, কাজের মধ্যে খেলাকে আশ্রয় করলে আমরা অফুরন্ত আনন্দ এবং স্বাধীনতা লাভ করতে পারি।

২। খেলার বিভিন্ন তত্ত্ব (Theories of Play) :

প্রাণী মাত্রেই কেন খেলে, শিশুরা কেন খেলায় প্রবৃত্ত হয়, খেলার পেছনে কি রহস্য বর্তমান, এসব প্রশ্ন মনস্তত্ত্বে প্রচুর কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার সংগে যোগ হয়েছে দর্শন প্রসূত চিন্তাধারা। ফলে খেলার ব্যাখ্যা প্রসংগে নানা মতবাদের জন্ম হয়েছে। এখন আমরা এইসব তত্ত্বগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

(ক) অতিরিক্ত শক্তি নিষ্কাশনের তত্ত্ব (Theory of Surplus Energy) : খেলা সম্বন্ধে সবচেয়ে প্রাচীনতম মত হচ্ছে খেলার মাধ্যমে প্রাণীর বাড়তি শক্তির প্রকাশ হয়। জার্মান কবি শিলার (*Schiller*) প্রথম এ মত প্রবর্তন করেন। পরবর্তী যুগে ইংরেজ দার্শনিক স্পেন্সার (*Spencer*) এ মতকে আরও জোরালো এবং যুক্তিসম্মত ভাবে সমর্থন জানান।

খাদ্য সংগ্রহে বা জীবিকা অর্জনের সমস্যা শিশুর নেই। নানা কাজের মধ্য দিয়ে তার শক্তির ক্ষয় হওয়ার কোন সুযোগ নেই। সহজেই সে তার পরিবার থেকে খাদ্য পায়, সেবা ও পুষ্টি পায়, ফলে প্রচুর শক্তি ও সামর্থ্য লাভ করে। কিন্তু তার অতি সামান্য সে ব্যয় করে তার জীবনের প্রয়োজনে। ফলে শিশুর শক্তি সঞ্চিত হতে থাকে এবং সেই সঞ্চিত শক্তির ব্যয়ের কোন প্রয়োজন হয় না। এই বাড়তি শক্তির প্রকাশ হচ্ছে খেলা।

এই মতবাদের মধ্যে কিছুটা সত্যতা থাকা সত্ত্বেও ইহা খেলার একটি নিছক শারীরবৃত্তমূলক ব্যাখ্যা মাত্র। শিশুর ইচ্ছা, অভিরুচি বা মানসিক চাহিদার কোন স্থান এ মতবাদে নেই।

শিশু যে শুধু তার বাড়তি শক্তি নিষ্কাশনের জন্য খেলায় মত্ত হয় তা নয়, অনেক সময় সে যখন ক্লান্ত বা অসুস্থ হয়ে পড়ে তখনও খেলাধুলা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে না।

তাছাড়া, খেলার মধ্যে দেহ-মনের যে বিকাশ ঘটে, ব্যক্তিত্বের স্ফূরণ হয়, খেলারও যে একটি শিক্ষামূলক রূপ আছে—এ মতবাদে তার কোন মূল্য স্বীকৃত হয়নি।

পার্সি নান্ এ মতবাদের বিরুদ্ধে বলেছেন: একটা এঞ্জিন তার উদ্বৃত্ত বাষ্পকে বার করে দেয়। কিন্তু ইঞ্জিন তার বাড়তি বাষ্পকে ব্যয় করছে নিজেকে আরও শক্তিশালী করার জন্য, এরকম আমরা কল্পনা করতে পারি না। কিন্তু খেলার মধ্য দিয়ে শিশু নিজের দেহ-মনকে আরও শক্তিশালী করে তুলছে। সুতরাং খেলা সম্বন্ধে এ ধরনের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা আমরা গ্রহণ করতে পারি না।

(খ) পুনরাবৃত্তিবাদ (Theory of Recapitulation): এ মতের প্রধান প্রবক্তা হলেন স্ট্যানলি হল *(Stanley Hall)*। তাঁর মতে খেলার রহস্য মানুষের ক্রমবিকাশের অতীত পর্যায়ে নিহিত। খেলাধুলার মধ্য দিয়ে শিশু তার পূর্বপুরুষদের কর্মেরই পুনরাবৃত্তি করে। শিশু তার মানস প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির মধ্যে তার অতীত কালের মানুষের ইতিহাসের স্বাক্ষর বহন করে।

স্ট্যান্‌লি হল মানব শিশুর বিভিন্ন স্তরের এবং বিভিন্ন ধরনের খেলা পর্যবেক্ষণ করে বলছেন, মানব জাতির একটি ক্রমবিকাশের সাক্ষ্য বহন করে শিশুর খেলা।

হল তাঁর *'Adolescence'* বইতে বলেন, 'যৌবনের আনন্দময় হৃদয় যে ভাবে খেলার মধ্যে নিজেকে উৎসারিত করে, এমনটি আর কিছুতেই নয়, যেন মানুষ এর মধ্যে তার হৃত স্বর্গকে ফিরে পায়।

শিশুর খেলার মধ্যে মানব ইতিহাসের বিভিন্ন ক্রমেরই পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। প্রাচীন মানব ছিল অসভ্য, নগ্ন, যাযাবর এবং মায়ামমতাহীন।

খেলাধুলার মধ্যে মানুষের এ আদিম মনোভাবের পুনরাবৃত্তি আমরা দেখি। তারপর মানুষের জীবনে এল সমাজচেতনা বোধ। খেলাধুলার মধ্যেও তা আমরা লক্ষ্য করি। এল যুদ্ধ কলহের যুগ। শিশুরা তাই তীর-ধনুক, ঢাল তলোয়ার নিয়ে খেলা করে। মানব সভ্যতার বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে শিশুর খেলার একটা বাস্তব সম্পর্ক আছে।

এক কথায় স্ট্যান্‌লি হল শিশুর জীবনের বিকাশের সংগে আদিম মানুষের জীবনের বিকাশের একটি ক্রমিক ধারা লক্ষ্য করেছেন। আর বলেছেন, শিশু খেলার মধ্য দিয়ে ক্রমে ক্রমে নিজেকে সামাজিক কর্মে নিয়োজিত করে।

কিন্তু এ মতবাদকে ম্যাক্‌ডুগাল (*McDougall*), রস্ (*Ross*) প্রভৃতি দার্শনিকগণ তীব্র সমালোচনা করেছেন। শিশুর ব্যক্তিগত খেলাধুলার মধ্যে মানবজাতির সমষ্টিগত আচরণকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। খেলাধুলার মধ্যে শিশু শুধু তার আদিম বংশধারাকে যে অনুসরণ করে তা নয়, তার নিজেরও স্বাধীন ইচ্ছা আছে যার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ খেলার মধ্যে ঘটে। তাছাড়া, শিশু শুধু তার বংশধারার নিয়ন্ত্রণেই কাজ করে না, তার জীবনে তার পরিবেশও প্রভাব ফেলে।

(গ) ভবিষ্যৎ প্রস্তুতির তত্ত্ব (Theory of future Preparation): শিক্ষা-তত্ত্বে খেলা সম্বন্ধে সবচেয়ে প্রভাবশালী মতবাদ হল, খেলা ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতির প্রয়াস মাত্র। সর্বপ্রথম মেলব্রানস্ (*Malebranche*) শিশুর খেলার মধ্যে তার জীবনের প্রস্তুতির ইংগিত লক্ষ্য করেন। বর্তমান কালে কার্ল গ্রুস (*Karl Gross*) তাঁর দু'খানা বিখ্যাত বইতে (*The Play of Animals* এবং *The Play of Man*) শিশুর খেলার সম্বন্ধে আলোচনা করে বলেছেন, খেলা হচ্ছে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি।

গ্রুস বিভিন্ন ধরনের প্রাণীর আচরণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন, নিম্নতর ইতর প্রাণীরা জন্মের পর থেকেই পরিণত ইন্দ্রিয় লাভ করে। তারা আহার অন্বেষণ এবং জীবন সংগ্রামে যথেষ্ট উপযুক্ত। প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতা এবং সহজাত প্রবৃত্তি তাদের জীবনের পথ প্রদর্শন করে। তারা অসহায় হয়ে পৃথিবীতে আসে না। কিন্তু স্তন্যপায়ী, মেরুদণ্ডী উচ্চস্তরের জীব অসহায় হয়েই জন্মে, মানব শিশুর সম্বন্ধে তো কথাই নেই। তাদের ইন্দ্রিয় থাকে অপরিণত, জীবন সংগ্রামে তারা অসমর্থ এবং অনুপযুক্ত। তাই শৈশবকালে এসব প্রাণীরা কয়বেশী

বার্ট্রও রাসেল (*Bertrand Russell*) ফ্রয়েডপন্থী মনঃসমীক্ষণবাদীদের মতকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছেন। তাঁর মতে খেলার মূলে কোন অবদমিত কাম বা কামনা নেই। খেলার মূলে রয়েছে শিশুর বড় হওয়ার আকাঙ্ক্ষা বা ক্ষমতা লাভের স্পৃহা।

(ঙ) জীবন সক্রিয়তার তত্ত্ব (The Theory of Life Activity): খেলার আর একটি উল্লেখযোগ্য তত্ত্ব হল খেলা জীবনের সক্রিয়তার নামান্তর। এ মতের প্রবক্তা হলেন জন ডিউই। ডিউই বলেন, জীবনের অস্তিত্ব মানেই সক্রিয়তা। জীবন এবং সক্রিয়তা সমার্থক। প্রতিটি প্রাণীকেই কর্মের মাধ্যমে বাঁচতে হয়।

শিশুর খেলা হচ্ছে তার জীবনের একটি সক্রিয়তা মাত্র। শিশুর নিকট কর্ম মানেই খেলা। মানুষের কর্মকে দুভাগে ভাগ করা যায়—এক ধরনের কর্ম উদ্দেশ্যহীন, আর এক ধরনের কর্ম উদ্দেশ্যপ্রসূত। শিশুর কর্ম উদ্দেশ্যহীন —সে কর্ম হচ্ছে খেলা। উহা তার জীবনের প্রধান সক্রিয়তা। পরিণত বয়সে শিশু উদ্দেশ্যহীন এবং উদ্দেশ্যদর্শী—এ দুভাবেই কাজ করে। কিন্তু শিশুর কর্ম সতত উদ্দেশ্যহীন।

ফ্রয়েবেল ডিউই-র মত সমর্থন করেন। তাঁর কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে তিনি খেলাকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন। শিশুর কর্মচঞ্চলতা খেলার মাধ্যমেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হয়। খেলা হচ্ছে শিশুর আত্ম সক্রিয়তা।

এই মতবাদ সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু খেলা শুধু উদ্দেশ্য-হীন সক্রিয়তা নয়, খেলাও সময় সময় সুসংযত, সুশৃংখল এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। তাছাড়া, খেলার পেছনে শিশুর কল্পনা, অবদমিত কামনার তৃপ্তিও বর্তমান।

(চ) প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মনোভাব তত্ত্ব (The Theory of Rivalry): এ তত্ত্ব অনুসারে খেলার মাধ্যমে শিশুর প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মনোভাব প্রকাশিত হয়। প্রতিটি শিশুর জীবনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বা প্রতিযোগিতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা বর্তমান। খেলাধূলায় প্রবৃত্ত হয়ে শিশু এ মনোভাবের পরিচয় দেয়। এ মতের প্রধান সমর্থক হলেন ম্যাক্‌ডুগাল।

এ কথা অনেকাংশে সত্য যে খেলার মধ্যে শিশুর প্রতিযোগিতার মনোভাব বর্তমান, কিন্তু ইহা খেলা সম্বন্ধে চূড়ান্ত বক্তব্য নয়—ইহা খেলা সম্বন্ধে সংকীর্ণ ব্যাখ্যা মাত্র।

(ছ) বিশ্রাম তত্ত্ব (The Theory of Relaxation): এ মতবাদ অনুসারে খেলার মধ্যে মানুষ কর্মের ক্লান্তি অপনোদন করে। কাজের একঘেয়েমি যখন মানুষকে পরিশ্রান্ত করে তোলে তখন মানুষ কর্মের পরিবর্তন চায়, বিশ্রাম চায়। খেলার মাধ্যমেই কাজের পরিবর্তন এবং বিশ্রাম লাভ সম্ভব। ইহাই খেলার সার্থকতা। ল্যাজারাস (*Lazarus*) এ তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা।

এ মতবাদটিও সংকীর্ণ এবং একদেশিতা দোষে দুষ্ট।

৩। খেলাভিত্তিক শিক্ষা (Playway in Education):

প্রাচীন ও গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় খেলা আর শিক্ষার মধ্যে একটি অহি-নকুল সম্বন্ধ ছিল। সে শিক্ষা ছিল শিক্ষক-কেন্দ্রিক, শিক্ষকের শাসন ও শাস্তির ভয়েই শিশু শিক্ষায় মনোযোগী হত। কিন্তু আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ দেখিয়েছেন যে, শিশুর খেলা নিছক সময় ও শক্তির অপব্যবহার নয়, খেলাই শিশুর নিকট একটি পরম কাজ। তাই শিক্ষকের দৃষ্টিতে খেলা একটি নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে। আজ নব্য শিক্ষাতত্ত্বে চাহিদা-কেন্দ্রিক, কর্মকেন্দ্রিক, জীবন-কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় খেলাকে আর অপাংক্তেয় করে রাখা হয়নি বরং শিশুর শিক্ষাক্ষেত্রে খেলা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। শিশুর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, রুচিবোধ এবং স্বতঃস্ফূর্ত আচরণকে শিক্ষায় মেনে নিলে খেলাও শিক্ষার একটি প্রধান সহায়ক এবং অপরিহার্য ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়। খেলা ভিত্তিক শিক্ষার ইহাই মর্মকথা।

খেলা ভিত্তিক শিক্ষার তাৎপর্য অনুধাবন করতে গেলে খেলার বৈশিষ্ট্য বা স্বরূপ আলোচনা প্রয়োজন। খেলা সম্বন্ধে দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বগুলি আলোচনা করলে বোঝা যায়, খেলার মধ্যে মানুষের বৈচিত্র্যময় আচরণ প্রকাশিত হয়। কোন একটি বিশেষ তত্ত্ব আলোচনা করে খেলার স্বরূপ ব্যাখ্যা করা যায় না। এক্ষণে আমরা খেলার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করব।

৪। খেলার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Play):

(ক) খেলা শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ। শিশুর খেলা শুধু খেলা নয়, এ তার জীবন ধর্ম। তার উদ্‌বৃত্ত শক্তি বা দেহের চাহিদা যে এতে নেই তা বলা

চলে না। তবে শিশু যে খেলে তা তার আপন অন্তরের তাগিদেই খেলে, ইহা তার স্বভাব। কোন বিশেষ কিছু লাভ করার জন্য উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে সে এই আচরণ করে না।

(খ) খেলার মধ্যে শিশু যে আচরণ করে তার মধ্যে সময় সময় তার পূর্ববর্তী মানুষের কর্মপ্রবাহের অনেক ছাপ থাকে, সময় সময় তার ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতির আভাসও মেলে।

(গ) খেলার মধ্যে শিশু কল্পনাবিলাসী, সৃজনশীলরূপে দেখা দেয়। শিশু খেলার সময় যা ভাংগে বা গড়ে তার মূল্য পরিণত বুদ্ধির মানুষের কাছে না থাকলেও শিশুর জীবনে এগুলি গুরুত্বপূর্ণ।

(ঘ) খেলার মধ্যে শিশুর অনেক অবদমিত কামনা-বাসনার পরিতৃপ্তি ঘটে। ফলে শিশুর মানসিক জীবনে ভারসাম্য বজায় থাকে। শিশু তার অনেক ইচ্ছা, অনেক আবেগের প্রকাশ পথ খুঁজে পায় না। এগুলি তার মনের মধ্যে সঞ্চিত থাকে। খেলার মাধ্যমেই এ সব অবদমিত কামনার সামাজিক প্রকাশ ঘটে।

(ঙ) খেলাই শিশুর সক্রিয় জীবন। খেলার মাধ্যমেই শিশু অভিজ্ঞতা আহরণ করে এবং জীবনের সংগে পরিচিত হয়।

(চ) খেলার মাধ্যমে শিশু তার জীবনকে বৈচিত্র্যময় করে তোলে, তার কাজের একঘেয়েমি এবং ক্লান্তির নিরসণ করে।

(ছ) খেলার মধ্যে শিশুর প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব ব্যক্ত হয়, তার ব্যক্তিত্ববোধ জাগে, আত্মপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়।

(জ) খেলার মধ্যে শিশুর দেহ-মনের চর্চা হয়। খেলার মধ্যে শিশুর অংগ-প্রত্যংগের সঞ্চালনই শুধু হয় না, বুদ্ধির ব্যায়ামও হয়। তাছাড়া, খেলার মধ্যে শিশু জ্ঞান ও কৌশল অর্জন করে।

(ঝ) খেলার মধ্যে শিশু যে সংযত আচরণ ও শৃংখলার পরিচয় দেয় তা তার অন্তর থেকে উৎসারিত। নিষ্ঠাবোধ, সততাবোধ এবং সামাজিকতা বোধ খেলার মাধ্যমেই শিশুর জীবনে বিকশিত হয়।

(ঞ) শিশুর খেলাই পরিণত জীবনের কাজে রূপান্তরিত হয়। কাজের আনন্দই খেলা।

৩। খেলাভিত্তিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Playway in Education) :

খেলাভিত্তিক শিক্ষা কোন আলাদা শিক্ষানীতি নয়। যে কোন শিক্ষা-ধারায় খেলার বৈশিষ্ট্যগুলিকে স্বীকার করে নিয়ে শিক্ষায় খেলার নীতি গ্রহণই খেলাভিত্তিক শিক্ষা। কল্ডওয়েল কুক-ই সর্বপ্রথম 'খেলাভিত্তিক শিক্ষা'-শুই কথাটি প্রচার করেন।

শিক্ষায় খেলাধূলার গুরুত্ব উল্লেখ করে ফ্রয়েবেল বলেন : 'খেলাধূলার ভেতরে শিশু যে গভীর আনন্দলাভ করে, তা শিশুকে পরিবর্ধনে সহায়তা করে। কুঁড়ি থেকে যেভাবে ক্রমশঃ ফুল ফোটে, ঠিক তেমনি খেলাধূলার মধ্য দিয়ে শিশু-প্রকৃত মনুষ্যোচিত গুণের অধিকারী হয়।'

খেলার কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই, তা বলে খেলা অর্থহীন নয়। শিশু যখন খেলে তখন তার পেছনে থাকে তার নিজস্ব আবেগ, নিজস্ব আগ্রহ। সুতরাং শিক্ষাকে যদি আমরা আগ্রহভিত্তিক করে তুলতে পারি তবে শিশু স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার শিক্ষাকে গ্রহণ করবে। শাস্তি, ভয়, পুরস্কার প্রভৃতি কৃত্রিম পন্থা গ্রহণ করে শিক্ষাকেও আমরা কৃত্রিম করে তুলেছি। বিদ্যালয়ে কড়া পাহারা দিয়ে শিশুর আগ্রহহীন, অনিচ্ছুক, কৌতূহলহীন মনের উপরে আমরা যে বিদ্যার বোঝা চাপিয়ে দিই তার সংগে শিশুর অন্তরের কোন যোগ থাকে না। খেলাভিত্তিক শিক্ষার কথা হল, শিক্ষার বিষয়বস্তুর প্রতি যেন শিশুর আগ্রহ থাকে, গভীর কৌতূহল থাকে।

অনেকে ভাবতে পারেন খেলাভিত্তিক শিক্ষার প্রধান বক্তব্য হচ্ছে বিদ্যালয়ে খেলাধূলার প্রচুর আয়োজন করা। কিন্তু আসলে তা নয়। খেলাভিত্তিক শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য এবং বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শিশু যেভাবে আপন আগ্রহে খেলাধূলার প্রতি আকৃষ্ট হয় ঠিক সেভাবে শিক্ষায়, পাঠ প্রস্তুতিতে আপন তাগিদেই সে ব্রতী হবে। খেলার মত শিক্ষাকেও স্বতঃস্ফূর্ত করে তোলা হ'ল খেলাভিত্তিক শিক্ষা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, খেলা যে ভাবে শিশুর নিকট আকর্ষণীয়, শিক্ষার বিষয়বস্তুরও সেভাবে আকর্ষণীয় হওয়া চাই। বিদ্যালয়েই শিশুর গৃহের পরিবেশ সৃষ্টি করা চাই।

খেলা উদ্দেশ্যহীন হলেও খেলার পেছনে আমরা উদ্দেশ্য আরোপিত করতে

পারি। শিশুকে শৃংখলাবোধ, সামাজিক চেতনা, নীতিবোধ প্রভৃতি খেলার মাধ্যমে আমরা শিক্ষা দিতে পারি।

শিশু যখন খেলে তখন তার মধ্যে তার চাহিদা এবং আগ্রহই শুধু থাকে না, তার মধ্যে পরিলক্ষিত হয় তার গ্রহণ-ক্ষমতা। খেলাভিত্তিক শিক্ষার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য হল, শিশুর চাহিদা, আগ্রহ এবং গ্রহণ-ক্ষমতাই শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করবে। এক কথায় খেলাভিত্তিক শিক্ষা শিশুর স্বাধীনতাকেই সর্বাগ্রে স্থান দিতে চায়। আধুনিক শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষানীতি খেলাভিত্তিক শিক্ষাকে বস্তুগত ভাবে এবং নীতিগত ভাবে গ্রহণ করেছে।

খেলাভিত্তিক শিক্ষার আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, শিক্ষাকে বৈচিত্র্যময় করে তোলা। শিক্ষাব্যবস্থায় যেমন থাকবে নির্ধারিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত পাঠ্যসূচী, তেমনি থাকবে সহপাঠ্যসূচীর বিষয়াবলী। তাহলেই শিক্ষাকে জীবনের বিচিত্র ধারায় শিশু গ্রহণ করবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

ডাল্টন পরিকল্পনায় শিক্ষাক্ষেত্রে খেলা এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে মূল কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে খেলা আজ অবসর বিনোদনের একটা উপায় মাত্র নয়, খেলাকে আজ বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যমুখীন করা হচ্ছে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের পথে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

আমাদের দেশে খেলাভিত্তিক শিক্ষার গুরুত্বকে এখনও পূর্ণাঙ্গ ভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। ইউরোপ বিশেষভাবে আমেরিকায় শিক্ষাক্ষেত্রে খেলার গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে এবং বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষে খেলার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা চলছে। নিত্যনতুন বিভিন্ন ধরনের খেলার উদ্ভাবন হচ্ছে এবং শিক্ষক এগুলির মাধ্যমে শিশুকে তার বিদ্যালয় জীবনে শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তুলবার চেষ্টা করছেন।

প্রশ্নাবলী

1. Write short notes on playway in education.
2. Describe critically the different theories of play.
3. What do you mean by playway in education? Illustrate your answer with example.
4. What do you mean by 'work' and 'play'? How are they distinguished from each other?

দশম অধ্যায়

স্বাধীনতা ও শৃংখলা

(Freedom & Discipline)

১। স্বাধীনতা ও শৃংখলার সমস্যা (Problem of freedom and discipline) :

শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর স্বাধীনতাকেই সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া হয়েছে। শিশুর চাহিদা, আগ্রহ, অভিরুচি শিক্ষার বিষয়বস্তু নিয়ন্ত্রণ করবে। সুতরাং শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের পথে যা অন্তরায় সৃষ্টি করে, শিক্ষাক্ষেত্রে, তা বাদ দেওয়া উচিত। শিশুর স্বাধীনতাকে অস্বীকার করলে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশ সম্ভব নয়।

অন্যদিকে ছাত্রদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা, বিদ্যালয় জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা, সামাজিক আচরণে নিষ্ঠা, বাধ্যতা, বিধি ও নিষেধ মানার মনোভাব ইত্যাদি না থাকলে আদর্শ জীবন গঠন ও শিক্ষা সম্ভব নয়। এ সব নিয়ম এবং মনোভাব শিক্ষার্থীর মনে উদ্রেক করা চাই। তাই অভিভাবক এবং শিক্ষক এ সব শিশু-মনের উপর আরোপ করেন। কাজেই শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুর স্বাধীনতার সংগে সংগে তার শৃংখলাবোধের প্রয়োজনও এসে পড়ে। অথচ শৃংখলা স্বাধীনতাকে সীমায়িত করে। সুতরাং শিক্ষার্থীর স্বাধীনতার সংগে শৃংখলার বিরোধ আছে বলে মনে হয়। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর স্বাধীনতাই যখন প্রধান, তখন শৃংখলার স্থান কোথায় ? ইহাই শৃংখলা ও স্বাধীনতার সমস্যা।

এ সমস্যা সমাধানের আগে শিক্ষায় স্বাধীনতা ও শৃংখলার স্থান আলোচনা করা উচিত। স্বাধীনতা ও শৃংখলার অর্থ অনুধাবন করলে এ সমস্যা নিরসণ আমাদের পক্ষে সহজ হবে।

২। শিক্ষায় স্বাধীনতার স্থান (Place of freedom in education) :

রবীন্দ্রনাথ আমাদের বিদ্যালয় সম্বন্ধে মন্তব্য করে বলেছেন : 'ইস্কুল বলিতে আমরা যা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাষ্টার এই কলের

অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাষ্টারেরও মুখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাষ্টার-কলও তখন মুখ বন্ধ করেন, ছাত্ররা 'দুই চার পাতা কলে ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ী ফেরে।'

এই কয়েকটি ছাত্র গতানুগতিক শিক্ষক-কেন্দ্রিক যান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার মর্মান্তিক ছবিটি রবীন্দ্রনাথ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

শিক্ষায় শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ, তার স্বাধীনতার মূল্য গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় মোটেই গুরুত্ব পায়নি। প্রাচীনপন্থীরা শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুর স্বাধীনতা নিয়ে কোন আলোচনা করেননি। তাদের অভিরুচি অনুযায়ী ধর্ম ও সমাজের নাম নিয়ে একটি পাঠ্যতালিকা প্রস্তুত করে শিশুর উপর চাপিয়ে দিতেন। এতে শিশুর আগ্রহ বা চাহিদা আছে কিনা, শিশুর আত্মপ্রতিষ্ঠা বা ব্যক্তিত্ব প্রকাশের পক্ষে তা সহায়ক কিনা—এসব চিন্তাধারা সেদিন ছিল অনুপস্থিত।

প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থী ছিল গৌণ, ইচ্ছামত তাকে গড়ে-পিটে তোলাই ছিল শিক্ষকের কাজ। কঠোর শাসন ও নিয়ন্ত্রণে এনে শিক্ষক শিশুর জীবনে তাদের নির্বাচিত আদর্শের প্রতিফলন কামনা করতেন। শিক্ষার্থী যেন যন্ত্র, শিক্ষকের অভিলাষ পূর্ণ করার উপায় মাত্র। সেদিনকার শিক্ষা ছিল পরাধীনতার শিক্ষা। শিশুর জীবন ছিল বয়স্কদের ও অভিভাবকদের দ্বারা নির্ধারিত আদর্শ সৃষ্টি করার উপকরণ মাত্র।

পাশ্চাত্ত্যদেশে এ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার মূলে যে মতবাদটি কাজ করছিল সে হচ্ছে প্রথম পাপের (original sin) মতবাদ। আদম এবং ইভের পাপ থেকেই আমাদের জন্ম। প্রত্যেক শিশুই পাপী। সুতরাং স্বভাবতই সে অসভ্য এবং শয়তান। তাকে শাস্তি দিয়ে, কঠোর শাসনে রেখে পাপমুক্ত করাই হবে শিক্ষার উদ্দেশ্য। শিক্ষা হল পাপস্খালন।

মানব-শিশুর জন্ম পাপের পরিণাম; এ ধরনের কোন বিশ্বাস আমাদের দেশে নেই। তবুও শিশুর জীবনে ছিল কঠোর শাসন ও নিয়ন্ত্রণ। আসল কথা শিশু মনস্তত্ত্বের কোন চর্চা সেদিন ছিল না। বয়স্করা শিশু-মনকে তাদের মন থেকে আলাদা করে ভাবতেন না। শিশু-মনের স্বতন্ত্র সত্তা যেমন ছিল অনাদৃত, তেমনি ছিল শিশু-স্বাধীনতা অবহেলিত। আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাবিদ্গণ শিশুর স্বাধীনতাকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। শিশুর চাহিদা,

আশা, আকাঙ্ক্ষা, আবেগ, আগ্রহ, অভিলাষ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করেই শিক্ষানীতি নির্ধারিত হবে—এই-ই শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা। শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার গোড়ার কথাই হল, শিশুর স্বাধীনতা শিক্ষাব্যবস্থায় সর্বাগ্রে স্থান দিতে হবে।

শিক্ষায় শিশুর স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তাকে প্রধানতঃ মনস্তাত্ত্বিক, দার্শনিক এবং সমাজতাত্ত্বিক—এই তিনটি দিক থেকে অনুধাবন করা হয়েছে।

মনস্তাত্ত্বিক দিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশু মনস্তত্ত্ব বিশ্বাস করে যে, শিশু-মন বলে আলাদা একটি মনের অস্তিত্ব সম্ভব। পরিণত বয়সের মানুষের মানসিক আচরণ দিয়ে শিশু-মনের ব্যাখ্যা করা যায় না। শিশুর মনে তার নিজস্ব আচরণ, চাহিদা, কল্পনা ইত্যাদি বর্তমান। এসব আচরণ বয়স্কদের চোখে অর্থহীন হতে পারে কিন্তু শিশুর জীবন এ সব আচরণের মধ্যেই বর্ধিত হয়, তার সকল সহজাত সম্ভাবনার বিকাশ সম্ভব হয়। এগুলি নিয়েই শিশুর আপন জগৎ। আধুনিক শিশু মনস্তত্ত্ব দেখিয়েছে যে শিশুর আচরণের ও তার সহাজাত সম্ভাবনার স্বাভাবিক বিকাশ সাধন প্রয়োজন। শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত আচরণে যদি প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হয়, তবে শিশুর ব্যক্তিত্ব সংগঠিত হয় না। মানসিক দিক থেকে শিশু থাকে অভুক্ত, ফলে সে এক অসম্পূর্ণ এবং অসুস্থ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়। সুতরাং শিশু মনস্তত্ত্ব শিশু-স্বাধীনতার পক্ষপাতী। শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুর স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত আচরণের স্থান দেওয়াই শিশু-স্বাধীনতার মূলকথা।

আরেকটি ভাবধারার আন্দোলন এসে মনস্তাত্ত্বিক বক্তব্যকে জোরালো করেছে। সে ভাবধারা দর্শনপ্রসূত। পাশ্চাত্যদেশের ভাববাদী দার্শনিক এবং শিক্ষাবিদ্ ফ্রয়েবেল, পেস্টালৎসী, মন্টেসরী এবং আমাদের দেশের রবীন্দ্রনাথ মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি বিশ্বাস করেন, প্রতিটি মানব সন্তান আপন ব্যক্তিত্ব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। প্রতিটি শিশুর মধ্যে সুপ্ত হয়ে রয়েছে তার আপন অনন্য সত্তা। শিক্ষক সে সত্তার বিকাশ সাধনে সহায়ক মাত্র। প্রতিটি শিশু গতি-চঞ্চল প্রাণধর্ম নিয়ে জন্মে। নানা কর্মবৃত্তির মাধ্যমে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। তাই শিশুর আচরণের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করলে শিশুর ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়। খেলাভিত্তিক শিক্ষার মূল বক্তব্য শিশুর এই কর্মবৃত্তির এবং আচরণের স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। কতকগুলি

পুস্তকপাঠে শিশুর শিক্ষা সীমাবদ্ধ রাখলে শিক্ষা ব্যর্থ হতে বাধ্য। নানা কর্মবৃত্তি, নানা আচরণ এবং সক্রিয়তার মধ্যে শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধন করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। সুতরাং শিশুর আত্ম-সক্রিয়তাকে স্বীকার করা চাই। এজন্য শিশু-স্বাধীনতা শিক্ষা তথা শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার মূল ভিত্তি।

সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে আর একটি আন্দোলন এসে শিশু স্বাধীনতাকে শিক্ষাক্ষেত্রে অপরিহার্য বলে ঘোষণা করেছে। শিশুর স্বাভাবিক আচরণে যদি প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হয়, তার সহজাত প্রবৃত্তি এবং কর্মবৃত্তির যদি মুক্ত বিকাশ অস্বীকৃত হয়, তবে তার ব্যক্তিত্ব সমাজমণ্ডিত হয়ে উঠবে না। একটা অসম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব নিয়ে শিশু বর্ধিত হবে বটে, কিন্তু নিজের চাহিদার পূর্ণ পরিতৃপ্তির পথ যে-শিশু খুঁজে পেল না, তার জীবনে সামাজিক চাহিদারও কোন মূল্য নেই। ফলে আত্মসক্রিয়তার অভাবে শিশুর যেমন আত্ম-চেতনা জাগে না, তেমনি সমাজ-চেতনাও থাকে সুপ্ত। সমাজতত্ত্বে এ ধরনের শিশুকে বলা হয় অসমঞ্জস (Maladjusted)। শিশু-মনের ভাবের অবদমনের ফলেই এক ধরনের বিক্ষোভ সৃষ্টি হয় এবং শিশু কালক্রমে অসামাজিক হয়ে পড়ে। সুতরাং শিশুশিক্ষায় শিশু-মনের স্বাধীনতাকে সর্বাগ্রে স্থান দিতে হবে।

কিন্তু নব্য শিক্ষাতত্ত্বে গতানুগতিক অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার কোন স্থান নেই। প্রাচীনকালে শিশু-মনস্তত্ত্বে আমাদের কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। তাই 'গাধা পিটিয়ে মানুষ তৈরী করার' স্বপ্ন সেদিন আমরা দেখেছি। শিশু যেন কাদামাটি, আর ইচ্ছামত তাকে গড়ে তোলা যায়, এ কল্পনা করে আসা হয়েছে। বিজ্ঞান মানুষকে আজ যথেষ্ট বিনয়ী করেছে। আজ আমরা জেনেছি, কেউ কাউকে কিছুই শিক্ষা দিতে পারে না। শিক্ষক সহায়ক মাত্র, তিনি শিশুর জীবনে কিছুই সৃষ্টি করতে পারেন না।

[illegible]। কোন কোন চিন্তানায়ক শিক্ষায় শিশু-স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টট্‌ল, রোমান শিক্ষাবিদ্ কুইন্টিলিয়ান, ব্রিটিশ দার্শনিক কমেনিয়াস প্রভৃতি শিক্ষায় শিশুর স্বাধীনতাকে স্থান দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁদের বক্তব্য কোনদিন অনুসৃত হয়নি।

আধুনিক যুগে যিনি সর্বপ্রথম শিশু-স্বাধীনতার প্রয়োজন বিশ্বে প্রচার করেছেন এবং শিশু-মুক্তির জন্য আন্দোলন করেছেন তিনি হলেন ফরাসী

দার্শনিক রুশো। বিংশ শতাব্দীকে যদি শিশুর নবজাগরণের যুগ বলে অভিহিত করি, তবে রুশো হলেন সেই যুগের উদ্‌গাতা। তাঁর 'এমিল' বইতে শিশু এমিলকে তিনি সকল সামাজিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করতে চেয়েছেন। তার স্বাধীনতাকেই শিক্ষা পরিকল্পনায় সর্বাগ্রে স্থান দিতে চেয়েছেন। রুশো 'প্রথম পাপের' মতবাদকে উপেক্ষা করে বলেছেন, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এবং বয়স্কদের আরোপিত নিয়মশৃংখলাই শিশুকে কলুষিত করে। অতএব শিশুকে সকল প্রকার নিয়ম-বন্ধন ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি দিতে হবে।

৩। শিক্ষায় শৃংখলার স্থান (Place of discipline in education) :

সাধারণ আভিধানিক অর্থে 'শৃংখলা' বলতে আমরা বুঝি আমাদের ভাবনা, চিন্তা, আবেগ, আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতিকে অধীনস্থ বা সংযত করা এবং বাধা-নিষেধের গণ্ডি মেনে নির্ধারিত কাজকে সুসম্পন্ন করা। বিদ্যালয়ে বা শিক্ষায় 'শৃংখলা' বলতে আমরা বুঝি শাস্তি ও পুরস্কারের দ্বারা শিক্ষার্থীর আচরণের নিয়ন্ত্রণ। বিদ্যালয়ের 'শৃংখলা' শিক্ষা-দানে সহায়ক। শিশুর স্বাধীনতা যেমন শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সার্থক করে, তেমনি তার 'শৃংখলা' শিক্ষার পদ্ধতিকে সার্থক করে তোলে। শিক্ষার্থী যাতে শিক্ষায় মনোযোগী হয়, বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান কার্যাবলী যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়, শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানসিক আচরণ যাতে কল্যাণকর হয়—এজন্য বিদ্যালয়ের নিজস্ব কতকগুলি নিয়ম, রীতিনীতি বা শৃংখলা থাকে এবং শিক্ষার্থীকে সর্বদা তা পালন করতে হয়। এক কথায় শৃংখলা বলতে বোঝায় এমন কতকগুলি পরিবেশ সৃষ্টি করা, যাতে শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণ এবং বিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিচালন সম্ভব ও সার্থক হয়।

এক্ষণে 'শৃংখলা' শব্দের ব্যাখ্যা অনুধাবন করলে একথা অতি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এ শৃংখলা শিশুর উপর আরোপিত হয়। শিক্ষার্থী পাঠে মনোযোগী হবে, শিক্ষকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে, বিদ্যালয়ের নিয়মকানুন, রীতিনীতি, বিধি-নিষেধ মেনে চলবে। তার আচরণে এসবের কোন ব্যতিক্রম ঘটলে সে শাস্তি পাবে, ব্যতিক্রম না ঘটলে পাবে পুরস্কার। এ 'শৃংখলা' পালনের পেছনে শিশু বা শিক্ষার্থীর অন্তরের কোন তাগিদ থাক বা না থাক, আমরা শিক্ষার্থীর আচরণে এগুলি আশা করি এবং তার নিয়মানুগত্যের

জন্য সব সময় প্রশংসা করি। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে আমরা বুঝতে পারব, এ ধরনের শৃংখলা শিশু-মনের উপর আরোপিত করার ফলে শিশুর স্বাধীনতাকে উহা সীমায়িত করে। উহা বহির্জাত শৃংখলা (external discipline)। পিতামাতা, অভিভাবক, শিক্ষক বা বিদ্যালয় এ শৃংখলা কৃত্রিমভাবে শিশুর উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। শিশুর স্বাধীনতার সংগে এই বহির্জাত শৃংখলার তাই বিরোধ বাধে।

কিন্তু নব্য শিক্ষাতত্ত্বে বহির্জাত বা আরোপিত শৃংখলাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। শিক্ষার্থী বিধি-নিষেধ বা নিয়মকানুনের প্রতি অনুগত থাকবে, কিন্তু তা শাস্তির ভয়ে নয় বা পুরস্কারের লোভে নয়। শিক্ষার্থী স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে শৃংখলা মেনে চলবে তার শিক্ষাকে সার্থক করার জন্য। শিক্ষার সংগে শিক্ষার্থীর যে অন্তরের যোগ থাকবে, সেই অন্তরের যোগ থাকবে শৃংখলার সংগেও। এ শৃংখলা কোন বাইরের নির্দেশ (order) মেনে চলা নয়, এ হবে আত্মশাসন। কোন কর্মকে সুসম্পন্ন করার জন্য বা শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সার্থক করার জন্য শিক্ষার্থী যখন আপন অন্তরের তাগিদে পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় নিয়মকানুন মেনে চলবে তখনই সে শৃংখলা হবে সত্যিকার শৃংখলা। এ শৃংখলাকে বলা হয় অন্তর্জাত শৃংখলা (internal discipline)। পুরস্কারের প্রলোভনে অথবা ভয়াতুর চিত্তে শিশু যে নিয়মকে অনুসরণ করে সে নিয়ম শৃংখলা নয়, শৃংখল মাত্র। এই অন্তর্জাত শৃংখলাকে আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বে অনেক সময় মুক্ত-শৃংখলা (Free discipline) বলা হয়।

৪। স্বাধীনতা ও শৃংখলা (Freedom and Discipline) :

এই অন্তর্জাত শৃংখলার সংগে শিশু-স্বাধীনতার কোন বিরোধ নেই। বরং একটি আর একটির পরিপূরক। অন্তর্জাত শৃংখলা আত্মনিয়ন্ত্রণেরই নামান্তর আর আত্মনিয়ন্ত্রণহীন স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতা, অসংযত এবং উদ্দাম আচরণ মাত্র। সুতরাং স্বাধীনতা আত্মনিয়ন্ত্রণের উপর নির্ভরশীল। আবার শিশু-মনের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করলে কৃত্রিমভাবে তার চরিত্রকে শুধু নিয়ন্ত্রণ করাই হবে এবং তার ব্যক্তিত্বকে কোন মর্যাদা দেওয়া হবে না। অতএব শিশুর স্বাধীনতার উপরই তার শৃংখলা নির্ভরশীল। জেলখানায় কয়েদী যে নিয়ম মেনে চলে এ নিয়ম বা শৃংখলা আরোপিত, তার সংগে তার স্বাধীনতার কোন সম্পর্ক নেই।

আবার শিক্ষার্থী অসংযতভাবে যখন অশুভ আচরণ করে তখন তার আচরণে যে স্বাধীনতা প্রকাশ পায় উহা স্বেচ্ছাচার। শিশুর খেলার মধ্যে স্বাধীনতা ও শৃংখলার যুগপৎ উপস্থিতি দেখি। শিশু যখন খেলে তখন সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে খেলার মধ্যে কতকগুলি নিয়ম অন্তরের তাগিদে আনন্দের সংগে মেনে নেয়। আবার খেলার মধ্যে তার আচরণের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বর্তমান। কোন বাধ্যবাধকতা বা বাইরের চাপ নেই! শিশু-শিক্ষায় এজন্য খেলার গুরুত্ব অসীম। শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষায় খেলাভিত্তিক শিক্ষাদানের প্রয়োজন তাই সর্বত্র স্বীকৃত হচ্ছে।

৩। শৃংখলা ও নির্দেশ (Discipline and Order):

বাস্তব জীবনে আমরা সুষ্ঠুভাবে কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শৃংখলা এবং নির্দেশ মেনে চলি। কিন্তু উভয়ের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য বর্তমান। নির্দেশের মধ্যে কোন বাইরের ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ইচ্ছা ব্যক্তির উপর আরোপিত হয়। তাই নির্দেশ এক ধরনের বহির্জাত শৃংখলা। ইচ্ছাকৃতভাবে, এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে নিয়মকানুন আমরা মেনে চলি তাই শৃংখলা। নির্দেশের মধ্যে একটা খবরদারী ভাব থাকে, শৃংখলায় থাকে অন্তরের তাগিদ। শিল্পী যখন ছবি আঁকেন, কবি যখন কবিতা লেখেন তখন তার মধ্যে মনের স্বাধীনতা বর্তমান, কিন্তু শিল্পের খাতিরে রঙ-তুলির, বা ছন্দের যে নিয়ম তিনি মেনে চলেন তা হল শৃংখলা। ব্যক্তির সংগে তার কর্মের শৃংখলার সম্পর্ক আভ্যন্তরীণ (internal)।

পার্সি নান শৃংখলা এবং নির্দেশের পার্থক্য দেখিয়ে বলেছেন: শৃংখলা নির্দেশের মত বাইরের জিনিস নয়। শৃংখলা এমনই একটি জিনিস যা আমাদের অন্তরের গভীরতম প্রদেশকে স্পর্শ করে। আমাদের সকল আবেগ এবং ক্ষমতার আয়ত্তীকরণ হচ্ছে শৃংখলা। অনিয়ন্ত্রিত এবং এলোমেলো শক্তি ও আকাঙ্ক্ষাকে পরিচালনাধীনে আনা শৃংখলার কাজ। এর ফলে যা অনির্দিষ্ট এবং উদ্দেশ্যহীন তা সুনির্দিষ্ট এবং উদ্দেশ্যমুখী হয়। যেখানে শক্তির অপব্যয় এবং অকার্যকারিতা ছিল সেখানে আসে মিতব্যয়িতা এবং দক্ষতা।

আমরা শিক্ষায় স্বাধীনতা ও শৃংখলার স্থান আলোচনা করেছি এবং স্বাধীনতা ও শৃংখলার মধ্যে যে কোন দ্বন্দ্ব নেই তার উল্লেখ করেছি। আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বে

অন্তর্জাত বা মুক্ত-শৃংখলার বহুল প্রচলন হয়েছে এবং শিশুর শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক পরীক্ষাও এ নিয়ে হচ্ছে। আমরা নিম্নে এ সম্বন্ধে আরও কিছু ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করছি।

৬। অন্তর্জাত শৃংখলা বা মুক্ত শৃংখলা (Internal discipline or Free discipline) :

'এনসাইক্লোপিডিয়া অব এডুকেশন' ডিসিপ্লিন বা শৃংখলা শব্দের ব্যাখ্যা করে বলেছে : ব্যাপক অর্থে 'শৃংখলা' শব্দের মানে হল সমগ্র উপদেশ ও শিক্ষাসমষ্টি যা শিক্ষার্থীকে পালন করতে হয়। কাজেই ব্যাপক অর্থে 'শৃংখলা' শিক্ষা (ট্রেনিং এবং এডুকেশন) শব্দের সমার্থক। সংকীর্ণ অর্থে 'শৃংখলা' শাসনের মর্যাদা রক্ষার সংগে জড়িত। নির্দিষ্ট আইনকানুন, শাস্তি ও পুরস্কার সমন্বিত বিদ্যালয়ের পরিচালনা পদ্ধতি, সুশৃংখল শিক্ষারই একটি অংগ, কাজেই উহা বুদ্ধির বিকাশ ও পরিমার্জনার উদ্দেশ্যসাধক। আবার একথা পরিষ্কার যে, নির্দেশ, শাসন ইত্যাদি শিশুর ইচ্ছার মধ্যেই কাজ করে। শৃংখলার সংগে শিক্ষার্থীর ইচ্ছা এবং চরিত্র গঠনের বিশেষ সম্বন্ধ বর্তমান।

শৃংখলার এই সংজ্ঞা থেকে বোঝা যায় শৃংখলার দুটি রূপ আছে—একটি বহিরংগ বা বহির্জাত, অন্যটি অন্তরংগ বা অন্তর্জাত। বহির্জাত শৃংখলাকে আমরা শিশু শিক্ষায় বাতিল করে দিয়েছি এ জন্য যে উহা শিশু-স্বাধীনতার পরিপন্থী। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বহির্জাত শৃংখলার কি কোন মূল্য নেই ? সামাজিক আচরণে শিশুকে অভ্যস্ত করানর জন্য আমরা কিছু শৃংখলা তার উপর আরোপ করি না ?

এ প্রশ্নের জবাব দেবার আগে বহির্জাত শৃংখলার সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন। বহির্জাত শৃংখলা যা গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রচলিত ছিল তা ছিল রূঢ়হস্তে শাসন। খ্রীষ্টধর্মের বিশ্বাস পাপ থেকে আমাদের জন্ম, অতএব শিশুকে কড়া শাসনে রাখতে হবে, নীতিশিক্ষা দিতে হবে পাপমুক্ত করার জন্য। আমাদের দেশে বলা হত ষড়রিপু মানুষের শত্রু, অতএব শিশুকে শাসন কর, শৃংখলায় রাখ রিপুমুক্ত করার জন্য। এ ধরনের যে শৃংখলা তা আরোপিত শাসন এবং শিশুমনের উৎপীড়ন মাত্র। আমরা একে যুক্তিযুক্ত মনে করি না।

সামাজিক আচরণে শিশুকে অভ্যস্ত করার জন্য, সামাজিক মংগলে তার সকল কর্মপ্রচেষ্টাকে অনুপ্রাণিত করার জন্য, তার নিজের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠুবিকাশ সাধনে তাকে সহায়তা করার জন্য, পিতামাতা বা অভিভাবক, শিক্ষক, বিদ্যালয় এবং অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান শিশু-মনের অগোচরে কতকগুলি বিধিনিষেধ শিশুর উপরে আরোপ করেন। শিশুর মন যখন অপরিণত, তার বুদ্ধি যখন পরিণামদর্শী নয় তখন তাকে সুপথে পরিচালনার জন্য কিছু নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য করা হয়, কিন্তু তা বলে তথাকথিত বহির্জাত শৃংখলার মত ইহা রূঢ়হস্তে দমন নয়; এ শাসনের উদ্দেশ্য সংশোধনমুখী। শিশুর মংগল এবং সামাজিক মংগলের সংগে এ বিধিনিয়ম জড়িত। ইহা তার ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক। অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অভিষ্টসিদ্ধির জন্য এ শৃংখলা আরোপিত হয় না। গতানুগতিক শিক্ষায় তথাকথিত বহির্জাত শৃংখলা বয়স্কদের, শিক্ষকদের এবং ধর্মের খেয়ালী বিধানকে চরিতার্থ করার জন্য আরোপিত হত।

কিন্তু শিশু যখন ন্যায়-অন্যায় বিচারে কিছুটা সক্ষম হবে, আচরণের পরিণাম সম্বন্ধে ভাবতে শিখবে তখন সে যেসব নিষেধ মেনে চলবে তার পেছনে শাস্তির ভয় থাকবে না, থাকবে শুধু তার শুভবুদ্ধি এবং আত্মশাসনের ক্ষমতা। কাণ্ট (*Kant*) এ ধরনের শৃংখলাকে বলেছেন, ইচ্ছার স্বায়ত্তশাসন (Autonomy of the will), উহা আত্ম-শৃংখলা (Self discipline)।

এই মুক্ত শৃংখলা কিভাবে আনতে হবে? ইহা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। শাসন ও শাস্তি বিধান দ্বারা আতংক সৃষ্টি করে এ শৃংখলা আনয়ন সম্ভব নয় এবং সংগতও নয়। সংশোধনকারী শাস্তি বা শাসন এতে থাকতে পারে, কিন্তু তার মূল উদ্দেশ্য শৃংখলাকে শিশুর আচরণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকশিত করা। সুতরাং এ ব্যাপারে পিতামাতা, অভিভাবক এবং বিশেষ ভাবে শিক্ষকের ভূমিকা প্রধান। এঁদের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে শিশুর আচরণ অনেকটাই প্রভাবিত হয়। গভীর দরদ ও ভালবাসা দিয়ে শিশুর মনে শৃংখলাবোধ উদ্রেক করতে হয়। পেস্টালৎসী বলেন: শৃংখলা ভালবাসার উপর এবং ভালবাসার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। বার্টাণ্ড রাসেল (*Bertrand Russell*) বলেন: সত্যিকার শৃংখলা বলতে বাইরের কোন বাধ্যবাধকতা বোঝায় না, ইহা মনের একটি অভ্যাস বা শিশুকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সার্থক পরিণতির দিকে এগিয়ে দেয়।

মন্টেসরী এ প্রসঙ্গে বলেন: সত্যিকার শৃংখলার লক্ষ্য শিশুদের শ্রেণীকক্ষে আলপিনে আবদ্ধ প্রজাপতির মত শক্তিহীন করে তোলা নয়। এ ধরনের শক্তিহীন শিশুরা প্রকৃতপক্ষে শৃংখলাবদ্ধ নয়, ধ্বংসপ্রাপ্ত।

মুক্ত স্বাধীনতা সম্বন্ধে জন ডিউই যে ব্যখ্যা দিয়েছেন তা ব্যক্তিগত শৃংখলা নয়। তিনি বলেন, সমাজধর্মী পরিবেশে প্রত্যেক ব্যক্তিই পরস্পরের সংগে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ। তাদের কর্তব্যপালনের উপর সমাজের সংহতি নির্ভর করে। কর্তব্যপালন করতে গিয়ে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে এবং গভীর আনন্দ সহকারে তা পালন করে। তখন সে তার সকল ইচ্ছা আবেগকে সমাজের মংগল ও সংহতির জন্য নিয়োজিত করে। এই সমাজধর্মী পরিবেশ থেকে শৃংখলার সৃষ্টি এবং তা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই জেগে ওঠে, বাইরের কোন চাপ এতে অর্থহীন। একেই ডিউই বলেছেন, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Social Control)। তাঁর মতে অসামাজিক পরিবেশই বিশৃংখল আচরণের জন্য দায়ী এবং সে পরিবেশে শৃংখলাবিধানের জন্য বাহ্যিক চাপ প্রয়োজন। সুতরাং সামাজিক পরিবেশই শৃংখলা বজায় রাখে।

৭। বিদ্যালয়ে বিশৃংখলা (Indiscipline in Schools):

অধুনা সারা বিশ্বে ছাত্র অশান্তি (Student Unrest) বা বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। অনুন্নত বা প্রগতিশীল সকলদেশেই ছাত্ররা রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের নামে যে অরাজকতা সৃষ্টি করেছে তা অভিভাবক, শিক্ষক, রাষ্ট্র পরিচালক সকলকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। আলোচ্য অংশে আমরা অশান্তচিত্ত যুবকদের বিশৃঙ্খলা আলোচনা করছি না। বিদ্যালয়ে শিশুদের মধ্যে, কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে নানা বিশৃঙ্খলাপূর্ণ আচরণ দেখা যায়, যার ফলে তাদের শিক্ষাগ্রহণ যথাযথ হয়না বা ব্যাহত হয়। পরিণত বয়সে হয়ত তাদের এ বিশৃঙ্খলাপূর্ণ আচরণ সামাজিক রূপ নিয়ে মারাত্মক আকার ধারণ করে। এ ধরনের আচরণই এখানে আমরা বিবৃত করব।

বিদ্যালয়ে অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদের মধ্যে কি কি ধরনের বিশৃঙ্খলা দেখা যায়, তার কতকগুলি উদাহরণ আমরা দিচ্ছি। অবাধ্যতা, অমনোযোগ, মিথ্যা কথা বলা, চীৎকার করা, শিক্ষককে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা, কলহ করা, মারামারি করা, নোংরা পোশাক পরা, নোংরা চেহারা নিয়ে বিদ্যালয়ে আসা, নকল করা, চুরি

দিয়ে বেঞ্চ টেবিল কাটা, বিদ্যালয়ে পাঠ প্রস্তুত না করা, খাতা পেন্সিল ভুলে আসা, যেখানে সেখানে থুথু ফেলা অথবা নালিশ করা, খেয়াল খুশিমত বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকা, শৌচাগার, পায়খানা বা শ্রেণীকক্ষের দেওয়ালে অশ্লীল কথাবার্তা লেখা, বিদ্যালয়ের প্রতি অশ্রদ্ধা, আলস্য, নিয়মানুবর্তিতার অভাব, অযথা রাগপ্রকাশ ইত্যাদি ধরনের বিশৃঙ্খলা ছাত্রদের মধ্যে দেখা দেয়।

বিদ্যালয়ে বিশৃঙ্খলার কারণ কি? বিশৃঙ্খলার বিভিন্ন কারণ নিয়ে শিক্ষাবিদদের গবেষণার অন্ত নেই। বিশৃঙ্খলার কোন একটি বিশেষ কারণ নেই—বিশেষ বিশেষ বিশৃঙ্খলার বিশেষ বিশেষ কারণ বর্তমান। নিয়ে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে প্রধান প্রধান কারণগুলি উল্লেখ করছি।

(ক) উপযুক্ত গৃহ পরিবেশের অভাব: শিশুর ব্যক্তিত্ববিকাশে, শিশুর জীবনে সংযত আচরণ সৃষ্টি করতে, তার মনে নানা মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে গৃহ-পরিবেশের অবদান সবচেয়ে বেশী। কিন্তু যেখানে মাতাপিতার মধ্যে ঝগড়া, কলহ বা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে, যেখানে মাতাপিতা নিজেরাই উচ্ছৃঙ্খল, অসংযত, অশিক্ষিত, সেখানে শিশুও অসামাজিক, অসংযত হয়ে উঠবে এতে আশ্চর্য নেই। মাতাপিতার স্নেহমমতা থেকে, গৃহ পরিজনদের সস্নেহ পরিচর্যা থেকে বিচ্যুত হলে শিশুর মনে নিরাপত্তাবোধ জাগে না। সেখানে সে মনে মনে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং নানা অসংযত ও অসামাজিক আচরণের মধ্যে তার বিদ্রোহকে প্রকাশ করে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অতিরিক্ত স্নেহ, প্রশ্রয়, অন্ধ ভালবাসাও অনেকক্ষেত্রে শিশুকে বিশৃঙ্খল করে তোলে।

(খ) সামাজিক পরিবেশ: গৃহ-পরিবেশের মত সামাজিক পরিবেশও উপযুক্ত না হলে শিশুর চরিত্রে অপসঙ্গতি ও অসামাজিকতা প্রকাশ পায়। শিশুর খেলার সাথী ও প্রতিবেশকে (neighbourhood) নিয়েই শিশুর সমাজ। নোংরা, কদর্য পরিবেশ, যেখানে ঝগড়াঝাটি, মারামারি, দ্বন্দ্ব কোলাহল সব সময়ই লেগে থাকে সেখানে শিশুর মনে সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে পারে না। শিক্ষাবিদ ডিউই বলেন, অসামাজিক পরিবেশই বিশৃঙ্খল আচরণের জন্য দায়ী। কারণ সমাজধর্মী পরিবেশ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টি হয়।

(গ) দৈহিক কারণ: অনেকক্ষেত্রে দৈহিক ত্রুটিবিচ্যুতি, দুর্বল স্বাস্থ্য শিশুকে অভিযোগপ্রিয়, অলস, নোংরা স্বভাবসম্পন্ন করে তোলে। দৈহিক

সুস্থতা, সংহত আচরণ ও সামাজিকতা বোধ সৃষ্টির একটি অন্যতম শর্ত। নানা কর্ম প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে শিশুর ব্যক্তিত্ব আপন প্রকাশ পথ খোঁজে। যদি দৈহিক দিক থেকে শিশু দুর্বল বা ত্রুটিপূর্ণ হয়, তবে তার কর্মপ্রচেষ্টা স্তিমিত হয়ে পড়ে। অনেক সময় সংগী সাথীদের সংগে নিজের দুর্বলতার জন্য মেলামেশা করতে না পেরে সে অপরাধপ্রবণ হয়ে পড়ে। রোগক্লিষ্ট, দৈহিক ত্রুটিযুক্ত, ভগ্নস্বাস্থ্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনেকক্ষেত্রেই হতাশা ও হীনমন্যতাবোধ জন্মায় এবং তারা বিপথগামী হয়।

(ঘ) মানসিক কারণ : শিশু অনেকক্ষেত্রে মানসিক ত্রুটি সম্পন্ন হবার ফলে অসামাজিক আচরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়, শিশু বুদ্ধিহীন, ক্ষীণবুদ্ধি বা অল্পবুদ্ধি। এর ফলে সে বিদ্যালয়ে পাঠগ্রহণে পিছিয়ে পড়ে, কোন কিছু শেখার ব্যাপারে সে আগ্রহ প্রকাশ করে না, বা তার গ্রহণ ক্ষমতা নেই। তখন সে বিদ্যালয় পালানো, গণ্ডগোল করা, নোংরা আচরণ করা প্রভৃতিতে রপ্ত হয়ে পড়ে।

মনঃসমীক্ষক ফ্রয়েড বলেন সচেতন ও অবচেতন মনের দ্বন্দ্বের জন্যও শিশুরা অসংযত ও অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে। অনেক সময় শিশু বাস্তব জীবনের সংগে খাপ খাওয়াতে পারে না। তার ইচ্ছা, তার কল্পনা, তার নিপীড়নবোধ ইত্যাদি বাস্তবে প্রকাশিত হতে না পেরে, মনের অবচেতন স্তরে পুঞ্জীভূত হয়। তারপর নানা অসংগতিমূলক আচরণের মাধ্যমে এগুলির আত্মপ্রকাশ ঘটে। ফ্রয়েড মনে করেন, বিশৃঙ্খলা একটি মানসিক রোগ।

শিশুর সহজাত প্রবৃত্তি বিকাশে অযথা বাঁধা প্রদান, তার প্রক্ষোভের সুষ্ঠু বিকাশসাধনে সহায়তা না করা, তার চাহিদাকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করা প্রভৃতির দ্বারা শিশু মনে নানা দ্বন্দ্ব ও বিক্ষোভ সঞ্চারিত হয়। বিদ্যালয়ে বিশৃঙ্খলা অনেক ক্ষেত্রে তারই স্ফূরণ।

(ঙ) ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা : শিক্ষায় যদি শিশুর চাহিদা ও কর্মপ্রচেষ্টা স্বীকৃত না হয়, শিশু-মন যদি শিক্ষায় অবহেলিত থাকে, তবে শিক্ষার্থী নানা বিরূপ আচরণের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে। তার সঞ্চিত শক্তি শিক্ষার গঠন-মূলক কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ-পথ না পেয়ে নানা বিশৃঙ্খল ও অসামাজিক আচরণের মধ্যে ব্যক্ত হয়। তাছাড়া শিক্ষকের প্রভাব ছাত্রদের উপর অপরিসীম। শিক্ষক যদি শিশু-মনের প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞ হন, বা শিশু-মনকে

অযথা শাসন বা তিরস্কারের মাধ্যমে সংহত করতে চান, তিনি যদি দরদী না হন, শিক্ষণ প্রদানে পটু না হন, তবে তার ছাত্ররা বিশৃঙ্খল হবে তাতে আশ্চর্য নেই।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে বিদ্যালয়ে বিশৃঙ্খলা কিভাবে দূরীভূত করা যায়? সার্থক শিক্ষা প্রদানের সঙ্গে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার অপরিহার্য সম্পর্ক। শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর চরিত্র সংগঠন এবং তাকে এমন শিক্ষা প্রদান করা যাতে ভবিষ্যতে সুনাগরিক হয়ে সে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথ পালন করতে পারে। সুতরাং বিদ্যালয়ের বিশৃঙ্খলার সংগে সমাজের ভবিষ্যৎও জড়িত। এজন্য শিক্ষক, মাতাপিতা, অভিভাবক, জনসাধারণ, শিক্ষাপরিশাসক সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় বিদ্যালয় থেকে বিশৃংখলা অপসারিত করে সুস্থ সমাজ গঠনের জন্য শিক্ষার্থীকে প্রস্তুত করা চাই।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫২-৫৩ খ্রীঃ) বিদ্যালয়ে শৃংখলা উৎপাদনকারী কয়েকটি শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমতঃ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে নিবিড় সংযোগ থাকা চাই। তার কারণ, শিক্ষকের সংগে প্রত্যক্ষ সংযোগ থাকলে শিক্ষার্থীর অনেক সমস্যায় শিক্ষক সহায়তা করতে পারেন। কমিশন এ প্রসংগে শ্রেণী শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের ভূমিকার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ পাঠ্যাতিরিক্ত কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে বা সহপাঠ্যসূচীর দলগত কর্ম প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে শৃংখলাবোধ জাগিয়ে তুলতে হবে।

এ প্রসংগে কয়েকটি প্রতিকার ব্যবস্থা আমরা উল্লেখ করছি। প্রথমতঃ, দেখতে হবে শিশু উপযুক্ত গৃহ ও সামাজিক পরিবেশে বর্ধিত হচ্ছে কি না। বিদ্যালয় বা শিক্ষকের পক্ষে উপযুক্ত গৃহ বা সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভবও নয়। এ ব্যাপারে অভিভাবক, মাতাপিতা, জনসাধারণকে অবহিত করাই বিদ্যালয়ের প্রধান দায়িত্ব। তবে বিদ্যালয়ে উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করে শিক্ষক শিক্ষার্থীর আচরণে অভিপ্রেত পরিবর্তন আনতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষার্থীর, দৈহিক সুস্থতা বজায় রাখবার জন্য বিদ্যালয়ে চিকিৎসকের ব্যবস্থা, গরীব ছাত্রদের বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ তাছাড়া বিদ্যালয়ে উপযুক্ত জলযোগের আয়োজন করা উচিত। দৈহিক ত্রুটি সম্পন্ন শিশুকে উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান দ্বারা, তার সংগী ও সহপাঠীর মনে তার প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি দ্বারা তাকে সামাজিক দিক থেকে প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে। তৃতীয়তঃ, যারা মানসিক দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ

১। তর্কশাস্ত্রসম্মত এবং মনস্তত্ত্বসম্মত পদ্ধতি (Logical and Psychological Method) :

বিদ্যালয়ে পাঠ্যসূচীকে কেন্দ্র করে শিক্ষক যখন তাঁর শিক্ষাকার্য সুরু করেন তখন কোন্ পদ্ধতি গ্রহণ করলে পাঠ্যসূচীর বিষয়াবলী বা ভাবধারা শিক্ষার্থীর সহজে বোধগম্য হবে—শিক্ষার্থীর মনে স্থায়ী রেখাপাত করবে, এ নিয়ে সমস্যা ওঠে। শিক্ষণ কার্যের সমস্যা হল কিভাবে শিক্ষার্থীর মনের সঙ্গে জ্ঞানের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা যায়? অর্থাৎ বিষয়বস্তুর জ্ঞান ও শিশু-মন, এ দুয়ের মধ্যে সার্থক সম্পর্ক সৃষ্টিই শিক্ষণের উদ্দেশ্য। এজন্য শিক্ষককে কেবলমাত্র বিষয়বস্তুর জ্ঞান অর্জন করলে চলে না, তাকে শিক্ষার্থীর মানসিক প্রকৃতি সম্বন্ধেও অবহিত হতে হয়।

'পদ্ধতি' শব্দের অর্থ কি? সাধারণ অর্থে আমরা 'পদ্ধতি' বলতে বুঝি কোন কর্মসম্পাদনের উপায়। শিক্ষা-পদ্ধতি বলতে শিক্ষাকার্য সম্পাদনের উপায় বোঝায়। গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষাপদ্ধতির এ অর্থই গৃহীত হত। আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব দেখিয়েছে যে ইহা শিক্ষাপদ্ধতির সংকীর্ণ অর্থ। ব্যাপক অর্থে শিক্ষাপদ্ধতি শিক্ষার্থী ও বিষয়-জ্ঞানের মধ্যে সুষ্ঠু সম্পর্ক বোঝায়। শিক্ষাবিদ্ রাস্ক (*R. B. Rusk*) পদ্ধতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, পদ্ধতি হল, শিক্ষার্থী ও বিষয়বস্তুর মধ্যে সন্নিকর্ষ স্থাপন ও রক্ষা করার প্রক্রিয়া (the process of establishing and maintaining contact between the pupil and the subject matter)।

আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা তর্কশাস্ত্রসম্মত এবং মনস্তত্ত্বসম্মত পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করার প্রস্তাব করছি।

তর্কশাস্ত্র সম্মত পদ্ধতি (Logical Method) : জ্ঞান অভিজ্ঞতার সংগঠন। জ্ঞানের দ্বারা আমরা বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে সুসম্বন্ধযুক্ত একটি ঐক্য স্থাপন করি। জ্ঞানের লক্ষণ হল এই যে, জ্ঞান সুসংহত (systematised) এবং বিচ্ছিন্ন, এলোমেলো অভিজ্ঞতাপুঞ্জের ঐক্য সৃষ্টি কারক।

তর্কশাস্ত্রসম্মত পদ্ধতি জ্ঞানের এই প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। যে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শিক্ষক শিক্ষাদান করেন সে বিষয়বস্তুর জ্ঞানের লক্ষণ বা প্রকৃতির উপর গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষক যখন বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা করেন তখন তাকে তর্কশাস্ত্রসম্মত পদ্ধতি বলে।

তর্কশাস্ত্রসম্মত পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষক জ্ঞানকে প্রণালীবদ্ধরূপে বিচার বিশ্লেষণ করে শিক্ষার্থীর সম্মুখে উপস্থাপিত করেন। শিক্ষার্থীর গ্রহণক্ষমতা, মানসিক বা বুদ্ধির স্তর, তার আগ্রহ ইত্যাদি বিবেচনা করা তর্কশাস্ত্র পদ্ধতির উদ্দেশ্য নয়। তর্কশাস্ত্রপদ্ধতির আবেদন শিক্ষার্থীর যুক্তিশীল মনে। বিষয়-বস্তুকে প্রণালীবদ্ধরূপে যুক্তির সাহায্যে শিক্ষার্থীর নিকট পরিবেশন করাই তর্কশাস্ত্রসম্মত পদ্ধতির কাজ।

তর্কশাস্ত্র আমাদের অভিজ্ঞতাপুঞ্জকে যখন ব্যাখ্যা করে তখন সে বাস্তব ঘটনার সাহায্য গ্রহণ করে না। বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আমরা যে অবধারণ (Judgement) সৃষ্টি করে চলেছি সে অবধারণগুলির মধ্যে সংশ্লেষ (implication) অন্বেষণ করে অবধারণগুলির মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করাই তর্কশাস্ত্রের কাজ। সুতরাং যে নিয়ম বা প্রণালী আবিষ্কার করে তর্কশাস্ত্র আমাদের জ্ঞান উপহার দেয় সে নিয়ম বাস্তব ঘটনাকে ব্যাখ্যা করে, কিন্তু ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় তা ধরা পড়ে না, বুদ্ধি বিচারে তা বোধগম্য হয়। তর্কশাস্ত্রের জ্ঞান এজন্য অমূর্ত (abstract)। আমরা যখন বলি 'সকল মানুষ মরণশীল' এ জ্ঞানটি (বা অবধারণ) সার্বিক (universal) এবং অনিবার্য (necessary)—তখন তার বাস্তব কোন মূর্তি নেই। বাস্তবে আমরা "বিশেষ মানুষকেই মরণশীল" দেখি। অতএব দেখা যাচ্ছে অমূর্ত ধারণার দ্বারাই জ্ঞানরাজ্যে ঐক্য বা সংহতি প্রতিষ্ঠিত হয়—আর তর্কশাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে এটাই আমাদের লক্ষ্য।

আমরা শিক্ষাদানের সময় বিষয়বস্তুকে তর্কশাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে নানাভাবে উপস্থাপিত করতে পারি। যেমন, একটি বিষয়বস্তুর বিভিন্ন অংশকে তর্কশাস্ত্র-সম্মতভাবে ভাগ করে তার প্রতিটি বিভাগ বা অংশ সম্বন্ধে পৃথক পৃথক ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এ পদ্ধতির নাম বিশ্লেষণ মূলক পদ্ধতি (Analytical Method)। উদাহরণ স্বরূপ একটি ফুলের বিভিন্ন অংশকে পৃথক পৃথকভাবে ব্যাখ্যা করে সমগ্রফুল সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়া যেতে পারে। অন্যদিকে, বিষয়বস্তুকে সমগ্রভাবে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করে তার সামগ্রিক ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এ পদ্ধতির নাম সংশ্লেষকমূলক পদ্ধতি (Synthetic Method)। উদাহরণ স্বরূপ, রবীন্দ্রনাথের 'অহল্যার প্রতি' কবিতা পড়ানর সময় সমগ্র কবিতার বিষয়বস্তু প্রথমতঃ ছাত্রদের সামনে ধরলে সেটি সম্বন্ধে তাদের মনে

একটি সামগ্রিক রূপ বা ধারণা জন্মাবে। তারপর অংশগুলির ব্যাখ্যা তাদের কাছে স্পষ্টতর হবে। তাছাড়া বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত সম্পর্ক বোঝাবার জন্য আমরা অবরোহ (Deduction) এবং আরোহ (Induction) পদ্ধতির সাহায্য নিতে পারি। কোন সার্বিক নিয়মের দ্বারা বিশেষ ঘটনা বা অভিজ্ঞতাকে যখন ব্যাখ্যা করা হয়—তখন তাকে অবরোহ বলে। 'রাম মরণশীল' কেন না আমরা জানি সকল মানুষই মরণশীল। আবার বিশেষ ঘটনার ব্যাখ্যা থেকে আমরা সঠিক নিয়মে পৌঁছাতে পারি। কয়েকটি ত্রিভুজ অংকন করে দেখাতে পারি প্রত্যেকটি ত্রিভুজের তিন কোণের সমান দুই সমকোণ—তারপর এটা বলা সম্ভব "প্রতিটি ত্রিভুজের তিনকোণের সমষ্টি দুই সমকোণ।'

মনস্তত্ত্বসম্মত পদ্ধতি (Psychological Method): মনস্তত্ত্বসম্মত পদ্ধতি শিশুমনের স্বাভাবিক গতি প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। বিষয়বস্তুর জ্ঞান পরিবেশনের চাইতে শিশু-মনের গ্রহণ ক্ষমতা, আগ্রহ ইত্যাদির উপর এ পদ্ধতিতে গুরুত্ব দেওয়া হয় বেশী। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর মনের স্বাভাবিক ধর্ম ও বিকাশকে অনুসরণ করে এ পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষাদান করা হয়। শিশুর মানসিক বিকাশ লক্ষ্য করলে দেখা যায় ইন্দ্রিয়গত অবস্থা থেকেই তার মন প্রত্যয়ধর্মী বা যুক্তিশীল হয়ে ওঠে। ইন্দ্রিয়ানুশীলন ও মূর্ত চিন্তার (concrete thinking) মাধ্যমে সে বিমূর্ত চিন্তায় (abstract thinking) অভ্যস্ত হয়। তাছাড়া আধুনিক মনস্তত্ত্বের গবেষণায় দেখা গেছে শিশুর জ্ঞান আহরণ তার গ্রহণ ক্ষমতা, আগ্রহ, প্রবণতা, বুদ্ধি প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল। শিক্ষায় ব ক্তি বৈষম্য নীতি আজ স্বীকৃত। মনস্তত্ত্বসম্মত পদ্ধতি প্রধানতঃ শিশু-মনের গঠন অনুসারে শিক্ষাদানকে নিয়ন্ত্রিত করে। গতানুগতিক শিক্ষায় শিশুকে বিমূর্ত চিন্তার অধিকারী যুক্তিশীল মানব বলে বিবেচনা করা হত। আধুনিক শিক্ষায় শিশুকে শিশু বলেই গণ্য করা হয়। শিশু মনস্তত্ত্ব দেখিয়েছে, যে-শিক্ষাদান পদ্ধতি শিশুর মনের স্বাভাবিক গতিকে অনুসরণ করে না, সেখানে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। শিক্ষার উদ্দেশ্য শিশুর মানসিক, দৈহিক বিকাশ। কতকগুলি তত্ত্ব, তথ্য বা সংবাদ দিয়ে তার মনে জ্ঞানের শৃংখলা সৃষ্টি করা নয়। শিশুর জীবনের সামগ্রিক বিকাশে সহায়তা করা শিক্ষার লক্ষ্য। সুতরাং শিক্ষকের দেখা উচিত শিশু কতটুকু জ্ঞান, বা কি কি বিষয়বস্তুর জ্ঞান গ্রহণ করতে সক্ষম। তা না হলে শিক্ষা-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। গতানুগতিক শিক্ষায় শিশু-মনের বিচার

না করেই তর্কশাস্ত্রসম্মত পদ্ধতি অনুসারে নানা জটিল, অমূর্ত বিষয়ের সংগে পরিচিত করার চেষ্টা করা হত। আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বে শিক্ষার্থীই শিক্ষার সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে, শিক্ষক শিক্ষাদাতা নন, শিশুর শিক্ষা গ্রহণে সহায়ক মাত্র। শিশুকে ইন্দ্রিয়ানুশীলন ও নানা কর্ম প্রচেষ্টার মাধ্যমে সক্রিয় করে তোলাই আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য। এজন্য আধুনিক শিক্ষায় 'খেলাভিত্তিক শিক্ষা' 'আত্মশিক্ষা' প্রবৃত্তি নীতি স্বীকৃতিলাভ করেছে। বলা বাহুল্য, এসব নীতি মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির নামান্তর মাত্র।

শিশুকে যদি প্রথম কতকগুলি অমূর্ত ধারণা বা নীতির মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয় তবে শিশুর মনকে ভারাক্রান্ত করা হবে। কেননা অপরিণত শিশু-মন অমূর্ত ধারণাকে সহজে গ্রহণ করতে পারে না। দেশপ্রেম, ভগবৎভক্তি, অধ্যবসায়, আনুগত্য ইত্যাদি অমূর্ত ধারণাকে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করলে শিক্ষাদান ব্যর্থ হবে। সেখানে যদি কয়েকটি মূর্ত ধারণা অর্থাৎ এসব বিষয়বস্তুর উদাহরণ প্রথমেই আমরা শিশুর সামনে উপস্থিত করি তবে তা সহজেই বোধগম্য হবে। মনস্তত্ত্ব এজন্য মূর্ত থেকে অমূর্ত (concrete to abstract) বিষয়ে যাবার পদ্ধতিই গ্রহণ করে।

শিশু-মনস্তত্ত্ব দেখিয়েছে, শিশুকে শিক্ষার সুরুতে নতুন নতুন তথ্যভারে ভারাক্রান্ত করা উচিত নয়। একথা সত্য যে শিক্ষা পুরাতন অভিজ্ঞতা আহরণ মাত্র নয়, শিক্ষার মধ্যে রয়েছে নতুন তথ্য, নতুন কৌশল, নতুন পরিস্থিতি। সুতরাং শিক্ষা শিশুর কাছে অনেকাংশে নতুন বা অজ্ঞাত হবেই। কিন্তু এজন্য সুরুতেই নতুন তথ্য শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়। শিশুর অর্জিত অভিজ্ঞতা বা জ্ঞাত বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাকে নতুন বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষার্থীর পক্ষে তখন অজ্ঞাতবস্তুকে গ্রহণ করা সহজ হবে। শিক্ষকও তখন ধাপে ধাপে শিশু-মনকে জ্ঞাত বিষয় থেকে অজ্ঞাত বিষয়ে সহজে পরিচালনা করতে পারেন। এভাবে শিক্ষার্থীকে সহজ বিষয় থেকে জটিল বিষয়ে শিক্ষাদান করা যায়।

তর্কশাস্ত্রসম্মত ও মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য রইলেও আসলে এ দুই পদ্ধতির মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। আমরা যদি গতানুগতিক শিক্ষায় তর্কশাস্ত্রসম্মত পদ্ধতি প্রয়োগ করে শিক্ষাফল লাভে ব্যর্থ হই, সে ত্রুটি পদ্ধতির নয়, প্রয়োগের। অপরিণত শিশুকে শিক্ষা দেবার বেলা এ পদ্ধতি প্রযোজ্য নয়, সেখানে মনস্তত্ত্ব-সম্মত পদ্ধতিই গ্রহণ যোগ্য। শিক্ষাদানের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে মনস্তাত্ত্বিক

পদ্ধতিই গ্রহণযোগ্য। কিন্তু কলেজ বা বিদ্যালয়ে যখন শিক্ষার্থী পরিণত বয়স্ক তখন তর্কশাস্ত্রসম্মত পদ্ধতি অনুসারেই শিক্ষাদান করা উচিত। আসল কথা তর্কশাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতেই জ্ঞান বিশ্লেষণ করা চলে। সুরুতে অর্থাৎ শিশুদের ক্ষেত্রে মনস্তত্ত্বসম্মত গ্রহণ করে তাকে তর্কশাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে জ্ঞান গ্রহণের উপযোগী করে তুলতে হয়। মনস্তত্ত্বসম্মত পদ্ধতি তর্কশাস্ত্রসম্মত পদ্ধতির বিরোধী নয় বা যুক্তির বিশ্লেষণ ব্যাখ্যার পদ্ধতির প্রতিকূল নয়। মনস্তত্ত্বসম্মত পদ্ধতিও যুক্তির উপর নির্ভরশীল—সে যুক্তি হচ্ছে শিশু-মনের যুক্তি। শিক্ষক শিশু মনের ধর্মকে মেনে নিয়ে শিক্ষাপ্রদান করবেন, তা না হলে বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিশুর জ্ঞানসম্পর্ক স্থাপিত হবে না, এই যুক্তি বা শিশু-মনের এই বিচার বিবেচনার উপর মনস্তত্ত্ব সম্মত পদ্ধতি নির্ভরশীল।

২। * সক্রিয়তাপদ্ধতি ও ব্যক্তিমুখী শিক্ষা (Activity methods in education and individualised instruction) :

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থী নিষ্ক্রিয় গ্রহীতা মাত্র নয়, তাকেও সক্রিয় ভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। শিক্ষক শিশুকে বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষাদান না করে সকল প্রকার কর্মমূলক পদ্ধতি তিনি গ্রহণ করেন। শিক্ষার সংগে যদি বাস্তব জীবনের যোগাযোগ বজায় রাখতে হয় তবে শিক্ষার্থীকে সক্রিয়ভাবে অভিজ্ঞতা আহরণ করতে হবে। খেলাভিত্তিক শিক্ষা এই সক্রিয়তাকেই গুরুত্ব দেয়। আধুনিক শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর সকল কর্মমূলক প্রচেষ্টাকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যক্তিবৈষম্যের নীতি অনুসৃত হত না। ফলে শিশু-জনতার সামনে এক নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী উপস্থাপিত করে শিক্ষক শিক্ষাদান কার্য সমাপ্ত করতেন। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক গবেষণার ফলে আমরা জানতে পেরেছি যে, বিভিন্ন শিশুর মধ্যে সামর্থ্য ও গ্রহণ ক্ষমতার পার্থক্য বর্তমান। সুতরাং সমষ্টিগত শিক্ষাসূচী শিক্ষার উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দেবে। শিক্ষার প্রকৃষ্ট নীতি হবে ব্যক্তির সামর্থ্য, গ্রহণ ক্ষমতা, চাহিদা ও রুচি অনুযায়ী শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত করা।

সক্রিয়তাপদ্ধতির দ্বারা শিক্ষার্থীকে শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহী, সক্ষম ও সক্রিয় করে তুলতে হবে। কোন কোন শিক্ষাবিদ্ মন্তব্য করেন, শিক্ষক শুধুমাত্র

* সক্রিয়তা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য।

পথনির্দেশক এবং সহায়ক। শিক্ষার্থী নিজেই শিক্ষা গ্রহণ করে, তাকে শিক্ষক শিক্ষা দিতে পারেন না। এই পদ্ধতিকেই স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি (Auto-Education) বলা হয়। শিক্ষার্থীর মধ্যেই অনন্ত সম্ভাবনা লুক্কায়িত রয়েছে। শিক্ষক সে সম্ভাবনার উদ্ঘাটন করেন।

এক্ষণে আমরা কয়েকটি আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব। এ পদ্ধতিগুলি শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা, ব্যক্তিবোধ এবং সক্রিয়তার উপর গুরুত্ব প্রদান করে।

৩। কিণ্ডারগার্টেন পরিকল্পনা (Kindergarten system) :

জার্মান শিক্ষাবিদ্ ফ্রয়েবেল তিন থেকে আট বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করে তার নাম দিয়েছিলেন কিণ্ডারগার্টেন বা শিশু-উদ্যান। এই নামটি ফ্রয়েবেলের শিক্ষাতত্ত্বের সংগে জড়িত হয়ে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছে।

ফ্রয়েবেল বলেন ঃ বিদ্যালয় একটি উদ্যান, শিক্ষার্থী কোমল কচি চারাগাছ, শিক্ষক সতর্ক পরিচর্যাকারী। কোমল শিক্ষার্থীরা কিভাবে গড়ে উঠতে পারে তার পরিচর্যা করাই হল শিক্ষকের কর্তব্য—শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে শিক্ষক সহায়কমাত্র।

কিণ্ডারগার্টেন পরিকল্পনা একটি দার্শনিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। শিশুর আত্মোপলব্ধি আসে তার অন্তর্নিহিত সত্তার ক্রমবিকাশের মাধ্যমে। আর এই ক্রমবিকাশ সম্ভব হয় সক্রিয়তার মাধ্যমে। ফ্রয়েবেল তাকে বলেছেন 'আত্মসক্রিয়তা' (Self-activity)। এই সক্রিয়তা শিশু-মনের ধর্ম। শিশুকে সক্রিয় করে তুলতে বাহ্যিক কোন প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই। স্বাভাবিকভাবে শিশুর জীবনে এ সক্রিয়তা দেখা দেবে। শিক্ষক শিক্ষা-দান কালে এমন একটি সুষ্ঠু পরিবেশ গড়বেন যেখানে শিশুর স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত না হয়। ফ্রয়েবেল অবশ্য পরিবেশের প্রভাব সম্বন্ধে কোন গুরুত্ব দেননি।

শিশুর আত্মসক্রিয়তা তার খেলাধূলা এবং অন্যান্য স্বতঃপ্রণোদিত কাজের মধ্যেই প্রকাশিত হয়। যেমন—নাচগান, আমোদপ্রমোদ, চলাফেরা, কথাবার্তা, ছবি আঁকা, গল্প বলা প্রভৃতি কাজের মধ্যে।

ফ্রয়েবেলের শিক্ষাপদ্ধতির আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল ইন্দ্রিয়ানুভূতির অনুশীলন। নানা ধরনের কাজ ও বস্তুভিত্তিক পাঠের (Object Lesson) দ্বারা শিশুর ইন্দ্রিয়চর্চা হয়। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের চর্চা শিশু-শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি। কাজের মধ্য দিয়ে শুধু যে ইন্দ্রিয়ানুভূতির অনুশীলন হয় তা নয়—ফ্রয়েবেল বলেন : প্রতিটি শিশুর মধ্যে যে সৃজনশীলতা রয়েছে কাজের মধ্যে তার প্রকাশ ও পরিতৃপ্তি ঘটে।

শিক্ষাকে বাস্তবধর্মী করে তোলা ও ইন্দ্রিয়ানুশীলনের জন্য ফ্রয়েবেল কয়েকটি নির্দিষ্ট বস্তুর উদ্ভাবন করেন এবং শিক্ষাদান পদ্ধতিতে তা প্রয়োগ করেন। এগুলিকে তিনি উপহার (Gift) এবং কাজ (Occupation) বলে অভিহিত করেছেন। যেমন, শিশুকে দুটি উপহার দেওয়া হল, একটি 'বল' অন্যটি 'ঘন আকৃতির বস্তু'। এই উপহারগুলি শুধুমাত্র খেলার সামগ্রী নয়, এগুলি বিশেষ বিশেষ ভাবের প্রতীক (Symbol) রূপে কাজ করে। 'বল' এখানে আধ্যাত্মিক একতার (Divine Unity) প্রতীক। ঘন আকৃতির বস্তুটি 'বলের' বিপরীত ভাব সৃষ্টি করে। এই দুই বিপরীত ভাবের সমন্বয় সৃষ্টি করার জন্য বেলনাকারের একটি (Cylinder) তৃতীয় বস্তু শিশুর সামনে উপস্থাপিত করা হয়। কিন্তু 'উপহারের' মত 'কাজ' অপরিবর্তনীয় স্থির বস্তু নয়। কাজগুলি হল পরিবর্তনশীল, গতিশীল বস্তু, যেমন—মাটি, বালি, কার্ডবোর্ড ইত্যাদি। এসব 'কাজ' এবং 'উপহারের' দ্বারা শিশুর সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং প্রতিটি শিশু সক্রিয়ভাবে শিক্ষায় অংশ গ্রহণ করে।

কিণ্ডারগার্টেন পরিকল্পনায় শিক্ষাদান পদ্ধতিতে শিশুকে সমাজধর্মী করে তুলবার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ভাববাদীদর্শনে অনুপ্রাণিত ফ্রয়েবেল বিশ্বাস করতেন, প্রতিটি শিশু এক আধ্যাত্মিক অখণ্ড সত্তার, অংশ বিশেষ। সুতরাং শিক্ষাদান পদ্ধতির মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে সহানুভূতি, ঐক্যভাব, সমাজ-চেতনা প্রভৃতি জাগ্রত করতে হবে। সকল প্রকার ঐক্যমূলক এবং সম্মিলিত কর্ম প্রচেষ্টার উপর কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাদান পদ্ধতি গুরুত্ব দিয়েছে।

৪। মণ্টেসরী পরিকল্পনা (Montessori Method) :

ইটালীর শিক্ষাবিদ্ মারিয়া মণ্টেসরী ফ্রয়েবেলের মত শিক্ষার দার্শনিক ব্যাখ্যা নিয়ে বিশেষ আলোচনা করেননি। তবে ফ্রয়েবেলের মত তাঁরও বিশ্বাস

ছিল, শিক্ষা হচ্ছে শিশুর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার বিকাশ। এজন্য শিক্ষার প্রথম শর্ত হল পূর্ণ স্বাধীনতা। তাঁর শিক্ষাতত্ত্বের মূলনীতি হচ্ছে 'স্বাধীনতা প্রথম, স্বাধীনতা দ্বিতীয়, স্বাধীনতা শেষ।' তাঁর শিক্ষাপরিকল্পনায় শিক্ষিকা হলেন পরিচালিকা (Directress)। তিনি সহানুভূতিশীলা, সদাহাস্যময়ী। বৈজ্ঞানিক কৌতূহল এবং গভীর দরদী মন নিয়ে তিনি দেখলেন শিশু কেমন করে স্বতস্ফূর্তভাবে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়ে ওঠে, কেমন করে তার সহজাত সম্ভাবনাগুলি আপন প্রকাশপথ খুঁজে। শিক্ষিকার কাজ হবে শিশুর স্বাভাবিক আচরণে কোন বাধা সৃষ্টি না করা। তিনি হবেন নীরব দর্শক মাত্র।

এ শিক্ষাপদ্ধতিতে সকল প্রকার শাসন, শাস্তি এবং পুরস্কারকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত শৃংখলার উপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শাসন শিশুর স্বাধীনতাকে ব্যাহত করে, শাসন-কণ্টকিত শৃংখলা—আত্ম-অবমাননার নামান্তর মাত্র। শাস্তিদানে শিক্ষার্থীর নৈতিক অবনতি ঘটে। পুরস্কারের দ্বারা শিশু-মনে লোভ ও অহংকার জাগ্রত করা হয়।

ফ্রয়েবেলের মত মণ্টেসরীও শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। রুশো, পেস্টালৎসী, ফ্রয়েবেল প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্‌গণ শিশু-স্বাধীনতার সমর্থক। কিন্তু মণ্টেসরীর মত কেউই স্বাধীনতার বাস্তবধর্মী ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। তিনি বলেন, সক্রিয়তা ছাড়া স্বাধীনতা অর্থহীন। স্বাধীনতা বলতে সক্রিয়তাই বুঝায়। আর এ সক্রিয়তা শিশুমনের ধর্ম। এজন্য শিশুর শিক্ষা হবে স্বতঃপ্রণোদিত। সক্রিয়তা তাই স্বাধীনতার নামান্তর। মণ্টেসরীর এ ধরনের ব্যাখ্যাকে বলা হয় স্বয়ংশিক্ষা বা স্বয়ংক্রিয় শিক্ষাপদ্ধতি (Auto-Education)। শিশু নিজেই শিক্ষা গ্রহণ করে। সক্রিয়তাই শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার মর্মবাণী।

মণ্টেসরী শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ইন্দ্রিয়ানুভূতির অনুশীলন (Training of senses)। ফ্রয়েবেলও তাঁর কিণ্ডারগার্টেন পরিকল্পনায় ইন্দ্রিয় চর্চার কথা বলেছেন নানা কাজের আয়োজনের মাধ্যমে। কিন্তু মণ্টেসরী ইন্দ্রিয়ানুভূতির অনুশীলন ও উৎকর্ষসাধনের জন্য বিজ্ঞানসম্মত ভাবে কতকগুলি যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন করেন। এগুলিকে বলা হয় শিক্ষামূলক সরঞ্জাম (Didactic Apparatus)। সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অভিজ্ঞতা অর্জন করানই শিক্ষার

উদ্দেশ্য। পঠন ও লিখনের সংগে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভও হয় শিক্ষামূলক সরঞ্জামের মাধ্যমে।

এই শিক্ষামূলক সরঞ্জামগুলি আবার দুই শ্রেণীর—ইন্দ্রিয়চর্চামূলক এবং বুদ্ধিচর্চামূলক। প্রথম শ্রেণীর সরঞ্জামগুলির দ্বারা শিশুর ইন্দ্রিয়গুলিকে শিক্ষা দেওয়া হয়। অর্থাৎ সঠিক এবং নিখুঁত প্রত্যক্ষণে ও ধারণা গঠনে সহায়ক করা হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর সরঞ্জাম লিখন, পঠন এবং বুদ্ধিমূলক কাজে শিশুকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়।

৫। মণ্টেসরী এবং কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির তুলনা (Comparision between Montessori and Kindergarten Methods) :

এই দুই পরিকল্পনার মধ্যে প্রচুর সাদৃশ্য বর্তমান। উভয় পদ্ধতিই বিশ্বাস করে যে, শিক্ষা শিশুর সহজাত সম্ভাবনার স্বাভাবিক বিকাশ। উভয় পদ্ধতিতেই শিশুর স্বাধীনতা এবং সক্রিতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উভয় পদ্ধতিতেই স্বতঃস্ফূর্ত শৃংখলা, সৃজনশীল কর্মপ্রচেষ্টা, ইন্দ্রিয়ানুশীলন, মূর্তবস্তুর মাধ্যমে শিক্ষা-দান প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃতি পেয়েছে।

কিন্তু এসব মূলনীতিতে মিল থাকা সত্ত্বেও উভয় পদ্ধতির মধ্যে কতকগুলি পার্থক্যও বিদ্যমান।

মণ্টেসরী পদ্ধতিতে শিশুকে ব্যক্তিগতভাবে কাজে উৎসাহিত করা হয়। কিন্তু কিণ্ডারগার্টেন পরিকল্পনায় সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ মণ্টেসরী পদ্ধতিতে শ্রেণী-শিক্ষাকে একক (Unit) হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি। খেলা, নাচগান, ছবি আঁকা প্রভৃতি কাজের এক একটিকে কেন্দ্র করে মণ্টেসরী শিক্ষার পরিকল্পনা করেছেন। এ পরিকল্পনায় গতানু-গতিক প্রথার মত শ্রেণীবিভাগ সুনির্দিষ্ট নয়। কিন্তু কিণ্ডারগার্টেন পরিকল্পনায় শ্রেণীবিভাগ গতানুগতিক প্রথার মত সুনির্দিষ্ট এবং অপরিবর্তনীয়। তৃতীয়তঃ উভয় পদ্ধতিতে ইন্দ্রিয়ানুশীলনকে শিক্ষার অপরিহার্য অংশরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ানুশীলনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। মণ্টেসরী পরিকল্পনায় শিক্ষামূলক সরঞ্জামের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়ানুশীলনের ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু কিণ্ডারগার্টেন পরিকল্পনায় বিভিন্ন উপহার (Gift) এবং

কাজের (Occupation) মাধ্যমে ইন্দ্রিয়ানুশীলন করা হয়। চতুর্থতঃ, মন্টেসরী পরিকল্পনায় শিশুর ইন্দ্রিয়ানুশীলনের সংগে সংগে লিখন ও পঠনের উপর জোর দেওয়া হয়, কিন্তু কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে লিখন ও পঠনের উপর তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। পঞ্চমতঃ, ফ্রয়েবেলের উপহার এবং মন্টেসরীর শিক্ষামূলক সরঞ্জামের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। ফ্রয়েবেলের উপহারগুলির মধ্যে বিশেষ বিশেষ ভাব বা ধারণা বর্তমান। এই উপহারগুলির একটি দার্শনিক ব্যাখ্যা রয়েছে। কিন্তু মন্টেসরীর সরঞ্জামগুলি কোন ধারণা বা দার্শনিক ভাবের প্রতীক (Symbol) নয়। ফ্রয়েবেলের উপহার লিখন ও পঠন বা পাঠ্যবস্তু শেখানর জন্য ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু মন্টেসরীর সরঞ্জাম পাঠ্যবস্তু শেখানর জন্যও ব্যবহৃত হয়।

৬। ডাল্টন পরিকল্পনা (Dalton Plan) :

ডাল্টন পরিকল্পনার স্রষ্টা হলেন একজন আমেরিকান মহিলা শিক্ষাবিদ্ হেলেন পার্কহার্স্ট *(Halen Parkharst)*। ডাল্টন শহরের এক বিদ্যালয়ে তাঁর পরিকল্পনাকে তিনি প্রয়োগ করেন। এরপর থেকে এই পরিকল্পনা ডাল্টন নামেই খ্যাত।

ডাল্টন পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, ইহা পুরোপুরি ব্যক্তিগত বৈষম্য (Individual difference) নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যখন একটি শ্রেণীকক্ষে সমবেত ছাত্রদের একজন শিক্ষক শিক্ষাদান করেন তখন এ ধরনের শিক্ষা-পদ্ধতি ব্যক্তিগত বৈষম্য নীতি স্বীকার করে না। আধুনিক মনস্তত্ব দেখিয়েছে, গ্রহণ-ক্ষমতা, রুচি, চাহিদা প্রভৃতির দিক থেকে প্রতিটি ব্যক্তি স্বতন্ত্র। ফ্রয়েবেল এবং মন্টেসরী পরিকল্পনায় এই মূলনীতি স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু কিণ্ডারগার্টেন পরিকল্পনায় গতানুগতিক শ্রেণীবিভাগকে মেনে নেবার ফলে ব্যক্তি বৈষম্যনীতি বাস্তব রূপ পায়নি। মন্টেসরী পরিকল্পনায় শ্রেণীবিভাগ সুনির্দিষ্ট না হলেও শিক্ষামূলক সরঞ্জামের কৃত্রিমতার জন্য ব্যক্তিবৈষম্যনীতি কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। কিন্তু ডাল্টন পরিকল্পনায় শ্রেণীবিভাগ, শ্রেণীগত শিক্ষক বা বক্তৃতাদান পদ্ধতির কোন স্থান নেই। সেখানে বিভিন্ন পাঠ্যবস্তুর জন্য নির্ধারিত স্বতন্ত্র কক্ষ বর্তমান। এগুলিকে বলা হয় গবেষণাগার (Laboratory)। আর শিক্ষার্থী হল গবেষক। শিক্ষকের কাজ হল গবেষণাগারের

সরঞ্জাম ইত্যাদির ব্যবহারে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করা। শিক্ষার্থী তার রুচি বা চাহিদা অনুযায়ী গবেষণাগার বা কক্ষ বেছে নেবে। পার্কহার্স্ট বলেন, যে বিষয়ে শিশুর গ্রহণ ক্ষমতা নেই সেই বিষয় সে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে করতে চায় না। তার নিজস্ব গ্রহণ-ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সে বিষয়বস্তু বেছে নেবে এবং কাজ সম্পাদনের জন্য তার নিজস্ব পরিকল্পনা সৃষ্টি করবে। একে পার্কহার্স্ট বলেছেন দৃষ্টিকোণের মনস্তত্ত্ব (Psychology of a point of view)।

ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে ডাল্টন পরিকল্পনায় রয়েছে শিশুর অবাধ স্বাধীনতা। এখানে শিশুই শিক্ষার নিয়ন্ত্রক এবং পরিচালক। তার অভিরুচি অনুযায়ী সে শুধু তার পাঠ্যবস্তুই নির্বাচিত করে না, পদ্ধতির ব্যাপারেও তার স্বাধীনতা রয়েছে। সকল কর্ম সম্পাদনের দায়িত্ব শিক্ষার্থীর উপর ন্যস্ত থাকায় শৃংখলা লংঘনের সুযোগ ঘটে না। শিক্ষার্থী নিজেরা শৃংখলা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বজায় রাখে।

ডাল্টন পরিকল্পনায় বাৎসরিক পাঠ্যসূচীকে মাস অনুযায়ী ভাগ করা থাকে। মাসিক কার্যভারকে আবার চারটি সপ্তাহ অনুযায়ী চারটি পিরিয়ডে ভাগ করা হয়। তারপর সাপ্তাহিক কাজের তালিকা সংবলিত পিরিয়ডকে আবার দৈনিক কর্মতালিকায় ভাগ করা হয়। উহাকে ডাল্টন পরিকল্পনায় একক (Unit) বলা হয়। এই একক কার্যভার সম্পন্ন করার দায়িত্ব শিক্ষার্থী নিজেই গ্রহণ করে।

ডাল্টন পরিকল্পনায় ব্যক্তিমুখী শিক্ষা ও শিক্ষাদান পদ্ধতিকে গ্রহণ করা হলেও শিক্ষার সামাজিক দিককে অবহেলা করা হয়নি। এ পদ্ধতিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সম্মেলনের (Conference) ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিক্ষক ও ছাত্র সমবেত হয়ে বিভিন্ন আলোচনায় যোগ দেন। সাহিত্য-সভা বক্তৃতা অভিনয় প্রভৃতির মাধ্যমে শুধু শিক্ষামূলক আলোচনাই হয় না, সম্মিলিতভাবে কার্যাবলী (Group activities) সম্পন্ন করার যোগ্যতাও শিক্ষার্থী গ্রহণ করে—পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি, ঐক্য-বোধ জেগে ওঠে। শিক্ষামূলক সম্মেলন এবং সমবেত ভাবে কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা সমাজ চেতনার বিকাশ সাধন করা হয়, শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব সুদৃঢ় হয়।

কিন্তু এ পরিকল্পনার প্রধান ত্রুটি হল এই যে, উহা প্রচুর ব্যয়সাধ্য। খুব ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে উহা প্রয়োগ করা যায় না; কেননা বিচারশক্তি ও দায়িত্ববোধ তাদের মধ্যে তখন থাকে না। তাছাড়া, অতিরিক্ত ভাবে ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব দেবার ফলে আত্মকেন্দ্রিকতাই বৃদ্ধি পাবে। তার ফলে সামাজিক চাহিদার সংগে সামঞ্জস্য বিধান কঠিন হয়ে পড়বে।

৭। প্রজেক্ট পদ্ধতি (Project Method):

জন ডিউই তাঁর শিক্ষাতত্ত্বে যে শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রবর্তন করেন, তাকে সমস্যা-পদ্ধতি (Problem Method) বলা হয়। শিক্ষক-নির্ভর না হয়ে শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে কোন সমস্যার সমাধান করে শিক্ষা গ্রহণ করবে—এই ছিল ডিউই-র অভিপ্রায়। কিন্তু আলোচনার বিষয়বস্তুকে এমন জটিলভাবে তিনি উপস্থাপিত করেন যে তাঁর প্রবর্তিত পদ্ধতি জনপ্রিয়তা লাভে বঞ্চিত হয়।

এই সমস্যা-পদ্ধতির রূপান্তরিত ভাষণ হল প্রজেক্ট পদ্ধতি। 'প্রজেক্ট' কথার সংক্ষিপ্ত অর্থ হচ্ছে কর্ম-সম্পাদন, সমস্যা-সমাধান। ডিউই-র শিষ্য কিলপ্যাট্রিক *(Kilpatrick)* এই পদ্ধতির প্রবর্তক। ডিউই-র দুই মূলনীতি—সমস্যা-সমাধান এবং সক্রিয়তাকে তিনি গ্রহণ করেছেন।

কিলপ্যাট্রিক 'প্রজেক্ট' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেছেন: **প্রজেক্ট হল একটি সামাজিক পরিবেশে সর্বান্তঃকরণে সম্পাদিত কোন উদ্দেশ্যমূলক কাজ।** তিনি 'কাজ'-কে 'সমস্যা' বলেই গণ্য করেছেন। কিলপ্যাট্রিক থর্নডাইক *(Thorndike)* প্রবর্তিত প্রচেষ্টা এবং ভ্রান্তি মতবাদের (Trial and Error Theory) দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন এবং উহার মূলসূত্রগুলি তাঁর প্রজেক্ট পদ্ধতিতে প্রয়োগ করেন। প্রচেষ্টা এবং ভ্রান্তি মতবাদের প্রধান সূত্র হল তিনটি—কার্যফল সম্বন্ধীয় নীতি (Law of Effect), অনুশীলন সম্বন্ধীয় নীতি (Law of Exercise) এবং প্রস্তুতি সম্বন্ধীয় নীতি (Law of Readiness)। বার বার চেষ্টা করে যখন কোন সমস্যায় আমরা ফল লাভ করি বা আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হয় তখন আমরা তৃপ্তিও লাভ করি। দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে, যে কার্য পুনঃ পুনঃ করা যায় তা সহজভাবে শিখতে পারা

যায়। তৃতীয় সূত্র অনুসারে, কোন কার্য সম্পাদনের জন্য প্রস্তুতি থাকা চাই। যে কাজের জন্য ব্যক্তি প্রস্তুত নয় তাকে ঐ কাজে নিয়োজিত করলে, তার বিরক্তি আসে, আর শিক্ষণ সেখানে সার্থক হয় না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যে কাজের পেছনে শিক্ষার্থীর কোন আগ্রহ নেই, যে কাজের জন্য তার কোন প্রস্তুতি নেই, এ ধরনের কাজ তাকে করতে দেওয়া উচিত নয়। শিক্ষায় শিশুর কর্মসম্পাদনের জন্য আগ্রহ ও চাহিদা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই মনস্তাত্ত্বিক সত্যের উপর প্রজেক্ট পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত।

প্রজেক্ট পদ্ধতির আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল উহার সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভংগী। ডিউই তাঁর শিক্ষাদর্শনে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব-বোধ এবং সমাজ-চেতনার মধ্যে একটি সার্থক সমন্বয় আনবার চেষ্টা করেছেন। সামাজিক পরিবেশই আমাদের সকল আচরণের ক্ষেত্র। কিলপ্যাট্রিক ডিউই-র শিক্ষাদর্শনকেই তাঁর প্রজেক্ট পদ্ধতিতে গ্রহণ করেছেন। সামাজিক পরিবেশেই প্রজেক্ট পরিকল্পিত হবে। কোনরূপ কৃত্রিম বা অবাস্তব পরিবেশে প্রজেক্ট রচিত হলে শিক্ষা সমাজধর্মী হবে না, বাস্তব জীবনের সংগে শিক্ষার কোন সংযোগ থাকবে না, শিক্ষা হবে জীবনমুখী।

প্রজেক্ট পদ্ধতির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল, তার দার্শনিক দৃষ্টিভংগী। আধুনিক শিক্ষাদর্শনে আমরা বিশ্বাস করি, শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব, স্বাধীনতা ও সক্রিয়তাই হবে শিক্ষায় প্রধান বিবেচ্য। প্রজেক্ট পদ্ধতি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপর গুরুত্ব প্রদান করে। শিক্ষার্থী কি এবং কতটুকু শিখবে নিজেই স্বাধীনভাবে তা নির্ধারণ করে। আর সমস্যার সমাধান সক্রিয়ভাবেই তাকে করতে হয়।

প্রজেক্ট পদ্ধতির বিভিন্ন পর্যায় (Different steps in the Project Method) : প্রতিটি প্রজেক্ট উদ্দেশ্যমূলক এবং সমস্যা-ধর্মী। যেখানে কোন সমস্যা নেই, সেখানে কোন প্রজেক্ট হয় না। এই সমস্যার পেছনে থাকবে একটি উদ্দেশ্য। সমস্যা সমাধানের সংগে সংগে সেই বিশেষ উদ্দেশ্যকে শিক্ষার্থী চরিতার্থ করবে। প্রতিটি প্রজেক্টে সাধারণতঃ চারটি পর্যায় অনুসৃত হয়। এই প্রতিটি স্তরের সংগে মূল প্রজেক্টের সম্পর্ক রয়েছে।

(১) প্রথম পর্যায়কে বলা হয় উদ্দেশ্য-নির্ধারণ (Purposing)। শিক্ষার্থী যখন প্রজেক্ট গ্রহণ করে তখন কেন সে সমস্যা সমাধান করবে অর্থাৎ উহার উদ্দেশ্য কি-তা নির্ধারণ করবে।

(২) দ্বিতীয় পর্যায়কে বলা হয় পরিকল্পনা (Planning)। কোন্ পদ্ধতির সাহায্যে বা কি উপায়ে প্রজেক্ট বা সমস্যার সমাধান করবে, এই স্তরে শিক্ষার্থী তা স্থির করে।

(৩) তৃতীয় পর্যায়কে বলা হয় সম্পাদন (Executing)। অর্থাৎ এই স্তরে প্রজেক্টের পরিকল্পনাকে শিক্ষার্থী বাস্তব ক্ষেত্রে রূপ দেয়, কার্যে রূপান্তরিত করে।

(৪) চতুর্থ পর্যায়কে বলা হয় বিচারকরণ (Judging)। এই স্তরে শিক্ষার্থী তার প্রচেষ্টার সাফল্য সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করে। প্রজেক্টের মূল উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে কিনা ইত্যাদি এ স্তরে বিবেচ্য।

প্রজেক্ট পদ্ধতির সমালোচনা (Criticism of Project Method) : প্রজেক্ট পদ্ধতি শিক্ষাব্যবস্থায় প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তার কারণ এই পদ্ধতি আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের এবং শিশু মনস্তত্ত্বের মৌলিক নিয়মগুলি গ্রহণ করেছে। আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের মূল বক্তব্য হল, শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করা এবং সক্রিয়ভাবে যাতে শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করে তার ব্যবস্থা করা। তাছাড়া, আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব বিশ্বাস করে, শিক্ষা শিশুর ব্যক্তিগত ব্যাপার নয় তা প্রধানতঃ সামাজিক ব্যাপার। প্রজেক্ট পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব-বোধ এবং সক্রিয়তার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, প্রতিটি প্রজেক্ট স্বাভাবিক সামাজিক পরিবেশে সম্পাদিত হয়। সম্মিলিতভাবে কাজের দ্বারা পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি জাগে ও সামাজিক চেতনা বাস্তবরূপ পায়।

আধুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান দেখিয়েছে, শিশুর শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হবে তার চাহিদা ও আগ্রহের দ্বারা। অর্থাৎ শিক্ষায় শিশু-মনের স্বাধীনতা যদি অনুপস্থিত থাকে তবে সে শিক্ষার সংগে শিক্ষার্থীর চিরন্তন বিরোধ বাঁধবে। প্রজেক্ট পদ্ধতিতে এই মনস্তাত্ত্বিক সত্যটি পরিপূর্ণভাবে গৃহীত হয়েছে। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী নিজে কি কাজ করবে, কেন করবে, কি উপায় অবলম্বন করবে ইত্যাদি নির্ধারণ করা হয়।

শিক্ষা শুধু অভিজ্ঞতার সঞ্চয় নয়। বাস্তব জীবনে অভিজ্ঞতা আমাদের সামনে যে-সব প্রশ্ন নিয়ে উপস্থিত হয়, যে-সব সমস্যা সৃষ্টি করে, সে-সব প্রশ্ন ও সমস্যা সমাধান করাই শিক্ষা। শিক্ষা তাই জীবনধর্মী। প্রজেক্ট পদ্ধতিতে

৯। ডেক্রলী প্রথা (Decroly System) ঃ

অভাইড্ ডেক্রলী (*Ovide Decroly*) মন্টেসরীর মতন একজন চিকিৎসক ছিলেন এবং মানসিক বিকারগ্রস্তদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরে সুস্থ ছেলেমেয়েদের জন্যও তাঁর প্রবর্তিত পদ্ধতি তিনি প্রয়োগ করেন।

শিক্ষা সম্বন্ধে ডেক্রলীর মূল বক্তব্য হল : শিক্ষা হবে অভিজ্ঞতাভিত্তিক। বাস্তব জীবনের সংগে শিক্ষার নিবিড় সম্পর্ক থাকবে। তাঁর শিক্ষাতত্ত্বের মর্মবাণী হল : জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে জীবনের জন্য শিক্ষা (Education for life by living অথবা Learning though living)। তাই স্বাভাবিক সামাজিক পরিবেশে বিদ্যালয় থাকা চাই। সময় সময় শিক্ষার্থীকে শ্রেণী-কক্ষের বাইরে সমাজের মধ্যে কাজ করতে দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ে স্বাভাবিক জীবন সৃষ্টি করার জন্য পরিবার ও বিদ্যালয়ের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন করার কথা তিনি বলেছেন। শিক্ষার্থীর পিতামাতা বিদ্যালয় পরিকল্পনায় শুধু পরামর্শ দেবেন না, সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করবেন।

প্রত্যেকটি শ্রেণী-কক্ষ হবে এক একটি গবেষণাগার। প্রতি দশজন শিক্ষার্থী একটি একক (unit) গঠন করে নিজস্ব চাহিদা অনুযায়ী গবেষণাগারে কাজে যোগদান করবে। নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে ভুলভ্রান্তি পরিহার করবে। এতে তাদের স্বাধীনচিন্তা ও দায়িত্ববোধের উদ্রেক হবে।

ডেক্রলী প্রথায় শিক্ষার্থীর আগ্রহ অনুযায়ী শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হবে। এজন্য তাঁর প্রবর্তিত পদ্ধতিতে তিনি 'আগ্রহের কেন্দ্র' (Centre of Interest) সৃষ্টিতে গুরুত্ব দিয়েছেন। শিশুর যে বিষয়ে আগ্রহ, সে বিষয়টিকেই কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর শিক্ষা দিতে হবে।

ডেক্রলী আগ্রহ অনুযায়ী জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে জীবনের জন্য শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে পাঁচটি মূলনীতির প্রবর্তন করেন। যথা,

(১) শিশু একটি জীবন্ত প্রাণ, তাকে সামাজিক জীবনের উপযোগী করে তোলা চাই।

(২) শিশুর জীবন ক্রমবর্ধিষ্ণু। তার জীবনের বিভিন্ন স্তরে সে বিভিন্ন।

(৩) একই বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে আগ্রহ, রুচি, ক্ষমতা, চাহিদা এবং অন্যান্য দৈহিক ও মানসিক গুণাবলীর পার্থক্য বিরাজমান।

(৪) শিশুর জীবনে বিভিন্ন বয়সে নানা ধরনের আগ্রহ জাগে। এই আগ্রহগুলি তার মানসিক গুণাবলীকে নিয়ন্ত্রিত করে।

(৫) শিশু সদা সঞ্চরণশীল। সে কর্মমুখর। যদি বুদ্ধিবিচারের দ্বারা শিশুকে উপযুক্তভাবে পরিচালিত করা যায় তবে তার সঞ্চালনমূলক আচরণ তার জীবনের সব কাজের সংগে যুক্ত হয়ে যায়।

১০। বাটাভিয়া পরিকল্পনা (Batavia System) :

আমেরিকার শিক্ষাবিদ্ জন কেনেডি এই পরিকল্পনার প্রবর্তক। পড়াশোনায় অনগ্রসর (backward) শিক্ষার্থীদের জন্য এ পরিকল্পনা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। বিদ্যালয়ে দেখা যায় অনেকগুলি ছেলেমেয়ে পিছিয়ে থাকে। এসব ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিগত পরিচর্যাই এই পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য। শিক্ষার্থীর সকল দুর্বলতার কারণ শিক্ষক প্রথমতঃ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দ্বারা স্থির করেন। তারপর দৈনন্দিন কর্মসূচী নির্ধারণ করে শিক্ষার্থীকে কাজে যোগদান করতে বলা হয়। লক্ষ্য রাখতে হয়, শুরুতে যাতে কঠিন কাজ তাকে না দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করার জন্য যে কাজ তাকে করতে দেওয়া হয়, শিক্ষকও সে কাজ হাতে-কলমে করেন।

১১। ওয়ার্ধা পরিকল্পনা (Wardha Plan) ঃ

১৯৩৭ খ্রীঃ মহাত্মা গান্ধী 'হরিজন' পত্রিকায় সর্বপ্রথম বুনিয়াদী শিক্ষার (Basic Education) পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। মধ্যযুগীয় শিক্ষাব্যবস্থা তখন ভারতে প্রাচীন ঐতিহাসিক চিহ্ন হিসেবে বর্তমান। পাশ্চাত্য শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচার ও প্রসার তখন খুব জোরালো ভাবে চলছে। এই শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান সমর্থক ছিল রাজশক্তি। পরাধীন ভারতবর্ষের জাতীয়তাবোধের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না এ শিক্ষাব্যবস্থার। ভারতের অর্থনৈতিক, সামাজিক বা আধ্যাত্মিক পরিবেশের সংগে কোন মিল ছিল না ইংরেজশাসক-প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থায়। সুতরাং সে সময় মহাত্মা গান্ধীর বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা ভারতীয়দের মনে গভীর চাঞ্চল্য এবং ভাব-বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল। ১৯৩৭ খ্রীঃ ওয়ার্ধায় একটি শিক্ষাসম্মেলন বসে এবং সে সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধীর পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এরপর থেকে গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনাকে

ওয়ার্ধা পরিকল্পনাও বলা হয়। বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষাপ্রবর্তন এ পরিকল্পনার প্রধান আবেদন।

গান্ধীজীর শিক্ষা পরিকল্পনার মূল বক্তব্য হল: একটি নির্দিষ্ট কুটির-শিল্পকে কেন্দ্র করে হবে এই শিক্ষাদান। এই কুটিরশিল্পই হবে উৎপাদনাত্মক (Productive) অর্থাৎ এই শিক্ষার দ্বারা শিক্ষায় অনগ্রসর ভারতবর্ষের মানুষ শিক্ষার মাধ্যমে রোজগার করতে পারবে, অলস জীবনযাপন করার প্রশ্ন উঠবে না। ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় চরকাকে নির্দিষ্ট উৎপাদনাত্মক শিল্পরূপে (craft) গ্রহণ করা হয়। আর শিক্ষার অন্যান্য বিষয়াবলীও এই নির্দিষ্ট শিল্পকে কেন্দ্র করে শেখান হবে। সত্য ও অহিংসাই হবে শিক্ষার আদর্শ।

গান্ধীজীর শিক্ষাতত্ত্বের এই মৌলিক নীতি নিঃসন্দেহে তদানীন্তন ভারত-বর্ষের গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার উপর আঘাত হেনেছে। ভারতের গতানুগতিক শিক্ষা ছিল পুস্তক-ভিত্তিক, শিক্ষক-কেন্দ্রিক। গান্ধীজী শিক্ষায় শিক্ষার্থীর সক্রিয়তার উপর গুরুত্ব দিলেন, শিক্ষা হবে শিল্প-কেন্দ্রিক (craft-centred)। শিক্ষাকে শিল্প-কেন্দ্রিক করে তোলার পেছনে দুটি কারণ প্রধানতঃ গান্ধীজীর মনে কাজ করেছিল—একটি হল শিক্ষা হবে কর্ম-কেন্দ্রিক, শিশু সক্রিয়ভাবে কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করবে, শ্রমের মর্যাদা শিখবে। অন্যটি হল, শিক্ষার দ্বারা শিশু শিল্পে দক্ষতালাভ করবে। শিক্ষা সমাপনান্তে জীবিকার জন্য তাকে পথ অন্বেষণ করতে হবে না, ভবিষ্যৎ জীবনে এই শিল্পকে সে বৃত্তি (vocation) হিসেবে গ্রহণ করতে সমর্থ হবে। তাছাড়া, অর্থনৈতিক দিক থেকে এ শিক্ষাব্যবস্থা হবে আত্মনির্ভর (Self-dependent)। কেননা, শিক্ষার্থীদের তৈরী শিল্পসামগ্রী বিক্রয় করলে শিক্ষাদানের ব্যয় মেটান যাবে।

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে ওয়ার্ধা পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য (Significant features) বা মৌলিক নীতিগুলি (fundamental principles) আমাদের কাছে সহজেই প্রতীয়মান হয়। এই বৈশিষ্ট্য বা নীতিগুলি হল:

(ক) ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় একটি শিল্পকে (craft) কেন্দ্র করে শিক্ষাদান করা হবে অর্থাৎ শিক্ষা হবে শিল্প-কেন্দ্রিক বা কর্ম-কেন্দ্রিক। গতানুগতিক পুস্তক-কেন্দ্রিক শিক্ষাকে এতে মোটেই গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

(খ) ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের সংগে এ শিক্ষার সংযোগ থাকবে। যে শিল্প উৎপাদনাত্মক, সামাজিক কল্যাণসাধক সেই শিল্প শিক্ষাকেন্দ্রে স্থাপন কর হবে। তারপর অনুবন্ধনীতি (Principle of correlation) অনুসারে শিক্ষাদান করা হবে।

(গ) যেহেতু সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাসূচী নির্ধারিত হয় সেহেতু শিক্ষার সংগে জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। কায়িক পরিশ্রমের উপর গুরুত্ব দেওয়ার ফলে, এ পরিকল্পনায় শিক্ষার্থী শ্রমের মর্যাদা শেখে এবং শিক্ষা সমাপনান্তে জীবিকা উপার্জনের জন্য বিদ্যালয় জীবনের শিল্পকে সে গ্রহণ করতে পারে। ফলে তার সামাজিক পরিবেশ থেকে সে বিচ্যুত হয় না।

(ঘ) ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় সমবেত কর্মানুষ্ঠান ও ব্যক্তিগত চরিত্র এবং সরল জীবন যাপনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। সম্মিলিতভাবে কর্ম সম্পাদনের দ্বারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলপ্রীতি, আত্মত্যাগ, স্বার্থত্যাগ, সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি পায়। গান্ধীজী নিজে ভাববাদী (Idealist) আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। স্বার্থত্যাগ আর অন্তরের শুচিতাবোধই ব্যক্তির জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ আচরণ বলে তিনি গণ্য করতেন। অহিংসা এবং সত্য জীবনের আদর্শ। সুতরাং 'চরকা' শিক্ষাকেন্দ্রে শিল্প হিসেবেই ছিল না, এর উদ্দেশ্য ছিল—স্বাবলম্বী, আত্মনির্ভরশীল, সরল ও সংযত জীবন।

(ঙ) ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম বলে গৃহীত হয়। বিদেশী ভাষা ইংরেজীকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে সেদিন ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে গ্রহণ করা হয়েছিল। তার ফলে শিশুর শিক্ষা ও ভাষার সংগে ছিল বিরোধ। মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করলে শিক্ষাকে শিশু সরলভাবে গ্রহণ করতে পারে। শিক্ষার সংগে তার যোগ হয় স্বাভাবিক।

গান্ধীজীর এ পরিকল্পনার নানা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটেছে। তাঁর শিক্ষাদর্শন আমাদের দেশের রাষ্ট্রনেতা ও অনেক শিক্ষাবিদ্‌দের যথেষ্ট সমর্থনও লাভ করেছে। ১৯৩৮ সালে শ্রীবি জি. খেরের সভাপতিত্বে গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা পরীক্ষা করার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি বুনিয়াদী শিক্ষাকে দুটি স্তরে ভাগ করেন: নিম্ন-বুনিয়াদী স্তর (Junior Basic Stage) ৬ বৎসর থেকে ১১ বৎসর এবং উচ্চ-বুনিয়াদী স্তর (Senior Basic Stage) ১১ বৎসর থেকে ১৪ বৎসর। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে

সার্জেন্ট রিপোর্ট প্রাথমিক শিক্ষার (Primary) ক্ষেত্রে বুনিয়াদী শিক্ষাকে জাতীয় পরিকল্পনারূপে (National programme) গ্রহণ করেন। ১৯৪৫ সালে সেবাগ্রামে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে বুনিয়াদী শিক্ষাকে ভারতবর্ষের সকল স্তরের মানুষের, জীবনের সকল স্তরের শিক্ষারূপে গ্রহণ করা হয়। ডঃ জাকির হুসেনের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম বুনিয়াদী শিক্ষার একটি সুসংহত পাঠক্রম তৈরী হয়। রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে সেবাগ্রামে একটি গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় (Rural University) স্থাপন করা হয়। এখানে গান্ধীজীর ওয়ার্ধা পরিকল্পনা বা বুনিয়াদী শিক্ষার মূলনীতি অনুসারে শিক্ষাদান পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। এজন্য ওয়ার্ধা পরিকল্পনার শিক্ষাদান পদ্ধতিতে সেবাগ্রাম পদ্ধতিও বলা হয়।

১২। সেবাগ্রাম পদ্ধতি Sevagram Method :

সেবাগ্রাম পদ্ধতিতে শিক্ষক নিছক বক্তৃতা (Lecturing) বা পুস্তকপাঠের মাধ্যমে শিক্ষাদান করার রীতিকে বর্জন করেন। গান্ধীজী বুনিয়াদী শিক্ষার কেন্দ্রে একটি শিল্পমূলক কাজ প্রবর্তন করেন। শিক্ষার্থীরা এই শিল্প-কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত বিষয়াবলী সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করবে। সেবাগ্রাম পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে শিল্প-কেন্দ্রিক (craft-centred) শিক্ষা পদ্ধতি। একটি শিল্পের জ্ঞান থেকে শিক্ষার্থীরা সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত ইত্যাদি অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করবে। শিক্ষাপদ্ধতিতে এ ধরনের নীতিকে বলা হয় অনুবন্ধনীতি (Principle of correlation)। এ নীতিটির পেছনে মনস্তাত্ত্বিক সমর্থন রয়েছে। শিক্ষার বিষয়বস্তুকে আমরা নানা শ্রেণীতে বা অংশে ভাগ করে থাকি। বাস্তব পৃথিবীতে ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, জীববিদ্যা বা ভূগোল ইত্যাদি বলে কোন আলাদা বিষয়বস্তুর অবস্থিতি নেই। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অন্তর্নিহিত মৌলিক সম্পর্ক বিদ্যমান। সুতরাং পাঠ্যসূচীতে বিষয় বিভাজন অবাস্তব এবং কৃত্রিম। উহা মনস্তত্ত্বসম্মত নয়। সেবাগ্রাম পদ্ধতিতে এজন্য বিষয়-সমন্বয় বা অনুবন্ধনীতিকে গ্রহণ করা হয়।

একটি উদাহরণের দ্বারা এই পদ্ধতি সহজে বুঝে নেওয়া যাক। 'চরকায় সুতো কাটা'—এ শিল্পটি বুনিয়াদী শিক্ষার কেন্দ্রে আছে। এই কাজটি সম্পাদনের সংগে অনুবন্ধনীতি অনুসারে অন্যান্য সকল প্রাসংগিক বিষয়

সম্বন্ধে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অর্জন করবে। কোন্ জমিতে কিভাবে তুলোর বীজ বপন করতে হয়, কিভাবে জমি চাষ করতে হয় ইত্যাদি তারা শিখবে। এভাবে তারা কৃষিবিদ্যা (Agriculture) সম্বন্ধে জ্ঞান পেল। তারপর কোন্ কোন্ দেশে তুলো জন্মায়, সে দেশের আবহাওয়া, মাটির ধর্ম বা উপাদান এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক বিষয়াবলীর শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা ভূবিদ্যা (Geology) এবং ভূগোলের (Geography) জ্ঞান অর্জন করবে। তারপর একই নীতিতে তুলোর গাছ সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর জ্ঞান জন্মান যেতে পারে। এভাবে শিক্ষার্থীরা উদ্ভিদ্‌বিদ্যা (Botany) সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করবে। তারপর সুতো তৈরীর সংগে মানুষের এবং সমাজের ইতিহাসের ক্রমোন্নতির সহিত পরিচয় করিয়ে দেওয়া যেতে পারে, তখন শিক্ষার্থীরা ইতিহাস (History) ও সমাজতত্ত্বের (Sociology) কাহিনী এবং ব্যাখ্যা শিখবে। অর্থাৎ চরকায় সুতো কেটে বস্ত্রবয়ন করার সংগে শিক্ষার্থীরা অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করবে।

কিন্তু অনুবন্ধ নীতির কয়েকটি গুরুতর অসুবিধা রয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষার কেন্দ্রে একটি মাত্র শিল্পকে রাখা হয়েছে আর সেই শিল্প হচ্ছে কুটিরশিল্প। এই কেন্দ্রীয় শিল্পটি সকল শিক্ষার্থীর কাছে আকর্ষণীয় এবং আগ্রহ-সঞ্চারী নাও হতে পারে। সুতরাং শিল্প-সম্পাদনের মাধ্যমে শিক্ষাদান এবং শিক্ষার্থীর দেহ-মনের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি দুই-ই ব্যর্থ হবার আশংকায় শিক্ষিত সমাজের কেহ কেহ এ শিক্ষার সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। অথচ যান্ত্রিক সভ্যতার সম্প্রসারণ একদিন যে ভারতের দারিদ্র্য মোচনে প্রচুর সহায়তা করবে, এ বিশ্বাস অনেকেরই ছিল। কাজেই, একক শিল্পকে কেন্দ্র করে প্রাসংগিক বিষয়ের শিক্ষাদান অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার বলে শুরুতেই ধরা পড়ে। তাই সেবাগ্রাম পদ্ধতিতে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এক্ষণে সেগুলির আলোচনা করব :

প্রথমতঃ, শিক্ষার কেন্দ্রে একটিমাত্র শিল্পকে আজ আর উপস্থাপিত করা হয় না। গ্রামীণ এবং যান্ত্রিক শিল্পগুলিকে যথাসম্ভব শিক্ষার কেন্দ্রে রাখার ব্যবস্থা হচ্ছে। সুতরাং কুটিরশিল্পের একঘেয়েমি বা তার প্রতি শ[illegible] যে অবজ্ঞা ছিল, যান্ত্রিকশিল্প সংযোজন করার ফলে সেবাগ্রাম পদ্ধতি সে ত্রুটি থেকে আজ মুক্ত। গান্ধীজীর মূলনীতির সংগে এ পরিবর্তনের কোন বিরোধ নেই।

গান্ধীজীর মূল বক্তব্য ছিল শিল্পকে কেন্দ্র করে শিক্ষাদান করা চাই। পরিণত বয়সে শিক্ষার্থী একে তার জীবনের বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে পারে আর সক্রিয়তার দ্বারা যে শিক্ষা সে গ্রহণ করবে তা হবে জীবনধর্মী, বাস্তবানুগ, দেহ-মনের স্বাস্থ্য-বিধায়ক।

দ্বিতীয়তঃ, বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থায় বর্তমানে কেবলমাত্র শিল্পকেই শিক্ষা কেন্দ্রে রাখা হয় না। অন্যান্য কর্মমূলক অনুষ্ঠানকেও শিক্ষাদান পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হয়। শিল্প-সম্পাদনের চাইতে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তার উপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীর কর্মমূলক আচরণ বা সক্রিয়তা শুধু শিল্প সম্পাদনেই সীমাবদ্ধ নয়, উহা আরও ব্যাপক। ব্যাপক কর্মমূলক আচরণগুলিকে শিক্ষার কেন্দ্রে উপস্থাপিত করার ফলে অনুবন্ধ নীতি অনুসারে শিক্ষাদান আরও সহজ ও সাবলীল হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ সেবাগ্রাম পদ্ধতিতে 'গ্রামপরিদর্শন' কাজটি ধরা যাক্। 'গ্রামপরিদর্শন'কে কেন্দ্র করে অনুবন্ধনীতির সাহায্যে অন্যান্য প্রাসংগিক বিষয়গুলি শেখান যেতে পারে। কথাবার্তা ও তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে ভাষার প্রয়োজন—তাই শিক্ষার্থীরা প্রথমে ভাষা শিখবে। গ্রামের ইতিহাস আলোচনা, জনসংখ্যার বিবরণ, তাদের আচার-আচরণ, ধর্মবোধ, নীতিবোধ প্রভৃতি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শুধু ভাষাই শিখবে না—সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, অর্থনীতি, ভূগোল প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধেও জ্ঞান অর্জন করবে। গ্রামের জমির পরিমাণ, কৃষকরা কে কত জমি চাষ করে, কি কি চাষ করে এসব তথ্য সংগ্রহ এবং নারী-পুরুষের অনুপাত নির্ণয় প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শুধু গণিত সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করবে না, কৃষিকার্য সম্বন্ধেও তথ্য সংগ্রহ করবে।

বুনিয়াদী শিক্ষা-কেন্দ্র থেকে শিল্পের গুরুত্ব অপসারণের ফলে এ শিক্ষা-পদ্ধতিতে কেবলমাত্র শিল্প-কেন্দ্রিক (Craft centred) শিক্ষাদান পদ্ধতি বলে অভিহিত করার কোন যুক্তি নেই। একে কর্ম-কেন্দ্রিক (activity centred) শিক্ষাদান পদ্ধতি বলা চলে। ব্যাপক কর্মমূলক আচরণকে শিক্ষা-কেন্দ্রে উপস্থাপিত করার ফলে সেবাগ্রাম পদ্ধতিও শিক্ষার্থীদের কাছে বৈচিত্র্যময়, অধিকতর আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। শিক্ষার্থীর সক্রিয়তাকে অনুবন্ধের কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করার ফলে শিক্ষাদান পদ্ধতি শুধু সহজ হয়নি, অধিকতর গতিশীলও হয়েছে। কর্মমূলক অনুষ্ঠান ছাড়াও সামাজিক এবং প্রাকৃতিক পরিবেশকে কেন্দ্র করেই বর্তমানে শিক্ষাদানের চেষ্টা চলছে।

সেবাগ্রাম পদ্ধতির সমালোচনা (Criticism of Sevagram Method) : মহাত্মা গান্ধী যে সময় পরাধীন ভারতবর্ষে তাঁর এই শিক্ষার পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন, সেই সময় ভারতবর্ষে কোন বৃত্তি (Vocation) শিক্ষার সুব্যবস্থা ছিল না, এমনকি প্রাথমিক শিক্ষার কোন সুসংহত সংগঠন ও পাঠ্যসূচীও ছিল না। সেদিনকার পরাধীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় দেশের জনগণের প্রতি কোন বিবেচনা (Consideration) ছিল না, ভারতের অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক অবস্থার প্রতি গভীর ঔদাসীন্যই ছিল ইংরেজ সরকার সমর্থিত ও প্রচারিত শিক্ষাব্যবস্থায়। গান্ধীজী স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতের তদানীন্তন অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় চরিত্র সৃষ্টি ও আত্মনির্ভরশীলতা (National Character and Self-dependence) জাগ্রত করার জন্য বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। এজন্যই তাঁর ওয়ার্ধা পরিকল্পনাকে জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা (National Educational Programme) বলা হয়।

ওয়ার্ধা পরিকল্পনার মৌলিক নীতি সম্বন্ধে অনেকেই তীব্র সমালোচনা করছেন। এ কথা সত্য যে, শিল্পের (Craft) মাধ্যমে বা কর্মমূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থী যদি সক্রিয়ভাবে শিক্ষা গ্রহণ করে, তবে তার শিক্ষা হয় জীবনধর্মী ও বাস্তবানুগ। কিন্তু এই পরিকল্পনায় শিক্ষাদান পদ্ধতিতে অনুবন্ধ নীতিকে গ্রহণ করার ফলে এই নীতির সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। প্রথমতঃ, এই নীতিকে শিক্ষাদান পদ্ধতিতে অনুসরণ করতে হলে প্রয়োজন শিক্ষকের ব্যাপক এবং দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা আর প্রতিভা। এ ধরনের শিক্ষক সকল যুগে দুর্লভ। দ্বিতীয়তঃ, বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে একটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়ার নীতিই যুক্তিসম্মত। মানুষের অর্জিত অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের ভাণ্ডার এত গভীর এবং বিশাল যে অনুবন্ধনীতি অবলম্বনে সকল বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়।

গান্ধীজীর পরিকল্পনায় উৎপাদনাত্মক শিল্পকে গ্রহণ করা হয়েছে এজন্য যে, শিক্ষার্থী উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করে শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করবে। উহা বাস্তবে কতটুকু সাফল্য লাভ করেছে এবং করবে তা গভীর তর্কসাপেক্ষ। তাছাড়া, এ ধরনের ধারণা বিদ্যালয়কে একটি কারখানায় (Factory) পরিণত করবে। অর্থকরীবিদ্যার প্রতি জীবনের শুরুতে গভীর আগ্রহ জন্মালে গান্ধীজীর অভিপ্রেত মানবিক মূল্যবোধের চর্চা কমই হবে।

এই পরিকল্পনায় কোন্ ধরনের শিল্প বা কর্মকে অনুসরণ করে শিক্ষা দেওয়া হবে তা শিক্ষকরা স্থির করে থাকেন। অথচ, শিক্ষার্থীর এসব ব্যাপারে আগ্রহ নাও থাকতে পারে। কাজেই তার চাহিদাকে এখানে যথাযথ মূল্য দেওয়া হয়নি।

শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে যা শিক্ষালাভ করবে তার সংগে শিক্ষার্থীদের অন্তরের যোগ থাকা চাই, পরিণত জীবনেও এসবের প্রভাব থাকা চাই। কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা যা শেখে দ্রুত সঞ্চরণশীল যান্ত্রিক সভ্যতার সামাজিক কাঠামোতে তার সম্পর্ক খুঁজে পায় না। যে ধরনের কৃষিকার্য, মাটিকাটা, রাস্তাঘাট তৈরী ও ঘরদোর পরিষ্কার করার কাজে তারা অভ্যস্ত এবং শিক্ষিত হয়, সামাজিক জীবনে তার মূল্য বেশী নেই। এজন্য এ শিক্ষায় অনেকে যে অনাস্থা প্রকাশ করেন, তা খুব অসংগত নয়।

গান্ধীজী তাঁর পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন পরাধীন ভারতের শাসন ব্যবস্থা ও সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। একটি বিগত যুগের ত্রুটিপূর্ণ সামাজিক অবস্থাকে কেন্দ্র করে যে শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিকল্পনা তৈরী হয়েছিল তাকে শিশু-শিক্ষার মৌলিক নীতি বলে বর্তমানে স্বীকৃতি দিলেও প্রয়োজন মত তার পরিবর্তন প্রয়োজন।

এজন্য আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি, প্রচুর রাষ্ট্রীয় সমর্থন এবং অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও বুনিয়াদী শিক্ষা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। আর যে সব স্থানে এ পরিকল্পনাকে গ্রহণ করা হয়েছে, প্রায় গতানুগতিক পদ্ধতিতেই সেখানে শিক্ষাদান চলছে।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the logical and Psychological methods of teaching.
2. Discribe the Project Method and comment on its basic principles
3. What do you understand by Activity Methods in education and individualised instruction ?
4. Discuss briefly Kindergarten System and Montessori Method and add your criticism, if any.
5. Discuss briefly the contributions of Dalton Plan, Batavia System, Winnetka Plan and Decroly System towards the cause of improvement of better methods of teaching.
6. Enumerate the main principles underlying the scheme of education profounded by Mahatma Gandhi.
7. Critically consider the value of the Sevagram Method of education.
8. 'Sevagram Method is activity-centred and not craft-centred.'—Discuss.

দ্বাদশ অধ্যায়

শিক্ষাতত্ত্বে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্‌দের অবদান
(Contribution of some Educators to Educational Theory and Practice)

আধুনিক শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার জনক
জ্যঁা জ্যঁাক রুশো

জ্যঁা জ্যঁাক রুশো (*Jean Jacques Rousseau*—১৭১২—১৭৭৮ খ্রীঃ) : অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের ইতিহাসে এক স্মরণীয় পুরুষ। ধর্ম, রাজনীতি, সাহিত্য, শিক্ষা প্রভৃতি চিন্তার রাজ্যে রুশোর অবদান অসীম। আধুনিক যুগের সকল চিন্তাধারার একটা বলিষ্ঠ প্রকাশ রুশোর মধ্যেই আমরা প্রথম লক্ষ্য করি।

কিন্তু রুশোর প্রতিভার প্রভাব শিক্ষানীতিতে সম্ভবতঃ প্রবলতম। তাঁকে আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের—বিশেষভাবে শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার জনক বলা যেতে পারে।

১। গতানুগতিক বা প্রচলিত শিক্ষার সংগে রুশোর মতভেদ (Rousseau's conflict with conventional education) :

গতানুগতিক শিক্ষার মধ্যে রুশো দেখেছেন ব্যক্তি-স্বাধীনতার অনুপস্থিতি, কৃত্রিমতা, বিকৃতি এবং সংকীর্ণতা। সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম প্রভৃতি তাদের কৃত্রিম নিয়মের দ্বারা মানুষকেও কৃত্রিম করে তুলেছে। সভ্যতার নামে মানুষ প্রকৃতির কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আর এ কৃত্রিম সভ্যতা মহৎ, সুন্দর এবং সৎ মানব-প্রকৃতিকে তার যান্ত্রিক, অন্তঃসারশূন্য কতকগুলি রীতি-নীতি ও প্রথার প্রাচীরে আবদ্ধ রেখেছে। তাই তথাকথিত শিক্ষাও কতকগুলি বাক্‌চাতুর্য এবং তর্ককুশলতায় পূর্ণ। এ ধরনের সামাজিক, সভ্য, শিক্ষিত মানুষের জীবনে রুশো মানবতার অধঃপতন (degradation) লক্ষ্য করেছেন। তাই তিনি আদিম মানুষকে গৌরবান্বিত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে তারা অসভ্য ছিল না, তারা ছিল 'মহৎ আদিম মানুষ' (noble savage)। চিরাচরিত কৃত্রিম সামাজিক প্রথার বিলোপ সাধন করবার জন্য রুশো বলেছেন :

"প্রচলিত ধারায় যা করা হয়, ঠিক তার বিপরীত কাজ করবে, তা হলেই তুমি ঠিক কাজটি করবে।" এ ধরনের চিন্তাধারা সম্পূর্ণ বৈপ্লবিক। আর তাঁর শিক্ষাদর্শনও এই বৈপ্লবাত্মক চিন্তাপ্রসূত।

প্রাচীন শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে মন্তব্য করে রুশো বলেন: প্রাচীন শিক্ষা শিশুর ওপর গতানুগতিক বা প্রচলিত চিন্তার অভ্যাস, কর্মের অভ্যাস—এমন কি প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়াও জোর করে চাপিয়ে দিয়ে শিশুর প্রকৃতিকে পুনর্গঠন করত। শিশুর প্রকৃতিগত আচরণের মূল্যকে উপেক্ষা করে ধর্মীয়, বুদ্ধিগত এবং সামাজিক আকারসর্বস্ব (formalistic) কতকগুলি কৃত্রিম আচরণকে মূল্য দেওয়া হত। রুশো তাঁর 'এমিল' (Emile) গ্রন্থের শুরুতে লিখেছেন: "প্রকৃতির স্রষ্টার হাত থেকে যা কিছু আসে তাই ভাল, মানুষের হাতে সব কিছুই বিকৃত হয়ে যায়।"[1] ইহাই রুশোর শিক্ষাতত্ত্বের মর্মবাণী।

দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীন শিক্ষা শিক্ষার্থীর শৈশবকে জ্ঞান অর্জনের জন্য বিসর্জন দিয়েছে। সে শিক্ষাব্যবস্থায় শিশু ছিল বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের জন্য, পাঠ্য-পুস্তক যে শিশুর জন্য—একথা কল্পনা করাও হয়নি।

তৃতীয়তঃ, প্রাচীন এবং সনাতন শিক্ষক শিশুর কর্ণকুহরে কতকগুলি শব্দ, ইতিহাস বা ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ের কতকগুলি কথাকে প্রবেশ করিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর কোন বক্তব্য ছিল না তার শিক্ষায়।

চতুর্থতঃ, শিক্ষাকে সেদিন ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি বলে গণ্য করা হত। শৈশবকে যদিও ভবিষ্যত জীবনের একটি স্তর হিসেবে বিবেচনা করা হ্ত, তবুও শৈশব ছিল যন্ত্রণাদায়ক এবং গুরুত্বহীন।

পঞ্চমতঃ, শৈশবকে 'পরিণত মানুষের ক্ষুদ্র সংস্করণ' (Miniature Adult) বলে কল্পনা করা হত। যে চাহিদা ও আগ্রহের দ্বারা পরিণত বয়স্ক মানুষ পরিচালিত হয়, শিশুর জীবনেও অনুরূপ চাহিদা ও আগ্রহ থাকে—এ ধরনের অযৌক্তিক কল্পনা ছিল সেদিনকার শিক্ষাব্যবস্থার মূলে। মনরো (*Monroe*) উপহাস করে বলেছেন: রুশোর পূর্ববর্তীকালে শিশু ছিল দূরবীণের ভ্রান্ত দিক থেকে দেখা নিছক একটি বয়স্ক মানুষ।[2]

---

1. "Every thing is good as it leaves the hands of the author of nature, every thing degenerates in the hands of man."

2. "Previous to Rousseau's period the child was merely the adult viewed through the wrong end of telescope."

তাই রুশো 'এমিল' গ্রন্থের প্রস্তাবনায় বলেন: আমরা শিশুর মধ্যে সর্বদাই পূর্ণ বয়স্ক মানুষকে খুঁজে থাকি, কিন্তু একটিবার ভেবেও দেখি না যে, পরিণত বয়সের মানুষটি হবার আগে সে শিশুটি কে? রুশো তাই ঘোষণা করেন: প্রকৃতির (Nature) ইচ্ছা, শিশুরা পরিণত বয়সের মানুষ হবার আগে শিশুই থাকবে।

তাছাড়া, প্রাচীন শিক্ষা শুধু অস্তিবাচক (Positive)। প্রাচীনের বিশ্বাস ছিল শিশুরা কতকগুলি আদিম পাপ প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মে। তাই তাদের চরিত্রে অভীপ্সিত পরিবর্তন ও আচরণ সৃষ্টি হল শিক্ষার কাজ। রুশো এ ধরনের কোন বিশ্বাসকে তাঁর শিক্ষাদর্শনে আমল দেননি। তিনি বলেন, শিশু সৎ এবং তার আদিম প্রকৃতি অকলুষিত। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে তার স্বাধীনতা থাকা চাই। অস্তিবাচক শিক্ষা শিশুর স্বাধীনতাকে অপহরণ করে, শিশুর জীবনে বয়স্কদের অভিলাষ জোর করে চাপিয়ে দেয়। এই অস্তিবাচক শিক্ষার পাঠ্যসূচীতে সমাজের চাহিদার প্রকাশ ঘটে। বয়স্ক মানবসম্প্রদায়ের অভিরুচিই অস্তিবাচক শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করে। শিশু থাকে সে শিক্ষায় অবহেলিত, অভুক্ত এবং অবিবেচিত। রুশো তাই বলেন: 'যে বিষয়ের ওপর কাজ করতে যাচ্ছ তাকে প্রথম জানবার চেষ্টা কর।' রুশোর এই আবেদনের ফলে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থী বা শিশুকেই আগে অধ্যয়ন করার চেষ্টা চলছে। শিশুকে শিক্ষা দেবার আগে শিক্ষকের সর্বপ্রধান এবং সর্বপ্রথম কাজ হল শিশুকে জেনে নেওয়া। শিক্ষার জগতে রুশোকে কপারনিকাসের সংগে (*Copernicus*) তুলনা করা হয়। কপারনিকাস্ পৃথিবীকে বাদ দিয়ে সূর্যকেই সৌরজগতের কেন্দ্র বলে ঘোষণা করেন। আর রুশো প্রাচীন বা বয়স্ক মানবসমাজকে বাদ দিয়ে শিশুকেই কেন্দ্র বলে ঘোষণা করেন শিক্ষা-ব্যবস্থায়। এভাবে ফরাসী বিপ্লবের একজন অগ্রদূত রুশো মানুষের শিক্ষা জগতেও নতুন বিপ্লবের বাণী বহন করে আনেন।

২। প্রকৃতিবাদ বা স্বভাববাদ (Naturalism):

রুশো তাঁর শিক্ষাতত্ত্বে শিশুর প্রকৃতি বা স্বভাবের উপরেই গুরুত্ব দিয়েছেন। বলাবাহুল্য, তিনি প্রকৃতিবাদের একজন প্রধান প্রবক্তা। কিন্তু প্রকৃতিবাদের দার্শনিক ব্যাখ্যা নিয়ে রুশো চিন্তা করেননি। তিনি শিক্ষাকে বিশেষ একটি

দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করেছেন। শিশু-শিক্ষার নিয়ন্ত্রক হবে শিশুর স্বভাব, তার প্রকৃতি। রুশোর শিক্ষাতত্ত্বে প্রকৃতিবাদের অর্থ হল : শিশুর শিক্ষা হবে প্রকৃতি অনুযায়ী। অর্থাৎ শিশুর শিক্ষা তার প্রকৃতিকে অনুসরণ করবে, এক কথায় শিক্ষা হবে স্বাভাবিক। শিশু তার স্বাভাবিক সহজাত প্রবৃত্তি ও আগ্রহের মাধ্যমেই শিক্ষাকে গ্রহণ করবে।

রুশো তাঁর 'এমিল' গ্রন্থে 'প্রকৃতি' শব্দকে খুব ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছেন। এমিল একটি মানব-শিশু। তাকে তার সমাজ, পিতামাতা, শিক্ষক এবং অন্যান্য সকল কৃত্রিম প্রভাবশালী বস্তুর কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে একজন আদর্শ শিক্ষকের অধীনে রাখা হল। দেখা গেল, একটি স্বাধীন পরিবেশে শিশু ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং সকল প্রকার ভাবসম্পদের ঘনিষ্ঠতা লাভ করল এবং তার শিক্ষা গ্রহণ হল সার্থক। শিশু তার প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষা লাভ করেছে বলেই সে সার্থক শিক্ষা গ্রহণে সমর্থ হয়েছে। এই প্রকৃতিকে রুশো ব্যাপকভাবে তিনটি অর্থে তাঁর শিক্ষাতত্ত্বে প্রয়োগ করেছেন : মনস্তাত্ত্বিক প্রকৃতি, জীবতত্ত্বমূলক প্রকৃতি ও বস্তুজাগতিক প্রকৃতি।

(ক) মনস্তাত্ত্বিক প্রকৃতি (Psychological Nature) : রুশো মনস্তাত্ত্বিক প্রকৃতি বলতে শিশুর সমস্ত প্রকৃতিদত্ত শক্তি, সম্ভাবনা, আবেগ, আগ্রহ, গ্রহণ-ক্ষমতা ইত্যাদি বুঝাবার চেষ্টা করেন। এসব প্রকৃতিদত্ত বৈশিষ্ট্যতাই শিশুর শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। শিশুর যে বিষয়ে আগ্রহ নেই, কোন চাহিদা নেই, সে বিষয় শিশুকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে না। কিন্তু গতানুগতিক শিক্ষাধারায় শিশুর উপর সমাজের চাহিদার কৃত্রিম প্রভাবই কাজ করে বেশী। অভিভাবক, পিতামাতা বা শিক্ষকের পছন্দ-অপছন্দ, চাহিদা ও রুচি অনুসারে শিশুকে কতকগুলি অভ্যাস ও আচরণ শিখতে হয়। এর ফলে শিশুর জীবন হয় কৃত্রিম। কারণ তাকে যে অভ্যাস ও আচরণ গ্রহণ করতে হয় তার সংগে তার প্রকৃতিদত্ত বৈশিষ্ট্যগুলির কোন সামঞ্জস্য থাকে না। রুশোর বক্তব্য হচ্ছে, শৈশবে শিশুর প্রকৃতিদত্ত শক্তি ও সম্ভাবনার স্বাধীন অব্যাহত বিকাশের সুযোগ দিতে হবে। তাকে তার নিজের কাছেই ছেড়ে দিতে হবে। তার মনস্তাত্ত্বিক প্রকৃতি অনুযায়ী সে নিজেই তার সকল সম্ভাবনার বিকাশ খুঁজবে। রুশো বিশ্বাস করেন, সকল শিশুর সব সহজাত প্রবৃত্তি ও আবেগ সৎ। শুধু সমাজের কৃত্রিমতাই এ সবকে কলুষিত করে তোলে। এজন্য রুশো বলেন :

"একমাত্র অভ্যাস শিশুকে গঠন করতে দেওয়া যেতে পারে, সে হচ্ছে কোন অভ্যাস গঠন না করার অভ্যাস।"[1]

অর্থাৎ একমাত্র শিশুর প্রকৃতিই হবে শিক্ষক। তার নৈতিক, মানসিক বা বুদ্ধিগত সকল প্রকার জ্ঞান আসবে প্রকৃতি থেকে। তার আচরণের স্বাভাবিক ফলাফল (Consequence) থেকেই সে নিজেই সকল প্রকার জ্ঞান আহরণ করবে—'পোড়া শিশু আগুন ভয় করে।' এ প্রবাদ মিথ্যা নয়। শিশু হয়ত জলে ভিজছে, তাকে বাধা দেওয়া হবে না। তারপর অসুস্থ হলে সে নিজেই কষ্ট ভোগ করবে—আর এভাবে আচরণ করবে না। রুশো তাঁর ঐ ধরনের ব্যাখ্যার নাম দিয়েছেন, 'প্রাকৃতিক ফলাফলের তত্ত্ব' (Natural Consequence)। শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত আচরণের ও স্বাধীন কর্মবৃত্তির মাধ্যমেই তার মধ্যে জেগে উঠবে প্রাকৃতিক ফলাফলের শৃংখলা (discipline of natural consequence)।

(খ) **জীবতত্ত্বমূলক প্রকৃতি (Biological Nature)ঃ** রুশো বিশ্বাস করেন, মানব ইতিহাসে এমন একটি অধ্যায় ছিল যখন রাষ্ট্র বা সমাজের কোন অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু ব্যক্তি-মানুষ (Individual man) স্বাধীনভাবে বাস করত। রাষ্ট্র বা সমাজ সৃষ্টি হবার আগে মানব সভ্যতার ইতিহাসকে রুশো বলেছেন, প্রাকৃতিক অধ্যায় বা অবস্থা (Natural State) এবং তখনকার মানুষ ছিল প্রাকৃতিক মানুষ (Natura man)। এই প্রাকৃতিক মানুষের সংগে সমাজ বা রাষ্ট্রের সম্পর্ক কৃত্রিম এবং বহির্জাত। সমাজের সংস্পর্শে তাই প্রাকৃতিক মানুষের আচরণ হয়ে পড়ে বিকৃত, অস্বাভাবিক এবং কলুষিত। সমাজ ও রাষ্ট্রের অনুশাসন প্রাকৃতিক মানুষের প্রকৃতিতে কৃত্রিম পরিবর্তন আনে, প্রাকৃতিক মানুষ রাষ্ট্র ও সমাজের নাগরিকে পর্যবসিত হয়ে আপন জন্মগত স্বাধীনতা হারায়।

মানুষ যখন জন্মে তখন সে যে সহজাত জৈবিক প্রকৃতি নিয়ে পৃথিবীতে আসে, সে প্রকৃতিই তার জীবতত্ত্বমূলক প্রকৃতি। বলা বাহুল্য, এই জীবতত্ত্বমূলক প্রকৃতিই অকৃত্রিম, অবিকৃত এবং বিশুদ্ধ। কিন্তু সমাজের প্রভাব এই প্রকৃতিতে কৃত্রিমতা এনে দেয়। শিক্ষার সাহায্যে সমাজ বা রাষ্ট্র তার অনুশাসন অনুযায়ী জীবতত্ত্বমূলক বিশুদ্ধ প্রকৃতিকে করে কলুষিত। তাই রুশো বলেন, শিশুকে

1. "The only habit that he should form is to form no habit at all."

রাষ্ট্র বা সমাজের সংসর্গ থেকে, সকল প্রকার প্রভাব থেকে দূরে সরিয়ে নিতে হবে। তারপর শিশুর সহজাত প্রকৃতি অনুযায়ী তাকে শিক্ষা গ্রহণে সুযোগ দিতে হবে। সমাজের বা রাষ্ট্রের কোন অনুশাসন বা চাহিদা শিশুর শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করবে না। তখন শিশু যে শিক্ষালাভ করবে তার মধ্যে থাকবে তার স্বাধীনতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ। এ শিক্ষাকে রুশো নাম দিয়েছেন, নেতিবাচক শিক্ষা (Negative Education)।

(গ) বস্তুজাগতিক প্রকৃতি (Physical Nature) : মানুষকে ঘিরে যে বস্তুজগৎ বর্তমান সেই মূর্ত প্রকৃতি হল রুশোর শিক্ষাতত্ত্বে বস্তুজাগতিক প্রকৃতি। একে তিনি প্রাকৃতিক পরিবেশও (Natural envircnment) বলেছেন। এই পৃথিবীর আকাশ-বাতাস, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, গাছ-পালা, রোদ-জল-বৃষ্টি, মাটি-পাথর, পশু-পক্ষী সব কিছু মিলে প্রাকৃতিক পরিবেশ বা বস্তুজাগতিক প্রকৃতি। রুশো বলেন, শিশু এই মুক্ত পরিবেশ থেকে তার শিক্ষা গ্রহণ করবে, বস্তুজাগতিক প্রকৃতির সংগে ঘনিষ্ঠ সংযোগ সাধনের দ্বারা শিশুর ইন্দ্রিয়ানুশীলন হবে। গতানুগতিক শিক্ষা শিশুর ইন্দ্রিয়ানুশীলনের উপর মোটেই গুরুত্ব দেয়নি। বুদ্ধি চর্চার উপরই ছিল সে শিক্ষার পূর্ণ আস্থা। কিন্তু রুশো বিশ্বাস করেন, আমাদের বুদ্ধি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভরশীল এবং শৈশবই হল বুদ্ধির ঘুমন্ত অবস্থা। সুতরাং প্রকৃতির সংগে আমাদের যোগ থাকা চাই। শিশু তার পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রকৃতির প্রভাবকে অনুভব করবে, সকল অভিজ্ঞতা আহরণ করবে। প্রকৃতিই হবে তার শিক্ষক এবং প্রকৃতির মুক্ত পরিবেশ হবে তার বিদ্যালয়।

রুশো তাই আমাদের প্রকৃতিতে ফিরে যেতে বলেছেন। তার কাছে স্বাভাবিক পল্লীজীবনই মর্যাদা পেয়েছে বেশী। শহুরে জীবন কৃত্রিম, প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে বঞ্চিত, প্রকৃতির প্রশান্ত প্রভাব, বিশুদ্ধভাব এবং উদারতা এখানে অনুভব করা যায় না। তাঁর ভাষায় শহর হচ্ছে মানব জাতির কবর স্থান। ঘর-বাড়ি-দালান এবং অন্যান্য কৃত্রিম উপকরণের চাইতে শিশু-শিক্ষায় প্রকৃতির মুক্ত মাঠ, ঘাস, গাছ-পালা ইত্যাদির প্রয়োজন ও প্রভাব শিশুর জীবনে ঢের বেশী।

রুশোর এ ব্যাখ্যা থেকে জন্ম নিয়েছে তাঁর শিক্ষাতত্ত্বের একটি প্রধান মৌলিক নীতি : কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা (Education through doing)।

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে শিশু যে অভিজ্ঞতা আহরণ করে তার আবেদন শিশু-মনে গভীর। শিশু 'এমিল'কে কোন শিক্ষা দিতে হবে না। সে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান সংগ্রহ করবে। ইন্দ্রিয়ানুশীলনই তার জীবনকে সক্রিয় করে তুলবে, আর সক্রিয়তা ও কর্মের মাধ্যমে সে শিক্ষা লাভ করবে।

৩। নেতিবাচক শিক্ষা (Negative Education) ঃ

রুশো তাঁর শিক্ষাতত্ত্বে শিক্ষাকে সকল প্রকার সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বহির্ভূত করে রাখার কথা বলেছেন। শিশুর শিক্ষা হবে প্রকৃতি অনুযায়ী কিন্তু গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় রাষ্ট্র, সমাজ, অভিভাবক বা শিক্ষকের প্রভাবই বেশী। এ ধরনের শিক্ষা শিশুর স্বাধীনতাকে অপহৃত করে, তার সক্রিয়তাকে দমিত করে, তার প্রকৃতিকে অস্বীকার করে। এ শিক্ষার দ্বারা সমাজের বয়স্করা শিশুর জীবনে তাদের অভিরুচি অনুসারে কৃত্রিম পরিবর্তন সাধন করেন, কৃত্রিম আচরণ সংযোজন করেন। রুশো তাঁর ভাষায় গতানুগতিক শিক্ষাকে ভ্রান্ত বলে সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে গতানুগতিক শিক্ষা অস্তিবাচক (Positive Education)। এ শিক্ষার স্থলে তিনি নেতিবাচক শিক্ষা (Negative Education) প্রবর্তন করতে চেয়েছেন।

নেতিবাচক শিক্ষার অর্থ এই নয় যে শিশুর কোন শিক্ষার প্রয়োজন নেই। নেতিবাচক শিক্ষার অর্থ কোন আলস্যের কাল নয়। আমাদের তথাকথিত গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় গৃহীত শিক্ষানুশীলন থেকে আলাদা এক শিক্ষাব্যবস্থা হচ্ছে নেতিবাচক শিক্ষা। আমাদের গতানুগতিক প্রাচীন শিক্ষায় বিশ্বাস করা হত শিশু জন্মে কতকগুলি পাপ প্রকৃতি নিয়ে। শিশুর আদিম প্রকৃতি বর্বর। তাই কঠোর শাসন ও শৃংখলার দ্বারা তার চরিত্রকে, তার আচরণকে শোধন করে নিতে হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিশুর আদিম প্রকৃতিকে সংযত করা। কিন্তু রুশো এ ধরনের ব্যাখ্যাকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, শিশুর আদিম প্রকৃতি মহৎ, এই আদিম প্রকৃতি সমাজের সংস্পর্শে এসেই কলুষিত হয়ে যায়।

সুতরাং রুশো বলেন, শিশু যদি স্বভাবতঃ মহৎ হয়েই জন্মে, তার সহজাত প্রবৃত্তি, আবেগ, অনুরাগ, অনুভূতি যদি সৎ থাকে তবে তার স্বাধীন বিকাশে কোন বাধা-নিষেধের প্রয়োজন নেই। বুদ্ধিগতভাবে নেতিবাচক শিক্ষার অর্থ হল, শিশুশিক্ষায় কোন পুস্তক পাঠের প্রয়োজন নেই, শিশু কেবলমাত্র

অভিজ্ঞতা আহরণের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করবে। অর্থাৎ ভাষামূলক শিক্ষার পরিবর্তে ইন্দ্রিয়-ভিত্তিক শিক্ষার প্রয়োজন। পুস্তক পাঠকে রুশো শৈশবের অভিশাপ বলে বর্ণনা করেছেন। তার পরিবর্তে শিশু-মনে শিক্ষার কৌতূহল সৃষ্টি করাই শ্রেয়, তখন শিশু নিজেই শিখবে। রুশোর বক্তব্য হচ্ছে, শিশু একটি পাঠ পড়ে কিছুই শেখে না। শিক্ষার্থীর সামনে আগ্রহ উপস্থিত কর, একমাত্র আগ্রহই মূল শক্তি (motive power) যা আমাদের দূরে নিরাপদে নিয়ে যেতে পারে।[1]

অস্তিবাচক শিক্ষা প্রসংগে রুশো বলেন, উহা অসময়ে অপরিণত মনকে সংগঠিত করার প্রয়াস পায়; উহা শিশুকে এমন কতকগুলি কর্তব্যের শিক্ষা প্রদান করে—যে কর্তব্যগুলি বয়স্কদের। নেতিবাচক শিক্ষার ব্যাখ্যা প্রসংগে রুশো বলেন, নেতিবাচক শিক্ষা প্রত্যক্ষভাবে কোন জ্ঞান প্রদানের পূর্বে শিক্ষার্থীর অংগ-প্রত্যংগকে পরিস্ফুট করতে চেষ্টা করে, আর এই অংগ-প্রত্যংগই হল শিশুর জ্ঞানের উপকরণ (instrument)।[2]

সুতরাং নেতিবাচক শিক্ষা শিক্ষার অভাব নয়। রুশো নিজেই বলেছেন: নেতিবাচক শিক্ষা কোন আলস্যের কাল (period of idleness) বোঝায় না। এ সময়ে শিশুর শিক্ষা হবে শিশুর প্রকৃতি ও আগ্রহের স্বাধীন বিকাশের মাধ্যমে। নেতিবাচক শিক্ষায় শিশুর দেহ ও অংগ-প্রত্যংগের সঞ্চালন, ইন্দ্রিয়ানুশীলন প্রভৃতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিশুকে খোলা মাঠে বিচরণ করতে দাও, তার খেয়ালখুশিমত প্রাকৃতিক পরিবেশে ছেড়ে দাও, তার স্বাধীন কর্মবৃত্তিকে বাধা দেবে না, তবেই শিশু শিখবে। কৃত্রিম পাঠ্যসূচীর মাধ্যমে কৃত্রিম পরিবেশে শিক্ষক যে শিক্ষা দেন তার ফলেই শিশু-মনে নীচ প্রবৃত্তি জেগে ওঠে। শিশুকে শিক্ষা দেবার একমাত্র নীতি হল তাকে কোন শিক্ষা প্রদান না করা। তার মানসিক ও দৈহিক আচরণের স্বাধীন বিকাশের সুযোগ দিলেই সে শিখবে। শিশুর ইন্দ্রিয় পরিস্ফুট হবার সাথে তার যুক্তি বিচারের ক্ষমতা জেগে ওঠে। রুশোর মতে, শৈশবই হল বুদ্ধির ঘুমন্ত অবস্থা। আর বুদ্ধি ইন্দ্রিয়-ভিত্তিক। সুতরাং ইন্দ্রিয় চর্চার মাধ্যমে শিশু

1. "Present interest—this is the motive power—the only motive power which takes us far and safely."

2. "I call a positive education one that tends to form the mind prematurely and to instruct the child in the duties that belong to a man. I call negative education one that tends to perfect the organs that are the instruments of knowledge before giving this knowledge directly ;..."

মনে আপনিই বিচার বুদ্ধি জাগ্রত হবে, যদিও কোন ভাষামূলক শিক্ষা বা বুদ্ধির অনুশীলন নেতিবাচক শিক্ষায় নেই।

নেতিবাচক শিক্ষায় শিশুর সর্বাংগীণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। পিতামাতা, অভিভাবক, শিক্ষক, সমাজ সব কিছুর প্রভাব থেকেই শিশু তখন মুক্ত। শিশুর চাহিদা ও আগ্রহই প্রধান। তার স্বাধীন আচরণে কোন বাধা সৃষ্টি করা হয় না। নেতিবাচক শিক্ষা কোন সদ্‌গুণ প্রদান করে না বটে, কিন্তু মন্দ গুণ থেকে রক্ষা করে, উহা শিশু মনে কোন সত্য সঞ্চার করে না বটে, কিন্তু উহা মিথ্যা থেকে তাকে রক্ষা করে। এ শিক্ষা শিশুর যখন বোঝার মত বয়স হয়, তখন যাতে সত্যকে নিজেই লাভ করতে পারে সে পথেই তাকে এগিয়ে দেয়; এ শিক্ষা শিশু যখন সৎকে চেনবার ও ভালবাসার ক্ষমতা লাভ করে তখন যাতে নিজেই সদ্‌গুণ লাভ করতে পারে সে পথেই এগিয়ে দেয়।

রুশোর নেতিবাচক শিক্ষায় প্রকৃতিই শিক্ষার প্রথম সোপান এবং প্রধান শিক্ষক। গতানুগতিক আকার সর্বস্ব শিক্ষার পরিবর্তে তিনি স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত শিক্ষার প্রবর্তন করতে চেয়েছেন। রুশো বলেন, আমাদের তিন ধরনের শিক্ষক বর্তমান, প্রকৃতি (nature) মানুষ (man) ও বস্তু (things) এবং এরা পরস্পর পরস্পরের উপরে সহযোগিতার সংগে প্রতিক্রিয়া করে। এই তিন ধরনের শিক্ষকের শিক্ষার মধ্যে সংগতি সাধন করা চাই এবং এ সামঞ্জস্য বিধানের দ্বারাই শিক্ষা হয় পূর্ণ এবং সার্থক। কিন্তু এখানে একটি কথা স্মরণ রাখা উচিত যে প্রকৃতির উপর আমাদের কোন নিয়ন্ত্রণের অধিকার নেই, মানুষ ও বস্তুর উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ থাকতে পারে। সুতরাং আমাদের শিক্ষা প্রকৃতির অনুগত হবে অর্থাৎ শিক্ষা হবে প্রাকৃতিক (natural)। কিন্তু গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় ঠিক বিপরীত কথাই বলা হয়েছে। সেখানে যে-প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করা যায় না, মানুষ ও বস্তুর দ্বারা তাকে নিয়ন্ত্রিত করার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়েছে।

৪। শিক্ষাদান পদ্ধতি ও শিক্ষার উদ্দেশ্য (Method of teaching and aim of education):

রুশো বলেন, শিক্ষা হল শিশু-উদ্যান পরিচালনা। জমি চাষ করলে চারাগাছ বর্ধিত হয় আর শিক্ষার দ্বারা মানব শিশুর বিকাশ ঘটে। শিক্ষক

অর্থাৎ শিশু-উদ্যানের পরিচালক তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন; প্রথমতঃ, তিনি শিশুকে সকল প্রকার কলুষময় প্রভাব থেকে মুক্ত রাখবেন। দ্বিতীয়তঃ, তিনি শিশুকে একটি শক্তসমর্থ ও স্বাস্থ্যময় দেহ গঠনে সহায়তা করবেন, যার ফলে শিশু যথাযথ ইন্দ্রিয়ানুশীলনের সুযোগ পায়। তৃতীয়তঃ, তিনি শিশুর মনে অনুশীলন ও বিশ্বাসের দ্বারা কর্তব্যবোধ জাগিয়ে তুলবেন। শিক্ষা শিশুর অন্তর থেকেই উৎসারিত হয়, উহা বহির্জাত নয়। সুতরাং শিশুর স্বতঃপ্রণোদিত সকল প্রকার কর্মবৃত্তির বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। রুশো বলেন: বাস্তব জগত ছাড়া আর কোন পুস্তক নেই এবং বাস্তব ঘটনা ছাড়া আর কোন শিক্ষাও নেই।

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রুশো বলেন, পূর্ণ জীবনযাপন (Complete living) হবে শিক্ষার লক্ষ্য। শিক্ষা জীবনের ভবিষ্যৎ কোন অবস্থার প্রস্তুতি নয়, শিক্ষাই জীবন। শিশুর অন্তর্বাসী সহজাত সকল শক্তি ও সম্ভাবনার বিকাশই শিক্ষার লক্ষ্য। শিক্ষা বা জ্ঞানার্জন এ উদ্দেশ্য সাধনের উপায়মাত্র।

৩। মানব জীবনের বিকাশে চারটি পর্যায়ঃ

রুশো মানব জীবনের বিকাশ প্রক্রিয়া অনুযায়ী সমগ্র জীবনকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। শিশুর বয়স বৃদ্ধির সংগে সংগে তার দেহ মনে বিভিন্ন আবেদন উপস্থিত হয়। সুতরাং তার শিক্ষাও সেভাবে পরিবর্তিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে। অর্থাৎ শিশুর জীবন বিকাশের গতি অনুসারে শিক্ষাও পরিকল্পিত হবে।

(ক) প্রথম পর্যায়—এক থেকে পাঁচ বছর বয়সঃ প্রথম পর্যায়ে শিশুর ইন্দ্রিয়ানুভূতির অনুশীলন প্রয়োজন। এ পর্যায়ে শিশুকে বহির্জগতের ব্যাপক অভিজ্ঞতা আহরণের সুযোগ দিতে হবে। এ সময়ে শিশুর শিক্ষা হবে শরীরমূলক। খেলাধূলার উপর প্রচুর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। শিশুর স্বাধীন চলাফেরার কোন রকম বাধা সৃষ্টি করা হবে না। এমন কি তাকে আঁটসাট জামা পরিয়ে, অথবা গৃহে আবদ্ধ রেখে তার সহজ অংগ সঞ্চালনে যেন কোন প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা না হয়। এ পর্যায়ে শিশুকে সুস্থ সবল স্বাস্থ্যের অধিকারী করে তোলাই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য। রুশো বলেন: দেহ যত বেশী দুর্বল, উহা তত বেশী আদেশ করে; উহা যত বেশী বলবান, তত বেশী

অনুগত হয়।'[1] অর্থাৎ রুশোর বিশ্বাস, শরীর যত বলবান, উহা তত বেশী মনের অনুগত হবে। সকল প্রকার দুর্বলতা থেকেই দুর্নীতি আসে। শিশু দুর্বল হলেই অপরাধপ্রবণ হয়। সবল হলেই সে সৎ হয়ে পড়ে। শিশুর ইন্দ্রিয়ানুশীলনের (Sense training and Sense experience) জন্য তাকে মুক্ত গ্রামাঞ্চলে নিয়ে যেতে হবে এবং সে যাতে প্রাকৃতিক পরিবেশ গভীরভাবে অনুধাবন করতে পারে তার সুযোগ দিতে হবে। এ সময় যাতে শিশু নিজস্ব ইচ্ছা ও রুচি অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কর্মমূলক আচরণ করতে পারে তার ব্যবস্থা থাকবে।

রুশোর এক থেকে পাঁচ বছর বয়সের শিক্ষা পরিকল্পনাকে শরীরমূলক শিক্ষা (Physical training) বলা যেতে পারে। শিশুর জীবনের এই প্রথম স্তরে কোন মানসিক চর্চা বা নৈতিক জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। শিশুকে কোনরূপ ভাষামূলক শিক্ষাও দেওয়া হবে না। এমনকি রুশো বলেছেন যে, এ স্তরে শিশুকে বেশি কথা বলতে যেন আমরা উৎসাহিত না করি। কারণ, বেশী কথা বলতে শেখা মানে চিন্তা করতে না শেখা।

(খ) দ্বিতীয় পর্যায়—পাঁচ থেকে বার বছর বয়স: রুশো এ পর্যায়কে মানব জীবনের জটিলতম অবস্থা ('the most critical period of human life') বলে বর্ণনা করেছেন এবং দুটো নীতির দ্বারা এ সময়ের শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করার কথা তিনি বলেছেন: একটি নেতিবাচক শিক্ষা এবং দ্বিতীয়টি প্রাকৃতিক ফলাফলের তত্ত্ব।

নেতিবাচক শিক্ষানীতি অনুযায়ী এই স্তরে আমরা শিশুর উপর আমাদের কোন আচরণ, ভাবধারা, বিশ্বাস কোন কিছুই আরোপ করব না। শিশুকে কোন পুস্তক পাঠ করতে দেওয়া হবেনা এবং তার মনকে নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকতে দেওয়া হবে। তাকে শহরের কলুষিত প্রভাব থেকে দূরে গ্রামাঞ্চলে নয়ে যাওয়া হবে, আর সে খালি পা অনাচ্ছাদিত মস্তক এবং খুব অল্প পোশাক পরে খোলা মাঠে প্রান্তরে বেড়াবে। তাকে যেন কোন নৈতিক শিক্ষা না দেওয়া হয়, কেননা তার মন তখনও বিমূর্ত (abstract) চিন্তা করতে শেখেনি। রুশো বলেন, এ সময়ে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য শিশুটি যেন স্বাস্থ্যবান্ প্রাণীতে (healthy animal) পরিণত হয়। এ সময়ে শিশু মুক্ত আকাশের নীচে ব্যায়াম ও অন্যান্য দেহানুশীলনের দ্বারা, খেলাধূলা ও সকল প্রকার স্বাস্থ্যকর

1. "The weaker the body, the more it commands: the stronger it is, the better it obeys'.

আমোদ-প্রমোদের দ্বারা নিজের অংগ-প্রত্যংগকে নিয়ন্ত্রণ করবে। গল্পের মাধ্যমে, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এ সময় শিশু পৃথিবীর জ্ঞান আহরণ করবে।

প্রাকৃতিক ফলাফলের তত্ত্ব অনুসারে শিশুর উপর কোন প্রকার নীতি-জ্ঞান আরোপ করা হবে না। 'এটা কর', 'এটা করনা' এসব কিছুই শিশুকে বলা হবে না। এক কথায় শিশুর স্বাধীন আচরণে ও চাহিদার পরিতৃপ্তিতে কোন বাধা সৃষ্টি করা হবে না। নৈতিক শিক্ষাও তাকে প্রাকৃতিক ফলাফলের মাধ্যমে দিতে হবে। প্রকৃতিই হবে বিচারক। শিক্ষক শিশুকে কোন শাস্তি দেবেন না। শিশু যদি অনবরত জলে ভেজে তবে প্রকৃতিই তাকে শাস্তি দেবে। তার জ্বর হয়ে ঘরে সে আবদ্ধ হয়ে পড়বে। এভাবে নৈতিক নিয়ম ভাঙলেও সে শাস্তি পাবে আপন প্রকৃতির কাছে।

(গ) তৃতীয় পর্যায়—বার বছর থেকে পনের বছর বয়সঃ এ স্তরে শিশুর যৌথ-প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে এবং সে তার প্রতিবেশী সংগী-সাথীদের সংগে মেলামেশার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়ে। সুতরাং এ সময় শিশুকে যৌথভাবে চিন্তা ও কাজ করতে উৎসাহিত করতে হবে। তার ব্যক্তিত্বের সামাজিক দিকটি যাতে সুষ্ঠুভাবে বিকশিত এবং সুপথে পরিচালিত হয়, শিক্ষক এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখবেন। শিশুর এই বয়ঃসন্ধিকালে তার মনে নানা কৌতূহল জেগে ওঠে। সুতরাং তার কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য সকলপ্রকার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। শিশুর কৌতূহলই হবে শিক্ষার পথ নির্দেশক। এতদিন শিশু তার জ্ঞান আহরণের মাধ্যমগুলি জেনেছে, এখন শুরু হবে তার জ্ঞান আহরণ। তার কৌতূহল অনুযায়ী এখন তাকে ভূগোল, ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং অন্যান্য বিষয়াবলী সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে হবে। কিন্তু এসব বিষয় শিশুকে শ্রেণীকক্ষে বসিয়ে বক্তৃতার দ্বারা শিক্ষা দিতে হবে না। পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, ভ্রমণ, গল্প বা বাস্তব ঘটনার সংগে পরিচিতির মাধ্যমে শিশুকে শিক্ষা দিতে হবে। রুশো বলেন, পূর্ববর্তী স্তরগুলিতে শিশু প্রচুর দৈহিক অনুশীলন করেছে, ফলে তার বিচারবুদ্ধি বা মানসিক ক্ষমতার চাইতে দৈহিক ক্ষমতা প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন সে বুদ্ধিগত অনুশীলন করবে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তাকে পুস্তক পাঠে অভ্যস্ত করতে হবে বা অনাবশ্যক বিষয়বস্তুর জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধিগত ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। শুধুমাত্র অত্যাবশ্যক বিষয়ে শিশুকে শিক্ষা দিতে হবে। রুশো নিছক জ্ঞান আহরণ ও

পুস্তককেন্দ্রিক শিক্ষার বিরোধী। এ সময়ে শিশুকে একমাত্র 'রবিনসন্ ক্রুশো' পড়তে দেওয়া যেতে পারে যা পড়ে শিশু আত্মনির্ভরতা, আত্মবিশ্বাস, প্রকৃতি অনুযায়ী জীবনযাপন প্রভৃতি শিখবে এবং এগুলি হবে তার জীবনে সত্যকার মূল্যবান জ্ঞান।

এ পর্যায়ে শিশু তার সামাজিক শিক্ষালাভ করবে এবং অন্যান্য বিষয়ের সংগে একটি শিল্প-ও (trade) শিখবে। তার এ 'শিল্প' শেখার মূলে থাকবে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কারণ। কায়িক পরিশ্রমের প্রতি তথাকথিত ভদ্রসমাজের যে অবজ্ঞা, শিল্প শেখার মাধ্যমে তা দূর হবে এবং শ্রমের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া, এর ফলে সে বিশেষ কর্মে নৈপুণ্য অর্জন করবে, তার দৈহিক অনুশীলন হবে এবং এ শিল্প তার জীবিকানির্বাহে তাকে সহায়তা, করবে।

(ঘ) চতুর্থ পর্যায়—পনের বছর থেকে বিশ বছর বয়স: বয়ঃসন্ধির এই শেষ পর্যায়ে শুরু হবে মস্তিষ্কের শিক্ষার সংগে হৃদয়ের শিক্ষা। এতদিন শিশু এমিলকে তার দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মস্তিষ্কের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আর এজন্য তার শিক্ষা ছিল আত্মকেন্দ্রিক এবং আত্মসীমিত। আত্ম-প্রেম, আত্ম-পূর্ণতা, আত্ম-বিকাশ—এই হল পূর্ববর্তী স্তরগুলির শিক্ষার মূলনীতি। কিন্তু এখন শিশুকে যে জীবনের শিক্ষা দেওয়া হবে, সে জীবন তার আত্মকেন্দ্রিক জীবন নয়, এ জীবন বহু জীবনে ব্যাপ্ত, সম্পর্কীভূত। এপর্যায়ে শুরু হবে এমিলের সমাজচেতনা ও মানসিক সম্পর্কের শিক্ষায় অপরের প্রতি প্রেম ভালবাসাই এখন শিক্ষার প্রধান প্রেষণা (motive), প্রক্ষোভের সুষম বিকাশ এবং নৈতিক পূর্ণতা অর্জন হবে এ শিক্ষার লক্ষ্য। কিন্তু কোন ব্যাপারেই এমিলের স্বাধীনতাকে যেন খর্ব করা না হয়। ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে এমিল যেন যুক্তি-বিচারের দ্বারা পরিচালিত হয়। তার কাজের পরিণাম দেখেই সে পাবে নৈতিক-শিক্ষা। শিশু যদি কোন অন্যায় বা অসংগত আচরণ করে, তবে তার পরিণামই শিশুর আচরণে আনবে সংশোধিত পরিবর্তন।

৬। নারী শিক্ষা (Education for Women):

শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার প্রবর্তক, প্রগতিশীল চিন্তার ধারক এবং বাহক রুশো নারীদের শিক্ষা সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তা শুধু প্রাচীনপন্থী নয়, সে

অভিমতের সংগে রুশোর শিক্ষাতত্ত্বের মূলনীতির অর্থাৎ শিক্ষার্থীর স্বাধীনতার কোন সম্পর্ক নেই। সম্ভবতঃ তদনীন্তন ফরাসী সমাজের উচ্ছৃংখলতা এবং রুশোর ব্যক্তিগত জীবনের বঞ্চনা এ মতের পেছনে কাজ করছিল।

শিশু শিক্ষার চতুর্থ পর্যায়ে তিনি বালিকা সফিয়া (*Sophie*)-কে আমাদের সংগে পরিচয় করে দিয়েছেন। পুরুষ শিশুর বেলা রুশো তার নেতিবাচক শিক্ষা প্রবর্তন করেছেন। কিন্তু মেয়েদের বেলা এ ধরনের কোন স্বাধীনতা তিনি সমর্থন করেননি। মেয়েদের শিক্ষা হবে অস্তিবাচক এবং কঠোর শৃংখলা-শাসিত। মেয়েদের শিক্ষা মেয়েদের পছন্দ-অপছন্দের ওপর নির্ভর করবে না, গৃহস্থালীই হবে তাদের শিক্ষার বিষয়। তাদের উপযুক্ত করে তুলতে হবে গৃহ-জীবনের জন্য, স্বামী সেবার জন্য। নম্রতা এবং আনুগত্য শিক্ষা দিতে হবে মেয়েদের। তাহলেই পুরুষের পক্ষে পরম সহায়ক হবে নারী। তাই তিনি বার বার বলেছেন, সফিয়াকে সর্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে এবং তার বিবাহিত জীবনের পক্ষে সহায়ক বিষয়গুলিই তাকে শিক্ষা দিতে হবে।

রুশো তাই নারী-শিক্ষা বিরোধী। তিনি বলেছেন: 'একটি শিক্ষিতা নারীকে মহামারীর মত পরিত্যাগ করা চাই। সে নারী তার স্বামী, তার সন্তান-সন্ততি, তার ভৃত্যবর্গ সকলের কাছেই প্লেগ রোগস্বরূপ।

৭। শিক্ষাতত্ত্বে রুশোর অবদান (Contributions of Rousseau to educational theory and practice):

শিক্ষার ইতিহাসে রুশো এক নতুন যুগের সূচনা করে গেছেন। গতানুগতিক, প্রাচীন ও অন্ধ বিশ্বাসে এতদিন আমরা ঘুমিয়ে ছিলাম। রুশোই আমাদের ঘুমন্ত মনে জাগরণের বাণী আনলেন। গতানুগতিক ও অভ্যস্ত জীবন সম্বন্ধে আমরা নতুন করে ভাবতে শুরু করলাম, শিশু ও তার শিক্ষা সম্বন্ধে নতুন তথ্য অবগত হলাম। পরবর্তী যুগে শিশু-শিক্ষা সম্বন্ধে যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁদের উপর রুশোর প্রভাব অপরিসীম।

রুশোকে বলা হয় আধুনিক শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার জনক। শিক্ষায় শিশুর স্বাধীনতা, ব্যক্তিমুখী শিক্ষা, শিশুর চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্যবিষয়ের প্রবর্তন

1. "A woman of culture is to be avoided like pestilence. She is the plague of her husband, her children, her servants, everybody."

প্রভৃতি আধুনিক প্রগতিশীল শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলি কোন না কোন ভাবে রুশোর শিক্ষাদর্শে উপস্থিত।

রুশোর শিক্ষাতত্ত্বের মূল বক্তব্য ছিল, শিশুর শিক্ষা তার প্রকৃতি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। শিশুর প্রকৃতিগত চাহিদা, তার প্রবৃত্তি প্রবণতা প্রভৃতিই হবে শিক্ষার নিয়ন্ত্রক। অর্থাৎ শিশু-মনকেই সর্বাগ্রে স্থান দিতে হবে। রুশোর এই মতবাদ পরবর্তী যুগে শিক্ষাতত্ত্বে এক ব্যাপক মনস্তাত্ত্বিক আন্দোলনের সূত্রপাত করেছে, বিশেষ ভাবে পেস্টালৎসীর শিক্ষানীতিতে।

রুশো তার শিক্ষাতত্ত্বে শিশুকে স্বতন্ত্র সত্তারূপে কল্পনা করছেন। তার প্রাকৃতিক মানুষের (natural man) ধারণা থেকেই আধুনিক শিক্ষাদর্শে 'ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য' মতবাদের জন্ম।

রুশো শিশুর বহির্জাগতিক প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। পুস্তক-কেন্দ্রিক ভাষামূলক শিক্ষার বিরোধিতা করে তিনি বাস্তব ঘটনা পর্যবেক্ষণের এবং তথ্য সংগ্রহের উপর শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। আধুনিক জীবন-ধর্মী, বাস্তবমুখী এবং কর্মমূলক শিক্ষার মূল সূত্র রুশোর মতবাদেই নিহিত রয়েছে।

শিক্ষাতত্ত্বে রুশোর এসব যুগপ্রসারী প্রভাব থাকা সত্ত্বেও তাঁর মতবাদ স্ববিরোধিতায় পূর্ণ। অবশ্য রুশো নিজেই বলেছেন: 'আমি কুসংস্কার সম্পন্ন হবার চাইতে স্ববিরোধী হতে অধিক পছন্দ করি।'[1]

রুশোর স্ববিরোধিতা প্রবাদ বাক্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিকে রুশো বিশ্বাস করেন, সমগ্র সমাজ কলুষিত, ব্যক্তির উপর ব্যক্তির প্রভাব কৃত্রিম। আবার অন্যদিকে রুশো প্রতিটি ব্যষ্টির সহজাত মহৎ প্রকৃতিতে গভীর আস্থা প্রকাশ করেছেন। একদিকে তিনি শিশুর স্বাভাবিক বিকাশসাধনে তার মাতাপিতা, আত্মীয়-পরিজন ও অন্যান্য সংগী-সাথীদের প্রভাব ও সহযোগিতাকে অনভিপ্রেত বলে ঘোষণা করেছেন, আবার অন্যদিকে তিনি শিশুকে সমাজবিচ্ছিন্ন অবস্থায় শিক্ষকের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন।

রুশো বলেছেন: প্রতিটি শিশুর থাকবে তার নিজস্ব শিক্ষক।[2] শিক্ষক শিশুকে সব সময় তাঁর সংগে রাখবেন ও সর্বব্যাপারে তাকে পরিচালনা করবেন। এ ধরনের শিক্ষাদান শুধু অসম্ভবই নয়, কাল্পনিক।

1. "I should rather be a man of paradox than of prejudice."
2. "Each child must have its own tutor."

রুশো ভাষামূলক শিক্ষা এবং পুস্তক-পাঠের বিরুদ্ধে তীব্র মত প্রকাশ করেছেন এবং শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে বড় করে দেখেছেন। কিন্তু এতে সমাজের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকে শিশুকে বঞ্চিত করা হয়।

রুশো বলেছেন : প্রতিটি শিশু আত্মনির্ভরশীল হবে। কিন্তু 'এমিল' গ্রন্থে দেখি, শিশু এমিল পরিণত জীবনেও স্বনির্ভরতা শেখেনি। তার সন্তান-সন্ততিকে লালন-পালন করার মত দায়িত্বশীল সে হয়নি। সে রুশোকে তারই গৃহে থাকবার জন্য আকুতি প্রকাশ করছে। 'এমিল' আত্মনির্ভরশীল না হয়ে রুশো-নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

রুশো নেতিবাচক শিক্ষায় সমাজের চাহিদাকে প্রথমতঃ অস্বীকার করেন। এক কাল্পনিক প্রাক্-সামাজিক স্তরের মানুষের প্রতি তার দৃষ্টি তখন ছিল নিবদ্ধ। সমাজ-চেতনা বা সামাজিক মূল্যবোধ যে একটি সার্থক ব্যক্তি-জীবনের প্রারম্ভেই অপরিহার্য, একথা রুশো স্বীকার করেননি। কিন্তু জীবন বিকাশের চতুর্থ পর্যায়ে এসে শিশুর জীবনে সামাজিক আচরণের মূল্যকে তিনি স্বীকার করেছেন। তাঁর শিক্ষাদর্শ সমাজবিরোধী হয়নি বটে, কিন্তু শিক্ষার শেষ পর্যায়ে ব্যক্তিতান্ত্রিক ভাবধারাকে যে হঠাৎ সমাজতান্ত্রিক করে তোলা যায় না—এ মনস্তাত্ত্বিক সত্যটি রুশোর জানা ছিল না।

তার প্রাকৃতিক ফলাফলের তত্ত্ব মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। প্রথমতঃ, যে শিশু আগুনে পুড়েছে সে আগুনকে ভয় করবে একথা ঠিক। কিন্তু তা বলে কি আমরা এ আশা করব যে প্রতিটি শিশু এভাবে আগুনের দহন কার্য সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করুক? দ্বিতীয়তঃ, শিশু প্রকৃতির কাছে যে অপরাধ করে সে সম্বন্ধে শিশু অবহিত নয়। তৃতীয়তঃ, প্রকৃতির শাস্তি অনেক সময় এত দেরিতে বা সূক্ষ্মভাবে উপস্থিত হয় যে শিশু কেন, বয়স্কদের পক্ষেও শাস্তি এবং অপরাধের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ স্থাপন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। চতুর্থতঃ, শিশুকে জলে ভেজা থেকে যদি আমরা বিরত না করি, তবে তার জীবন সংশয়ও হতে পারে। এর ফলে কি লঘু পাপে গুরুদণ্ড হবে না?

এসব ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও রুশোর শিক্ষাতত্ত্বের তিনটি মৌলিক নীতি আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বে সর্বজনভাবে গৃহীত হয়েছে। এই নীতিগুলি হল : (ক) শিশুর জন্মমুহূর্ত থেকে তাকে তার আচরণের স্বাধীনতা দিতে হবে। (খ) শিশুরা সক্রিয়ভাবে তাদের অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করবে

এবং পুস্তকে বর্ণিত বিষয়বস্তু সংগ্রহেই তাদের শিক্ষা সীমিত থাকবে না। (গ) তারা প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদনে হাতের কাজ শিখবে।

এ সব কারণেই রুশো আধুনিককালের সকল শিক্ষা-সংস্কারক এবং শিক্ষাবিদ্‌দের পূর্বসূরী বলে প্রণম্য।

শিক্ষায় মনস্তাত্ত্বিক আন্দোলনের অগ্রদূত
জোহান হিনরিক পেস্টালৎসী (Johann Heinrich Pestalozzi)
১৭৪৬ খ্রীঃ—১৮২৭ খ্রীঃ

রুশো শিক্ষাতত্ত্বে যে প্রগতিশীল চিন্তাধারার উদ্ভাবন করেন তাঁর সমসাময়িক যুগে এগুলিকে কেহ প্রশংসা করার বা বাস্তবে অনুশীলন করার চেষ্টাও করেনি। একথা সত্য যে, রুশোর বৈপ্লবিক ও যুগপ্লাবী ভাবধারার অনুসরণ করা সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার। তাছাড়া, রুশোর নিজেরও কোন ধারণা ছিল না কিভাবে তাঁর শিক্ষার মৌলিক নীতিগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করা যায়। এ প্রসংগে সমালোচকরা বলেন : এ ব্যাপারে রুশো উপযুক্ত ছিলেন না, হয় তাঁর শিক্ষা, না হয় তাঁর প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতার অভাব ছিল।

কিন্তু রুশোর সৌভাগ্য যে তিনি তাঁর পরবর্তী যুগে এমন কয়েকজন শিষ্য লাভ করেন যাঁরা তাঁর শিক্ষানীতিকে বাস্তবে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন, নতুন ব্যাখ্যার দ্বারা জনসাধারণের কাছে প্রচার করেন এবং গতানুগতিক শিক্ষাদান পদ্ধতিতে বাস্তব পরিবর্তন আনেন। সুইজারল্যাণ্ডের পেস্টালৎসী রুশোর শিক্ষাদর্শের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্য। তিনিই সর্বপ্রথম রুশোর 'এমিল' গ্রন্থের ভাবধারা অনুযায়ী তাঁর পুত্রকে শিক্ষা দিতে লাগলেন।

১। পেস্টালৎসীর শিক্ষাতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য (Features of Pestalozzi's theory of Education) :

পেস্টালৎসীর শিক্ষাতত্ত্বের প্রথম এবং প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, তিনি শিক্ষাকে মনস্তত্ত্ব-ভিত্তিক করে তোলার চেষ্টা করেছেন তাঁর সমগ্র জীবন ধরে। রুশোর প্রকৃতিবাদেও (Naturalism) শিক্ষাকে মনস্তত্ত্ব-সম্মত করে তোলার কথা রয়েছে। কিন্তু সুইস্‌দেশীয় শিক্ষক পেস্টালৎসীর আগে আর কেহই শিক্ষক ও জনসাধারণকে শিক্ষায় মনস্তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তার বিষয় অবহিত করাননি।

পেস্টালৎসীর পূর্বে কেহ শিক্ষাদানপদ্ধতি নির্ণয়ে শিশু-মনের এমন ব্যাপক ও সহানুভূতিশীল বিবেচনার প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা অনুসরণ করতে পারেননি। 'শিক্ষা' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসংগে পেস্টালৎসী বলেন, 'শিক্ষা হল মানব-শিশুর ক্ষমতা ও সম্ভাবনার স্বাভাবিক, প্রগতিশীল এবং সুষমবিকাশ'।[1]

পেস্টালৎসী শিশু-মনের অন্তর্বাসী শক্তি ও সম্ভাবনার সহজ ও স্বাভাবিক বিকাশ সাধনকেই বড় করে দেখেননি, তিনি পরিপূর্ণভাবে শিশু-মনকে শিক্ষাদানকালে অনুধাবন করতে বলেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি মানসিক বিকাশের মৌলিক নীতিগুলি শিক্ষাদান পদ্ধতিতে গ্রহণ করতে উপদেশ দিয়েছেন। শিশু-মনের অনুভূতি এবং অনুভূতিকে জাগ্রত ও মহত্তর করার কৌশলও শিক্ষকের জানতে হবে। এজন্য তাঁকে আধুনিক শিক্ষা-তত্ত্বে মনস্তাত্ত্বিক আন্দোলনের জনক বলা হয়। তিনিই সর্বপ্রথম শিক্ষাকে ও শিক্ষাদান পদ্ধতিকে মনস্তত্ত্ব-সম্মত করে তোলেন এবং মানব মনের বিকাশের চিরাচরিত নীতিকে শিক্ষায় প্রয়োগ করতে বলেন।

পেস্টালৎসীর শিক্ষাতত্ত্বের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল, শিক্ষা যুগপৎ একটি সামাজিক এবং ব্যক্তিগত প্রক্রিয়া (Process)। একদিকে 'শিক্ষা' বলতে ব্যক্তির সৎ চিন্তা (right thinking) এবং সৎজীবন (right living) অর্থাৎ ব্যক্তির মংগল বোঝায় কিন্তু ব্যাপক অর্থে শিক্ষা হল সামাজিক মংগল সাধন। শিক্ষা ব্যক্তির আত্মবিকাশে যেমন প্রয়োজন তেমনি সমাজ প্রগতিতেও প্রয়োজন। শিক্ষা শুধু একটি আত্মবিকাশের প্রক্রিয়া নয়, উহা সমাজ প্রগতির একটি উপকরণও। শিক্ষার লক্ষ্য শুধু ব্যক্তির মানসিক বিকাশ বা নৈতিক মংগল সাধন নয়, সমাজ প্রগতি এবং সামাজিক মংগলও শিক্ষার লক্ষ্য। সুতরাং পেস্টালৎসী শিক্ষাকে শুধু মনস্তত্ত্ব-সম্মত করে তোলেননি, সমাজতত্ত্ব-সম্মত করেও তুলেছেন। রুশোর মত তিনিও বিশ্বাস করতেন, অধঃপতিত মানব সমাজকে সকল কলুষতা থেকে মুক্ত করার একমাত্র সহায়ক হল শিক্ষা।

পেস্টালৎসীর শিক্ষাতত্ত্বের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল শিক্ষায় মানবতার আবেদন; সর্বপ্রথম রুশো শিক্ষাকে মানব-শিশুর জন্মগত অধিকার বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু রুশো তাঁর প্রগতিশীল শিক্ষাকে এমিল অর্থাৎ পুরুষ-শিশুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ

---

1. "Education is natural, progressive and harmonious development of the powers and capacities of the human being."

রাখেন। নারী, দরিদ্র ও নিপীড়িত মানবসন্তানের শিক্ষার সমস্যা নিয়ে রুশো পেস্টালৎসীর মত বিব্রত বোধ করেননি। দরিদ্র, অবহেলিত এবং অধঃপতিত কৃষক সমাজের দুর্দশা দূর করার জন্য তিনি নিউহফ (*Newhof*) নামক জায়গায় একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। গভীর স্নেহ ও দরদী মন নিয়ে তাদের শিক্ষা দিতে শুরু করেন এবং কয়েক মাস পরেই তিনি লক্ষ্য করেন, স্নেহ ও প্রেম-বঞ্চিত শিশুদের মুখে ফুটে উঠেছে প্রফুল্লতা, সরলতা ও বুদ্ধির চিহ্ন। তিনি শিশুদের তাঁর সন্তান বলে জানতেন এবং বাক্য ও আচরণে পিতৃসুলভ স্নেহ-ভালবাসা প্রকাশ করতেন। তাঁর বিশ্ব-বন্দিত *Leonard and Gertrude* পুস্তকে তিনি বলেছেন, যারা দুঃখভারগ্রস্ত, তিনি তাদের ভালবাসেন এবং তাদের মংগল সাধন ছাড়া তাঁর জীবনের আর কোন ব্রত নেই। তাঁর *Views and Experience* বইতে তিনি লিখেছেন, তাঁর পারিবারিক শিক্ষা ও তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই হল, যাদের সংস্পর্শে তিনি এসেছেন তাদের জন্য তিনি গভীর সহানুভূতি অনুভব করেছেন এবং তাদের মধ্যে পেয়েছেন অপরিসীম বিশ্বাস। মানবতার প্রতি এই বিশ্বাস থেকেই এসেছে তাঁর শিক্ষাতত্ত্বে সকল স্তরের সকল মানুষের শিক্ষার দাবী।

পেস্টালৎসীর শিক্ষাতত্ত্বের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল, শিক্ষার দ্বারা নিছক জ্ঞান আহরণের চাইতে তিনি বিশেষ কোন ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়াকে বড় করে দেখেছেন। তাঁর *Leonard and Gertrude* বইতে তিনি বলেন: পিতা-মাতা তাদের সন্তান সন্ততিকে যা দিতে পারেননি, শিক্ষককে তা দিতে হবে। আসল কথা, অক্ষরজ্ঞান অর্জনই শিশুর প্রধানতম প্রয়োজন নয়। শিশুরা কোন কিছু সম্বন্ধে জ্ঞান (to learn something) অর্জন করবে, এটা নিঃসন্দেহে মহৎ, কিন্তু কোন কিছু জানার চাইতে একটা কিছু হওয়া (to be something) সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এ সত্যকে যখন শিক্ষক ও বিদ্যালয় পরিচালকগণ সম্যক হৃদয়ংগম করবেন, তখনই জাতীয় শিক্ষার (National education) আশা করা যেতে পারে। মনরো *(Monroe)* পেস্টালৎসীর শিক্ষাতত্ত্ব বিশ্লেষণ করে বলেন: পেস্টালৎসীর কাছে শিক্ষা বিদ্যালয়ের চাইতে ব্যাপকতর। শিক্ষা ব্যক্তিকে কিছু জ্ঞানের সংবাদ বিতরণ করেই ক্ষান্ত হবে না, ব্যক্তির জন্য শিক্ষার করণীয় এর চাইতেও বেশী। শিক্ষা ব্যক্তিকে একটি বিশেষ পরিণতি লাভে সহায়তা করবে এবং অপরের জন্য ত্যাগ ও সেবা করতে শেখাবে।

বলা বাহুল্য, পেস্টালৎসী দরিদ্র, অনাথ ও অবহেলিত মানব সন্তানের শিক্ষায় অধিকতর আগ্রহী ছিলেন। রুশো যে সর্বজনীন শিক্ষার এবং মানবতার ধ্বনি তুলেছিলেন তা বাস্তব রূপ পেল পেস্টালৎসীর শিক্ষাতত্ত্বে।

২। গতানুগতিক শিক্ষা সম্বন্ধে পেস্টালৎসী (Pestalozzi on conventional education) :

গতানুগতিক শিক্ষা সম্বন্ধে পেস্টালৎসীর প্রধান বক্তব্য হল, এ শিক্ষা শিশুর ব্যক্তিত্বের মহৎ দিকগুলির বিকাশে সহায়তা করে না, বরং উহা শিশু-মনে অপরের কতকগুলি অনুভূতি ও ধারণা সঞ্চারিত করার প্রয়াস পেত। গতানুগতিক শিক্ষা শিশুর ব্যক্তিত্বকে কতকগুলি অন্ধ সংস্কারের মধ্যে সীমায়িত করে রেখেছিল। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষক যেন শিশু-মনের বাইরে থেকে তার অন্তরে প্রতিক্রিয়া করার চেষ্টা করতেন। এ ধরনের শিক্ষা মনস্তত্ত্ব-সম্মত নয় এবং পেস্টালৎসী তার পরিবর্তন করেন। তিনি শিশু-মনের উপর বাইরের কোন প্রভাব বিস্তার করে শিক্ষা দান না করে তার অন্তরের সকল সম্ভাবনা ও শক্তির স্বাভাবিক বিকাশ সাধন করতে চাইলেন।

৩। রুশো এবং পেস্টালৎসী (Rousseau and Pestalozzi) :

গতানুগতিক শিক্ষার যান্ত্রিকতা ও কৃত্রিমতা সম্বন্ধে রুশো এবং পেস্টালৎসী একমত। পেস্টালৎসী রুশোকেই তাঁর গুরু বলে জেনেছিলেন এবং শিষ্য-সুলভ শ্রদ্ধা নিয়ে তাঁর তত্ত্বগুলিকে পরিমার্জিত করে বাস্তবে প্রয়োগ করেন। তাঁরা উভয়েই পুস্তক অধ্যয়ন ও বিষয়বস্তুর (Subject matter) জ্ঞান আহরণ করার চাইতে শিশুর শিক্ষা ও শিশু-মনকে অনুধাবন করার উপর গুরুত্ব দেন। রুশোর মতই পেস্টালৎসী বিশ্বাস করতেন, শিশু হচ্ছে শিক্ষাধারার কেন্দ্র।

কিন্তু পেস্টালৎসী রুশোর মত শিশুর আত্মবিকাশকে কেবলমাত্র ব্যক্তি-তান্ত্রিক দিক থেকে বিবেচনা করেননি। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, ব্যক্তির সর্বাংগীণ বিকাশ সমাজনির্ভর। রুশোর শিক্ষাতত্ত্বে ব্যষ্টি ও সমাজের মধ্যে যে তীব্র দ্বন্দ্ব দানা বেঁধেছিল, পেস্টালৎসী তার অবসান ঘটিয়েছেন। তাই তাঁর শিক্ষা-তত্ত্বে দেখি মনস্তাত্ত্বিক আন্দোলনের সংগে মিলিত হয়েছে সমাজতত্ত্বের চাহিদা।

রুশো শিশুর শিক্ষাকে তার স্বাভাবিক ইচ্ছা ও সহজাত প্রবৃত্তির উপর স্থাপন করে গতানুগতিক ও আকারসর্বস্ব শিক্ষাকে পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। রুশোর শিক্ষা হবে প্রকৃতি অনুযায়ী, অকৃত্রিম এবং স্বতঃস্ফূর্ত। পেস্টালৎসীও শিশু-প্রকৃতিকে শিক্ষার প্রধান অবলম্বন বলে ঘোষণা করেন, কিন্তু প্রকৃতিকে তিনি শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধনে প্রয়োগ করেন। রুশোর বক্তব্য ছিল শিক্ষা হবে প্রকৃতিগত (natural) আর পেস্টালৎসী চেয়েছেন শিক্ষা হবে প্রকৃতির সংগে অভিযোজন (conform to nature)। অর্থাৎ রুশোর মতে প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি অনুযায়ী শিক্ষা হবে স্বতঃস্ফূর্ত, কিন্তু পেস্টালৎসী বিশ্বাস করতেন যে প্রকৃতির বিকাশের নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। সুতরাং শিশু উদ্যমশীল হয়ে বিকাশের ধারা (Pattern) অনুযায়ী শিক্ষালাভ করবে—এটা প্রকৃতিকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা নয়।

৪। পেস্টালৎসীর শিক্ষাদানপদ্ধতি : বস্তুভিত্তিক পাঠ (Pestalozzi's Method of teaching : Object Lesson) :

পেস্টালৎসী তার শিক্ষাদান পদ্ধতিতে সর্বপ্রথম বিদ্যালয়ের কৃত্রিম আবহাওয়া পরিবর্তন করেন। তাঁর মতে কতকগুলি ভয়াতুর শিশুর সম্মুখে বক্তৃতা করাই শিক্ষাদান নয়। শাস্তি ও শাসনের দ্বারা শিক্ষার্থীর কাছ থেকে শিক্ষক যে আনুগত্য লাভ করেন, সে আনুগত্য একপ্রকার দাসত্ব। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক হবে প্রেম ও প্রীতিময়। তিনি তাঁর শিক্ষাতত্ত্বকে অনুশীলন করার জন্য শিক্ষক-শিক্ষণেরও (Teacher's Training) ব্যবস্থা করেন। তাদের প্রথমেই তিনি শিশু-মনকে অনুধাবন করার কৌশল শেখাতেন। কিভাবে শিশুর বিকাশোন্মুখ সম্ভাবনাকে যথাযথভাবে গঠন করা যায় এবং শিশুকে সার্থক জীবন ও মংগল লাভে উপযোগী করে তোলা যায়, শিক্ষককে এসব ব্যাপারে অগ্রণী হতে হবে। তাই তিনি বলেন, বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রয়োজন এক সহজ, প্রেম ও প্রীতিময় সম্পর্ক। শাসন ও শাস্তির পরিবর্তে বিদ্যালয়ে থাকবে পরস্পরের মধ্যে গভীর সহানুভূতি এবং সহযোগিতার মনোভাব।

দীর্ঘকাল গবেষণার পর পেস্টালৎসী তাঁর শিক্ষণ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এ পদ্ধতিকে তিনি বস্তুভিত্তিক পাঠ (Object Lesson) বলে অভিহিত

করেছেন। নিছক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান বা বিষয়বস্তুর মাধ্যমে জ্ঞান প্রদান করাকে তিনি অযৌক্তিক মনে করেছেন। শিশুর অপরিণত মন বিমূর্ত (abstract) বিষয় সম্বন্ধে ধারণা সৃষ্টি করতে পারে না। অর্থাৎ শিশু-মন বিমূর্ত চিন্তার ক্ষেত্র নয়। শিশুর সামনে যদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু উপস্থাপিত করা যায়, তবে ইহার আবেদন শিশু-মনে অনেক বেশি হবে। বক্তৃতাদান পদ্ধতির দ্বারা শিশুর কর্ণেন্দ্রিয়কেই পীড়া দেওয়া হয়। শিশুর কোন উদ্যমশীলতার প্রয়োজন এতে নেই। কিন্তু কোন মূর্ত (concrete) বস্তু যদি শিশুর সামনে তুলে ধরা হয়, তবে তার নানা ইন্দ্রিয়ানুশীলন সম্ভব হয়। একই সংগে চক্ষু, কর্ণ, ত্বক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের চর্চা হতে পারে। এজন্য তাঁর শিক্ষাদান-পদ্ধতিতে পেস্টালৎসী ইন্দ্রিয়ের উপর আবেদনশীল বস্তুকে গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, প্রকৃতির (Nature) উদ্দীপকের কাছে শিশুর ইন্দ্রিয়গুলি যখনই সাড়া দেয়, তখনই প্রকৃতি তাকে শিক্ষা দিতে শুরু করে।[1] শিক্ষাদান পদ্ধতির মূল নীতি হল : শিশুর সহজাত প্রবণতাকে যথাযথভাবে বিকাশ সাধন করার ব্যাপারে কিভাবে সহায়তা করা যায় তার কৌশল জানা।

সেই কৌশলই পেস্টালৎসী উদ্ভাবন করেছেন শিশুকে মূর্তবস্তুর মাধ্যমে শিক্ষাদান করে। শিশুকে যদি মূর্তবস্তুর সহায়তায় শিক্ষাদান করা হয় তবে তার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, শিক্ষা হয় স্থায়ী এবং বাস্তবধর্মী। শিশু যখন মূর্তবস্তুর মাধ্যমে অভিজ্ঞতা আহরণ করে, তখন যে তার শুধু ইন্দ্রিয় চর্চা হয় তা নয়, তার সামগ্রিক মানসিক বিকাশও ঘটে। পেস্টালৎসীর কাছে শিক্ষা ও মানসিক বিকাশ সমার্থক। অর্থাৎ নিছক জ্ঞানদান শিক্ষার উপজীব্য বিষয় নয়। শিক্ষার্থীকে বিকশিত করে তোলাই শিক্ষার কাজ।[2]

পেস্টালৎসী তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে বস্তুভিত্তিক পাঠের দ্বারা লিখন-পঠন অর্থাৎ ভাষামূলক শিক্ষাও প্রদান করেছেন। তিনি শিশুদের ছবি আঁকা বা গণিত শিক্ষা এবং অন্যান্য পাঠ্য বিষয়বস্তুর শিক্ষাও বস্তুভিত্তিক পাঠের মাধ্যমে দিয়েছেন। তাঁর পরবর্তী যুগে ফ্রয়েবেলও বস্তুভিত্তিক পাঠের প্রয়োজনীয়তা

1. 'I laid special stress on just what usually affected their senses. From the very moment that the child's senses open to the impressions of Nature, Nature teaches it.'

2. "The main object of Education is not to teach but to develop."

ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু ফ্রয়েবেলের কাছে এক একটি মূর্তবস্তু ছিল এক একটি ভাবের প্রতীক (Symbol)। কিন্তু পেস্টালৎসী বস্তুকে নিছক ইন্দ্রিয়ের উপর আবেদনশীল বলেই বিবেচনা করেছেন, তার পেছনে কোন ভাব বা প্রতীকের কোন উল্লেখ করেননি।

৫। শিক্ষাতত্ত্বে পেস্টালৎসীর অবদান (Contributions of Pestalozzi to education) ঃ

রুশো তদানীন্তন ফরাসী সমাজের কৃত্রিম শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি চিন্তা, কর্ম এমনকি প্রক্ষোভজনিত (emotional) প্রতিক্রিয়ার গতানুগতিক এবং কৃত্রিম অভ্যাসের অপসারণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু রুশো বাস্তব ক্ষেত্রে বিপ্লবের যে ভাববন্যা আনেন তা প্রয়োগ করার প্রতিভা বা কর্মশক্তি তাঁর ছিল না। সর্বপ্রকার সামাজিক কলুষতা থেকে, কৃত্রিম প্রভাব থেকে মুক্ত 'আদিম মানুষ'-কে (noble savage) তিনি বড় করে দেখেছেন এবং নেতিবাচক শিক্ষার দ্বারা সেই প্রাকৃতিক শিশুকে তার প্রকৃতির কাছে ছেড়ে দিয়ে স্বাধীনতা প্রদান করতে বলেছেন। শিশুর শৃংখলাবোধের শিক্ষা এবং নৈতিক শিক্ষাকে তার আচরণের প্রাকৃতিক ফলাফলের ওপরই ছেড়ে দিতে বলেছেন।

কিন্তু পেস্টালৎসীই প্রথম এবং প্রধানতম বাস্তবধর্মী শিক্ষক যিনি বুঝতে পারলেন যে শিশুকে তার অন্ধ প্রকৃতির ওপর ছেড়ে দেবার পরিণাম কি ভয়াবহ হতে পারে। তিনি লক্ষ্য করলেন, অন্ধভাবে প্রকৃতিকে অনুসরণ করার মধ্যে শিশুর স্বাধীনতা নিহিত নেই। কাজেই কিভাবে প্রকৃতির সংগে অভিযোজন করা (to conform) যায়, এটাই হবে শিক্ষানীতি। তাই তিনি মানব সমাজের সংস্কৃতিকে শিক্ষায় স্থান দিলেন। কিভাবে শিক্ষা দিতে হবে এ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে তিনি বই লিখলেন *'How Gertrude Teaches Her Children'*। আসল কথা, তিনি প্রথমে মানব মনের বিকাশের মৌলিক নীতিগুলিকে জানতে চাইলেন এবং তারপর শিক্ষায় সেগুলিকে প্রয়োগ করেন। পেস্টালৎসীই রুশোর নেতিবাচক শিক্ষাকে বাস্তবধর্মী করে তোলেন। রুশো পুরাতন শিক্ষাব্যবস্থাকে ভাংগতে চেয়েছিলেন—গঠনধর্মী প্রতিভা তাঁর ছিল না। পেস্টালৎসী গুরুর অসমাপ্ত কাজকে সম্পন্ন করেন নতুন বিদ্যালয় ও শিক্ষাব্যবস্থা

সৃষ্টি করে। রুশো শিক্ষাতত্ত্বে যে বিপ্লব সৃষ্টি করেন তা জনসমর্থন ও প্রতিষ্ঠা পেল পেস্টালৎসীর মধ্যে।

পেস্টালৎসীর আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হল, তিনিই শিক্ষাকে মনস্তত্ত্ব-সম্মত করে তোলার আন্দোলনের পুরোধা। এটা সত্য যে, রুশোর প্রকৃতিবাদ বা শিশু-মনের প্রকৃতিকেই তিনি অনুসরণ করেছেন। কিন্তু পেস্টালৎসী শিক্ষায় মনস্তাত্ত্বিক নীতির গুরুত্ব সম্বন্ধে সকল শিক্ষককে অবহিত করান। প্রতিটি শিশুই তাঁর ভাষায় একটি বিকাশোন্মুখ ব্যক্তিত্ব। আর সে বিকাশের নির্দিষ্ট মানসিক গতি রয়েছে। শিক্ষক যেন এ শিশু-মনকেই প্রথমে অনুধাধন করেন। শিক্ষায় মনস্তাত্ত্বিক আন্দোলনের প্রধান বক্তব্য এখানেই। এজন্য পেস্টালৎসীর এ আন্দোলনকে পেস্টালৎসী-আন্দোলন **(Pestalozzian Movement)** বলে অভিহিত করা হয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পেস্টালৎসী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষা পাননি। তাছাড়া, মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ কোন জ্ঞানও ছিল না এজন্য পরবর্তী যুগে তাঁর অনেক সংব্যাখ্যানের সংশোধন প্রয়োজন হয়েছে, অনেক তথ্যকে বাতিল করা হয়েছে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে মনস্তাত্ত্বিক আন্দোলন শিক্ষাতত্ত্বে বিপ্লব এনেছে তার অগ্রদূত হলেন পেস্টালৎসী। তাঁরই চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে হারবার্ট, ফ্রয়েবেল, মন্টেসরী শিক্ষাকে মনস্তত্ত্বসম্মত করে তুলবার ব্যাপক আয়োজন করেন।

রুশোর শিক্ষাতত্ত্বে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রভাবই বেশী। একথা সত্য যে, এমিলের শিক্ষা সমাজ বিরোধী নয়, কিন্তু শিশু এমিলের সংগে সমাজের সম্পর্ক কৃত্রিম বলেই ঘোষণা করেছেন রুশো। ব্যক্তির জীবনে তাই সামাজিক চাহিদা ও অবদানের মূল্য অস্বীকৃত হয়েছে রুশোর শিক্ষাতত্ত্বে। কিন্তু পেস্টালৎসী বললেন, শিক্ষা শুধু ব্যক্তিনির্ভর নয়, উহা সমাজনির্ভরও। শিক্ষা যুগপৎ ব্যক্তিগত এবং সামাজিক প্রক্রিয়া। সমাজ ছাড়া ব্যক্তির সর্বাংগীণ বিকাশ সম্ভব নয়। ব্যক্তিতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের সার্থক মিলনের প্রথম পদক্ষেপ পেস্টালৎসীর এ বক্তব্যে ধ্বনিত হয়েছে।

শিক্ষাতত্ত্বে শিক্ষার দার্শনিক ব্যাখ্যাই মুখ্য নয়। সেই তত্ত্বকে কিভাবে বাস্তবে প্রয়োগ করা যায় তার জন্য প্রয়োজন সার্থক শিক্ষাপদ্ধতি আর স্নেহ প্রীতিময় পরিবেশ। পেস্টালৎসীর আগে এ সত্যকে কেহ এমন গভীরভাবে

অনুধাবন করেনি। তিনিই প্রথম শিশু-শিক্ষার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন, বাস্তবে পরীক্ষা করেন। তাই শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে আধুনিক গবেষণার দ্বার উদ্ঘাটন করেছেন পেস্টালৎসী।

রুশো বলেছিলেন, শিক্ষা শিশুর জন্মগত অধিকার। কিন্তু নারীকে তিনি তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রেখেছেন। আর আপামর জনতার জন্য সে শিক্ষাকে তিনি গ্রহণযোগ্য করতেও পারেননি। কিন্তু পেস্টালৎসীই শিক্ষাকে সর্বজনীনতা দান করেছেন—দরিদ্র, অবহেলিত মানবশিশুর কাছে শিক্ষার বাণী পৌঁছে দেবার জন্য তিনি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। ফলে শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণ সম্ভব হয়েছে। তাই সর্বযুগে শিক্ষাগুরু পেস্টালৎসীর অবদান বন্দিত হবে।

পঞ্চসোপান নীতির আবিষ্কারক
জন ফ্রেডারিক হারবার্ট (John Frederic Herbert)
১৭৭৬—১৮৪১ খ্রীঃ

পেস্টালৎসীর ছাত্র এবং অনুগামীদের মধ্যে হারবার্ট এবং ফ্রয়েবেলের নামই সর্বাগ্রে স্থান পেয়েছে। হারবার্টের শিক্ষাতত্ত্ব পেস্টালৎসীর শিক্ষানীতির পরিবর্ধিত এবং পরিমার্জিত রূপ। তিনি তাঁর শিক্ষাতত্ত্বে বিশেষ ভাবে শিক্ষক এবং শিক্ষাদান পদ্ধতির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি নিজে দর্শন ও মনস্তত্ত্বে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিলেন। সমালোচনাধর্মী মন নিয়ে পেস্টালৎসীর শিক্ষানীতিকে তিনি বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখেছেন। রুশো এবং তাঁর শিষ্য পেস্টালৎসী মোটেই উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন না, তাঁরা আবেগ, প্রক্ষোভকে তাঁদের শিক্ষনীতিতে মর্যাদা দিয়েছেন বেশী। কিন্তু শিক্ষার সর্বজনীন মৌলিক নীতিগুলি ব্যক্তিসাপেক্ষ আবেগ, প্রক্ষোভ প্রভৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এখানে যুক্তি ও বিচারবুদ্ধির প্রয়োজন এসে পড়ে। হারবার্ট এই সত্যকেই অনুধাবন করে, দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা তাঁর শিক্ষাতত্ত্বকে গ্রহণযোগ্য করে তুলবার প্রয়াস পান।

১। হারবার্টের শিক্ষাতত্ত্ব (Herbert's theory of Education) :

হারবার্টের শিক্ষাতত্ত্ব আলোচনা করতে গেলে তাঁর মনস্তত্ত্ব ও দর্শন সম্বন্ধে আমাদের কিছু ধারণা থাকা উচিত। কেননা তাঁর শিক্ষার মৌলিক নীতি-

গুলিকে তিনি মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক সংব্যাখ্যানের ওপর দাঁড় করিয়েছেন। যদিও হারবার্টের দার্শনিক বা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে বর্তমান যুগে অনেকটা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে, তবুও শিক্ষাতত্ত্বে যে গঠনশীল ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীর পরিচয় হারবার্ট দেখিয়েছেন, তা অবিস্মরণীয়।

হারবার্টের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ: হারবার্ট মানবমনকে একটি অখণ্ড সত্ত্বা (unity) বলে বিবেচনা করেছেন। তিনি অ্যারিস্টট্‌ল প্রবর্তিত শক্তিবাদকে (Faculty Theory) প্রত্যাখ্যান করেছেন। অ্যারিস্টটল বিশ্বাস করতেন, আমাদের মন বিভিন্ন ধরনের মানসিক শক্তির সমষ্টি। যেমন, প্রত্যক্ষ, স্মৃতি, অবধারণ বা বিচার বুদ্ধির জন্য আলাদা আলাদা শক্তি বা ক্ষমতা (Faculty) রয়েছে আমাদের মনে। কিন্তু হারবার্ট বলেন, আমাদের মন একটি ঐক্য, অখণ্ড সত্ত্বা, একটি ছেদহীন গতি। মানসিক ক্রিয়ার মধ্যে বৈচিত্র্য বর্তমান, তবুও বৈচিত্র্যের মধ্যে রয়েছে মনের ঐক্য।

অভিজ্ঞতাবাদী (Empiricist) দার্শনিক লকের (*Locke*) মত হারবার্ট মোটামুটি বিশ্বাস করতেন যে, মানবমনের সহজাত (Innate) কোন ধারণার অবস্থিতি নেই। মন একটি পরিষ্কার শ্লেট বা সাদা কাগজের টুক্‌রা (Tabula Rasa)। প্রকৃতি শিশুর জন্মের পর শিশু-মনে তার লিপি লিখে যায়। কিন্তু লকের সংগে হারবার্টের পার্থক্য হল এই যে, হারবার্ট বিশ্বাস করতেন, জন্মের সময় আমরা একটি ক্ষমতা নিয়ে আসি যার সাহায্যে স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে আমরা পরিবেশের সংগে সম্পর্কীভূত হতে পারি। আমাদের জ্ঞান বা চেতনার সরলতম একক হল ভাব বা ধারণা (Idea)। পরিবেশের সংগে প্রতিক্রিয়া বা সংঘাতের ফলে আমাদের মনে ধারণার সৃষ্টি হয়। এই ধারণা তার অন্তর্নিহিত গতিশীল শক্তির জন্য মনের ভেতর সৃষ্ট হবার পরেই অস্তিত্ব লাভ করে এবং সকল প্রতিকূল প্রভাব থেকে নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা সর্বক্ষণ করে চলে। যে ভাব আমাদের চেতনার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত তার প্রভাব আমাদের ওপর বেশী, আবার যে ভাব আমাদের চেতনার সীমারেখা ছাড়িয়ে যায়, তাকে আমরা বিস্মৃত হই। আর এই ধারাণাগুলির পরস্পর প্রতিক্রিয়া থেকেই আসে আমাদের অবধারণ এবং সামান্যীকরণের (Generalisation) মানসিক প্রক্রিয়া। বিভিন্ন ধারণার মধ্যে তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আমাদের মনে অনবরত সংগ্রাম চলেছে।

ধারণাগুলির মধ্যে চিরন্তন সংঘাতের এই তত্ত্ব থেকে হারবার্টের মনস্তত্ত্বে দুটি মৌলিক নীতি জন্ম নিয়েছে। একটিকে বলা হয় আত্মবীক্ষণ (Apperception) এবং অন্যটিকে বলা আত্মবীক্ষিত ভাবপুঞ্জ (Apperceptive-Mass)। কোন্ ধারণা বা ভাব আমাদের চেতনার (Consciousness) কেন্দ্রস্থলে পৌঁছাবে —এ নিয়ে ধারণাগুলির মধ্যে অনবরত সংগ্রাম চলছে। সব ধারণাই চেতনার কেন্দ্রে উপস্থিত হতে পারে না। সাদৃশ্য (Resemblanc) এবং বৈসাদৃশ্য (Difference) নীতি অনুসারে ভাব বা ধারণাগুলি চেতনার মধ্যে স্থান পায়। সে যা হোক, ভাবগুলি মনের ভেতর একটি সম্মেলনে (Combination) আবদ্ধ হয়। যে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার (সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য নীতি অনুসারে) দ্বারা ভাবের (Ideas) সম্মেলন হয় তাকে হারবার্ট বলেন আত্মবীক্ষণ। কোন কোন সমালোচক বলেন যে, হারবার্টের এই আত্মবীক্ষণকে লক্ প্রবর্তিত ভাবানুষংগ (Association of ideas) নীতির সংগে তুলনা করা যেতে পারে। মনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই অনুষংগ সাধনের ক্ষমতা (Power of association)। নতুন ভাবের সংগে মন সতত সম্পর্ক স্থাপন করে যাচ্ছে। আর এ সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হচ্ছে পুরাতন সঞ্চিত ভাবপুঞ্জের দ্বারা। অর্থাৎ যখনই আমরা কোন ভাব প্রত্যক্ষ করছি তখনই একে মনের ভাবপুঞ্জের সংগে সংযুক্ত করে নিচ্ছি। ভাবের এই যে সম্মেলন আমাদের প্রত্যক্ষ বা আত্মবীক্ষণে সাহায্য করে তাকে হারবার্ট নাম দিয়েছেন আত্মবীক্ষিত ভাবপুঞ্জ (Apperceptive mass)। সুতরাং আত্মবীক্ষণের প্রক্রিয়া হল নতুন অভিজ্ঞতা বা ধারণার সংগে পুরাতন অভিজ্ঞতা বা ধারণার সংযোগ সাধন। আমাদের চেতনার স্তরে যে ধারণাপুঞ্জ রয়েছে তার সাহায্যেই আমরা নতুন ধারণার সংগে সম্পর্ক নির্ণয় করি। আত্মবীক্ষিত ভাবপুঞ্জ আত্মবীক্ষণের উপর নির্ভরশীল, আবার আত্মবীক্ষণ আত্মবীক্ষিত ভাবপুঞ্জের উপর নির্ভরশীল।

হারবার্টের এই আত্মবীক্ষণের তত্ত্বটি তাঁর সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার কেন্দ্রমূল। তাঁর শিক্ষাতত্ত্বের সকল আলোচনায় তিনি এ তত্ত্বটিকে প্রয়োগ করেছেন। এ নীতির সহায়তায় শিক্ষক শিশু-মনে আগ্রহ (interest) এবং মনোযোগ (attention) সঞ্চার করতে পারেন। পূর্বে শিশু-মনে যে ভাবরাশি (ideas) সঞ্চিত হয়েছে তার সংগে যোগ সাধন করে নতুন ভাব শিশুর স্মৃতিতে সংরক্ষিত করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীর পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা বা আহরিত জ্ঞানের সংগে প্রতিটি

নতুন বিষয় বা জ্ঞানকে যুক্ত করে দিতে হবে। হারবার্টের এ ব্যাখ্যাকে বিশ্লেষণ করে বলা যেতে পারে যে আমরা নতুন জ্ঞান আহরণ করি পুরান জ্ঞানের মাধ্যমে। আবার নতুন জ্ঞান আত্মবীক্ষিত ভাবপুঞ্জে সম্মিলিত হয়ে অন্য নতুন ভাব সংগ্রহের সাহায্য করে। এভাবে চলে মানসিক ক্রিয়ার নিরবচ্ছিন্ন গতি।

এই মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বটির গুরুত্ব শিক্ষাপদ্ধতিতে অপরিসীম। হারবার্ট বলেন, শিক্ষাদানের সময় যে বিষয়টি শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করা হবে তার সংগে সাদৃশ্যমূলক যে ভাবরাশি শিশু-মনে বিদ্যমান, এগুলি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে সর্বপ্রথম সচেতন করা চাই। শিশু-মনে সঞ্চিত ভাবরাশিকে তিনি অনেক সময় আত্মবীক্ষিত পদ্ধতিও (Apperceptive system) বলেছেন। সুতরাং শিক্ষাদান পদ্ধতির মৌলিক সমস্যা হল: কিভাবে শিক্ষার্থীর সামনে নতুন বিষয় উপস্থাপিত করা যায় যাতে শিশুর পুরাতন সঞ্চিত ভাবরাশির সংগে তা আত্মবীক্ষিত হয়ে যায়।

এ তত্ত্ব থেকে একটি মূল্যবান অনুসিদ্ধান্ত অনুসৃত হচ্ছে। হারবার্টের বিশ্বাস, শিক্ষক শিক্ষার্থীর ওপর আগ্রহ আরোপিত করতে পারেন। শিক্ষক অনেকাংশে শিশুর ব্যক্তিত্ব পরিবর্তিত বা সৃষ্ট করতে পারেন। বাইরের পরিবেশ বা ভাববস্তুকে নিয়ন্ত্রিত করে শিক্ষক শিক্ষার্থীর ওপর ইচ্ছামত প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। শিক্ষক প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী, শিক্ষক শুধু শিশুর সহায়ক নন্, স্রষ্টাও। শিক্ষক শিশুর ভাগ্যনিয়ন্তা। সম্ভবতঃ এ বিশ্বাস নিয়েই হারবার্ট শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে বলেছেন: শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিশুর নৈতিক জীবন ও চরিত্র গঠন। বলা বাহুল্য, তিনি শিক্ষা ও নৈতিকতাকে (Education and Morality) সমার্থক বলে ধরেছেন। শিক্ষা মানে নৈতিকতা। নৈতিকতা শুধু শিক্ষার লক্ষ্য নয়, শিক্ষা শুধু ব্যক্তিকে নৈতিকতা মণ্ডিত করে তোলে না, সমগ্র মানবতাকেও শিক্ষা নৈতিকতা মণ্ডিত করে তোলে।

২। হারবার্টের আগ্রহতত্ত্ব (Herbert's theory of Interest):

হারবার্টের আত্মবীক্ষণ তত্ত্বের সংগে তাঁর আগ্রহের তত্ত্বটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর আগ্রহই তাকে শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত করে। যে বিষয়ে শিশুর আগ্রহ নেই সে বিষয় শিশু শিখতে চায় না। গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায়

আমরা লক্ষ্য করেছি যে, শিশুর আগ্রহকে বিবেচনা না করেই পাঠ্যসূচী নির্ধারিত হয়েছে। শিশুর আগ্রহকে বিবেচনা না করার ফলে শিশুর স্বাধীনতাও অস্বীকৃত হয়েছে। শিশু-স্বাধীনতার সমর্থক আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌রা শিক্ষায় শিশুর আগ্রহকেই প্রধান বলে গণ্য করেন! তাঁরা বলেন, শিশুর আগ্রহই শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করবে। শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার এটা একটি প্রধান বক্তব্য।

গতানুগতিক শিক্ষায় শিশুর আগ্রহকে পাঠ্যসূচী নির্ধারণে বিবেচনা করা হয়নি বটে, কিন্তু শিক্ষাদানের সময় শিশুর আগ্রহের অভাব নানা সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। শিক্ষক তখন নানা প্রচেষ্টার (effort) দ্বারা শিশুকে আগ্রহী করে তুলতে চেষ্টা করতেন। শাস্তির ভয় এবং পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে শিশুকে পাঠে আগ্রহী বা মনোযোগী হবার জন্য বাধ্য করা হত। অর্থাৎ আগ্রহ ও প্রচেষ্টা দুটি ভিন্ন জাতীয় প্রক্রিয়া। যেখানে আগ্রহের অভাব সেখানে নানা প্রচেষ্টার দ্বারা আগ্রহ সৃষ্টি করতে হয়।

কিন্তু হারবার্ট আগ্রহ সম্বন্ধে একটি নতুন ব্যাখ্যা আমাদের উপহার দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য হল, আগ্রহ শিশুর খেয়ালী প্রকৃতির ওপর নির্ভর করতে পারে না। তাঁর মতে আগ্রহ আত্মবীক্ষণমূলক। অর্থাৎ শিশু-মনের সামনে যখন কোন নতুন ভাব উপস্থিত হয় তখন শিশু তাকে তার মনের সঞ্চিত ভাবরাশির সহিত সংযুক্ত করার চেষ্টা করে। তার ফলে নতুন ও পুরাতন ভাবের মধ্যে একটি সংঘাত উপস্থিত হয়। যদি এদের মধ্যে সাদৃশ্য থাকে তবে সংঘাতের দ্বারা একটি সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তখন মনের মধ্যে ভাবের একটি সম্মেলন উপস্থিত হয়। একেই তিনি আত্মবীক্ষিত ভাবপুঞ্জ নামে অভিহিত করেছেন। আমাদের সকল শিক্ষা এই আত্মবীক্ষিত ভাবপুঞ্জ বা মনের গহনে সঞ্চিত পুরাতন ভাবের মাধ্যমেই সম্ভব হয়। সুতরাং আগ্রহ হচ্ছে শিক্ষার্থীর নতুন ভাব সংগ্রহের প্রচেষ্টা। আগ্রহ এবং প্রচেষ্টা ভিন্ন জাতীয় মানসিক ক্রিয়া নয়। শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টা ছাড়া শিক্ষা সম্ভব নয়—এ কথার অর্থই হল আগ্রহ ছাড়া শিক্ষা সম্ভব নয়।

কিন্তু এ আগ্রহ কি স্বতঃস্ফূর্ত, না আরোপিত? 'আত্মবীক্ষণ'-এর সংব্যাখ্যানে হারবার্ট বলেছেন, শিক্ষক বাইরের পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত করে শিশু-মনে ভাব-সংঘাত সৃষ্টি করতে পারেন। তাহলে সকল আগ্রহ হবে আরোপিত। কিন্তু হারবার্ট লক্ষ্য করেছেন, শিক্ষার্থী স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নিজের আহরিত

ভাবরাশির সংগে নতুন ভাব বা ভাবরাশির সংযোগ সাধনেও আগ্রহী হয়। তখন তার আগ্রহ স্বতঃস্ফূর্ত। আর শিক্ষণ বা শিক্ষকের প্রভাবের বা বহিঃপরিবেশের দ্বারা শিশু-মনে যখন আগ্রহের সঞ্চার করা হয় তখন সে আগ্রহ আরোপিত।

উপসংহারে আমরা মন্তব্য করতে পারি, হারবার্টের শিক্ষাতত্ত্বে এই আরোপিত আগ্রহই বেশী মর্যাদা পেয়েছে। শিক্ষক শিশুকে এই আরোপিত আগ্রহের দ্বারাই পরিমার্জিত, পরিবর্তিত, পরিবর্ধিতও করে তুলতে পারেন।

৩। শিক্ষার দর্শনসম্মত বিশ্লেষণ (Philosophical analysis of education) :

শিক্ষার দার্শনিক আলোচনাই শিক্ষার সমস্যা নিরসনে সহায়তা করে। শিক্ষার লক্ষ্য ও ব্যাখ্যা একমাত্র দর্শনই দিতে পারে।[1]

দার্শনিক দৃষ্টিভংগী থেকে হারবার্ট ছিলেন বাস্তববাদী (Realist)। তিনি বিশ্বাস করতেন, পরিবেশের প্রচণ্ড প্রভাব রয়েছে ব্যক্তি-জীবনে। ভাববাদী (Idealist) দার্শনিকরা শিক্ষাকে ব্যক্তির সহজাত অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার বিকাশ বলে গ্রহণ করেছেন। তাতে পরিবেশ বা বস্তুজগতের অবদান বিশেষ নেই, আর থাকলেও সে অবদান কেবলমাত্র সহায়করূপে। কিন্তু হারবার্ট শিক্ষাকে ব্যক্তির মন ও পরিবেশের সংঘাতের ফলরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। শিক্ষক এখানে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। বাইরের পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করে শিশুর আত্মবীক্ষণকেও তিনি নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন। আর এভাবে তিনি শিক্ষাকেও নিয়ন্ত্রিত করে শিশুর জীবনে তার অভিপ্রেত আদর্শের সৃষ্টি করতে পারেন।

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে হারবার্ট বলেন, নৈতিকতা (Morality) শিক্ষার উদ্দেশ্য। ব্যক্তির আচরণকে, তার অভিজ্ঞতাকে ব্যক্তি ও মানবসমাজের মংগলাদর্শে নিয়ন্ত্রিত করা চাই। মানুষের আত্মা অখণ্ড এবং অবিভাজ্য। উহা কতকগুলি কর্মবৃত্তির সমষ্টি নয়। ব্যক্তির প্রতিটি আচরণের মধ্যে রয়েছে তার ব্যক্তিসত্ত্বার অচ্ছেদ্য বন্ধন। আর আত্মার এই বন্ধন স্বর্গ-মর্ত্য চরাচরে

1. "Education has no time to make holiday till philosophical questions are once for all cleared up."

ব্যাপৃত ('Whole choir of heaven and furniture of earth)।' ব্যক্তিসত্ত্বা বা চরিত্র একটি স্থির পদার্থ নয়, উহা গতিশীল। উহার সামগ্রিক বিকাশ নৈতিকতার মধ্যেই নিহিত। মানব চরিত্র সম্বন্ধে তিনি বলেন : 'চরিত্র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার উপর নির্ভরশীল, আকাঙ্ক্ষা আগ্রহের উপর, আগ্রহ চিন্তা বৃত্তের উপর নির্ভরশীল এবং একটি শক্তিশালী চরিত্র এই চিন্তা-বৃত্তের (circle of thought) ব্যাপক এবং সুসংহত অনুশীলন দ্বারা গঠন করা যেতে পারে।'[1]

তাই হারবার্ট বলেন, প্রতিটি শিক্ষার্থী হবে 'দার্শনিক' (Philosopher') এবং তারা যে জ্ঞান লাভ করবে সে জ্ঞান হবে সংহত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ, বিক্ষিপ্ত বা বিচ্ছেদপূর্ণ নয়।

৪। হারবার্টের শিক্ষাপদ্ধতি (Herbert's Method of Teaching) :

হারবার্টের শিক্ষাপদ্ধতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, উহা অনুবন্ধ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। অনুবন্ধ নীতির (Principle of Correlation) প্রধান বক্তব্য হল পাঠ্যসূচীর বিভিন্ন বিষয়কে এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যাতে শিক্ষার্থী একটি বিষয়ের সংগে অন্য বিষয়ের মৌলিক সম্বন্ধ বুঝতে পারে। এ পদ্ধতিকে তিনি কেন্দ্রীয়করণ পদ্ধতিও ('Unification of studies' or Concentration) বলেছেন। পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় বিষয় (core subject) থাকবে এবং অন্যান্য বিষয়কে এই বিষয়ের সংগে সংযোগ স্থাপন করে শিক্ষা দিতে হবে, তা না হলে শিক্ষার্থী সামগ্রিক জ্ঞান লাভ করবে না, তার অর্জিত শিক্ষায় নানা বিষয়ের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান থেকে যাবে।

পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত বিষয়াবলীর নির্বাচন প্রসংগে হারবার্ট বলেন, মানবজাতি তার অতীত ইতিহাসে যে সমস্ত স্তর পেরিয়ে প্রগতি লাভ করেছে সে সমস্ত স্তরের কৃষ্টিমূলক অভিজ্ঞতা পাঠ্যসূচীতে স্থান পাবে। তাঁর এই নীতি কৃষ্টি যুগতত্ত্ব (Cultural Epoch Theory) নামে অভিহিত হয়েছে।

---

1. "Character depends upon will, will upon desire, desire upon interest, and interest upon the circle of thought and a strong character can be formed only by cultivating an excessive and coherent circle of thought.',

এই সব দৃষ্টিভংগী থেকেই হারবার্ট তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি প্রণয়ন করেন। তিনি সম্যক অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে ব্যাপক এবং সুসংহত জ্ঞান লাভ করতে হলে একটি শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োজন। এই শিক্ষাপদ্ধতির লক্ষ্য হবে শিশুর স্বাভাবিক কর্মমূলক আচরণ এবং শিশু-মনের বিকাশের নীতির অনুগত হওয়া। এজন্য তাঁর পদ্ধতিকে বিকাশ বা উৎপত্তি সম্বন্ধীয় পদ্ধতিও (Developing or Genetic Method) বলা হয়। হারবার্ট তাঁর শিক্ষাপদ্ধতিকে পাঁচটি আকার-মূলক সোপানে (Five Formal Steps) ব্যক্ত করেন। আমরা নিম্নে এ পঞ্চ সোপানের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রদান করছি।

(i) **আয়োজন বা অবতারণা (Preparation or Introduction):** এ স্তরে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মনকে নতুন জ্ঞান আহরণের জন্য প্রস্তুত করেন। তিনি কয়েকটি অতি সাধারণ প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীর আত্মবীক্ষিত ভাবপুঞ্জের সংগে পরিচিত হবেন। এই প্রস্তুতি হবে খুব সংক্ষিপ্ত।

(ii) **উপস্থাপন (Presentation):** এ স্তরে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সামনে নতুন বিষয় অবতারণা করেন। কিন্তু এ স্তরে শিক্ষক যেন একটি বিষয়ের পর আর একটি বিষয়ের অবতারণা করে না চলেন। এ সময়েও যেন প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীর মনকে তিনি জানবার চেষ্টা করেন এবং তার সংগে সহযোগিতা করেন।

(iii) **বিষয় সম্মেলন (Association or Comparision):** এ স্তরে শিক্ষক নতুন ভাবধারার সংগে শিক্ষার্থীর আহরিত ভাবধারার সম্মেলন সৃষ্টি করেন। বিষয় সম্মেলনের ওপরই জ্ঞানের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। শিক্ষাপদ্ধতির এ সোপানটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শিক্ষার্থীর মনে জ্ঞানের সমন্বয় এ স্তরেই আনবার চেষ্টা করা হয়।

(iv) **সূত্র নির্ধারণ (Generalisation):** এ স্তরে শিক্ষার্থীকে তার অর্জিত ভাবরাশির মধ্যে সার্বিক (general) সূত্র নির্ধারণ শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষার্থী যে বিশেষ (particular) জ্ঞানলাভ করেছে, এই বিশেষ মূর্ত প্রকাশ থেকেই তাকে সার্বিক মূল সূত্রটি জেনে নিতে হয়।

(v) **প্রয়োগ বা অভিযোজন (Application):** শিক্ষাপদ্ধতির এই শেষ সোপানে শিক্ষার্থীকে তার জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করতে শেখান হয়। শিক্ষক যে-বিষয় শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করেছেন তার বাস্তব মূল্য শিক্ষার্থী নতুন

বা ভিন্ন পরিবেশে যাচাই করে নেয়। জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ না করা পর্যন্ত তার কোন মূল্য নেই। তাছাড়া, এ স্তরেই শিক্ষার্থীর অধীতবিদ্যার পরিমাপ করা হয়। কারণ মৌলিক সূত্রকে সে বাস্তবে নতুন ঘটনায় প্রয়োগ করতে কতটুকু সক্ষম তা এ স্তরেই ধরা পড়ে।

হারবার্টের পঞ্চ সোপান নীতির সমালোচনা (Criticism of Herbert's Five Formal Steps): হারবার্টের পঞ্চ সোপান পদ্ধতিকে অধুনা শিক্ষাদান পদ্ধতিতে নীতিগতভাবে গ্রহণ করা হয়। শিক্ষাকে ব্যক্তিমুখী করে তোলা এবং শিক্ষাদান কার্যকে সার্থকভাবে সম্পন্ন করা—এ দুই-ই এ পঞ্চ সোপান পদ্ধতির উদ্দেশ্য।

কিন্তু শিক্ষাদানের একটি মৌলিক নীতিকে এ পদ্ধতি লংঘন করেছে বলে অনেকে অভিযোগ করেছেন। শিক্ষাদান একটি স্বতঃস্ফূর্ত মানসিক প্রক্রিয়া। ছক কেটে কৃত্রিম ছন্দে শিক্ষাদান করা যায় না। শিক্ষাদান একটি অখণ্ড, অবিভাজ্য কাজ। একে এভাবে পাঁচটি স্তরে ভাগ করলে শিক্ষাদান কৃত্রিম হয়ে পড়বে।

তাছাড়া, বাস্তবে এ পদ্ধতি গ্রহণ করাও অসুবিধাজনক। বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এ পদ্ধতিকে অবলম্বন করলে পাঠের অগ্রগতি অসম্ভব হয়ে পড়বে এবং শিক্ষাদান বিলম্বিত তালে চলবে। সম্ভবতঃ এজন্য পঞ্চ সোপান নীতিটিকে সংক্ষিপ্ত আকারে বর্তমান শিক্ষা ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।

এ পদ্ধতি সম্বন্ধে আমাদের আর একটি বক্তব্য হল এই যে, শিক্ষাদান কাজের বিচিত্র গতি বর্তমান। কয়েকটি নির্দিষ্ট স্তরে বা বিশেষ কোন পদ্ধতিতে এ কাজকে সীমায়িত করা যায় না।

৫। শিক্ষাতত্ত্বে হারবার্টের অবদান (Contributions of Herbert to the theory and practice of education):

রুশো এবং পেস্টালৎসী শিক্ষাতত্ত্বে যে বাণী বহন করে আনেন তাকে নতুন ব্যাখ্যা ও নতুন সংযোজনের দ্বারা হারবার্ট সুপ্রতিষ্ঠিত করে তোলেন। শিক্ষাকে দর্শনসম্মত এবং মনস্তত্ত্বসম্মত ব্যাখ্যার দ্বারা একটি সার্বিক রূপ দেবার চেষ্টা হারবার্টের পূর্বসূরীরা করে গেছেন। শিক্ষাতত্ত্বে দর্শন এবং মনস্তত্ত্ব যে

পরম সহায়ক এ সত্যও তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে এ সত্যের রূপায়ণে যে মননশীলতা ও প্রতিভার প্রয়োজন রুশো বা পেস্টালৎসী কারও তা ছিল না। প্রতিভাধর দার্শনিক হারবার্ট তাঁর পূর্বসূরীদের অসমাপ্ত কাজকে সম্পন্ন করেন। তিনিই সর্বপ্রথম শিক্ষার দার্শনিক এবং মনস্তাত্ত্বিক সংব্যাখ্যান প্রদান করেন।

হারবার্টের নাম পদ্ধতি-তত্ত্বের (Methodology) ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। তাঁর আগে শিক্ষার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিয়েই শিক্ষাবিদ্‌রা ব্যস্ত ছিলেন। শিক্ষাদান পদ্ধতির গুরুত্ব সম্বন্ধে যে তাঁরা অবহিত ছিলেন না বা কোন শিক্ষাদান পদ্ধতির আলোচনা যে তাঁরা করেননি, এ কথা বলা চলে না। তবে বিজ্ঞানসম্মত, বাস্তবধর্মী কোন শিক্ষাপদ্ধতি তাঁরা সৃষ্টি করে যেতে পারেননি। হারবার্টের 'পঞ্চ সোপান নীতি' শিক্ষাপদ্ধতির ইতিহাসে তাই এক অবিস্মরণীয় দান। তাঁর সুদীর্ঘ গবেষণা এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ওপর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপদ্ধতি শিক্ষাতত্ত্বে বহুদিনের একটি অভাব পূরণ করেছে। পরবর্তী যুগে ডিউই, কিল্‌প্যাট্রিক প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্‌রা শিক্ষাপদ্ধতি পরিকল্পনায় হারবার্টের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত হয়েছিলেন।

হারবার্টের 'আগ্রহতত্ত্ব' আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। শিক্ষাকে আগ্রহভিত্তিক করে তোলার কথা রুশোও বলেছেন। কিন্তু হারবার্টের আগে আর কেহই 'আগ্রহ' সম্বন্ধে কোন মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং শিক্ষাকে আগ্রহভিত্তিক করে তোলার এমন সক্রিয় পন্থা নির্দেশ করে যেতে পারেননি।

আধুনিক শিক্ষাদর্শনের (Educational Philosophy) যে গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হচ্ছে তার মূলে হারবার্টের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। কোন দার্শনিক দৃষ্টিভংগী বা দার্শনিক সত্যের ওপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত না হলে শিক্ষা সার্বিকরূপ পেতে পারে না, এ সত্য তিনি বুঝেছিলেন। এজন্যই শিক্ষাকে দর্শনসম্মত করে তোলার জন্য তিনি অনলস গবেষণা করে গেছেন।

এ সব কারণে প্রচুর ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও শিক্ষাতত্ত্বের ইতিহাসে হারবার্ট একজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হয়ে থাকবেন।

কিণ্ডারগার্টেনের জনক

ফ্রেডারিক ফ্রয়েবেল (Freidrich Froebel)

(১৭৮২—১৮৫২ খ্রীঃ)

পেস্টালৎসীর শিক্ষাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শিক্ষাকে মনস্তত্ত্বসম্মত করে তোলার জন্য ফ্রয়েবেল এগিয়ে এলেন। তিনি ছিলেন পেস্টালৎসীর সমসাময়িক এবং তাঁরই শিষ্য। পেস্টালৎসীর দর্শন ও মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে কোন বিদ্যালয়ীয় শিক্ষা ছিল না। এজন্য তাঁর শিক্ষাতত্ত্বের সকল বক্তব্যকে যুক্তিপূর্ণ বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা তিনি প্রতিষ্ঠিত করে যেতে পারেননি। ভাববাদী দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ফ্রয়েবেল শিক্ষার নতুন ব্যাখ্যা নিয়ে উপস্থিত হন। তাঁর শিক্ষানীতিকে তিনি শিশুদের ওপর প্রয়োগ করবার জন্য ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন, কিন্তু অর্থের অভাবে এই বিদ্যালয়ের অপমৃত্যু হয়। তবুও তিনি তাঁর শিক্ষানীতি নিয়ে গবেষণা করে চলেন এবং তাঁর গবেষণার ফলস্বরূপ ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে '*The Education of Man*' বইটি প্রকাশিত হয়। তিনি অনুধাবন করলেন যে শিক্ষা সংস্কার প্রাথমিক শিক্ষা স্তরেই অত্যন্ত প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে ১৮৩৭ খ্রীঃ জার্মানীর ব্ল্যান্‌কেন্‌বার্গ শহরে চার থেকে ছয় বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের খেলার মাধ্যমে শিক্ষা দেবার জন্য তিনি একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এই বিদ্যালয়ের নাম দেন 'কিণ্ডারগার্টেন' (Kindergarten)। 'কিণ্ডারগার্টেন' শব্দের ভাষাগত অর্থ হল 'শিশু-উদ্যান'। এ বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য হল, শিশুদের দেহ এবং ইন্দ্রিয় অনুশীলনে সুযোগ দেওয়া, সকল জীবনের মূলীভূত স্তরে (original ground of all life) বা আধ্যাত্মিক ঐক্যে এগিয়ে দেওয়া।

১। ফ্রয়েবেলের শিক্ষাতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Froebel's theory of education) :

ফ্রয়েবেল কাণ্ট, হেগেল, ফিক্‌টে এবং শিলিং প্রভৃতি ভাববাদী (Idealist) দার্শনিকদের ভাবধারায় বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হন এবং তিনি নিজেও ভাববাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এই সব দার্শনিকদের তত্ত্ব থেকে তিনি বিশ্বের বিবর্তন সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর শিক্ষাতত্ত্বে বিবর্তনবাদ (Principle

of evoluti(n)-কে প্রয়োগ করে শিক্ষার সংজ্ঞাদান প্রসংগে তিনি বলেছেন, শিক্ষা হল, ব্যক্তি-মানুষের জীবনে বিবর্তনের যে চরম পর্যায় প্রকাশিত হয়েছে তা অনুধাবন করা। শিক্ষার কাজ হল, শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশকে একটি পর্যায় থেকে আর একটি পর্যায়ে উন্নীত করার চেষ্টা। ব্যক্তির এই জীবন বিকাশের একমাত্র মাধ্যম হল তার স্বতঃস্ফূর্ত খেলা।

এর আগে রুশো শিক্ষাকে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার স্বাধীন এবং স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ প্রক্রিয়ার সংগে তুলনা করেছেন। কিন্তু রুশোর সংগে ফ্রয়েবেলের পার্থক্য হল, রুশো যেখানে ব্যক্তির বিকাশকে প্রাকৃতিক (natur ') বলে গণ্য করেছেন, ফ্রয়েবেল তাকে আধ্যাত্মিক (spiritual) পরিণতি বলে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সমগ্র বিশ্ব এক আধ্যাত্মিক পরম চেতনায় বিধৃত। সেই অখণ্ড বিশ্বচেতনার মূর্ত প্রকাশ এই জগৎ ও জীবন। বলা বাহুল্য, হেগেলের বস্তুনিষ্ঠ ভাববাদ (objective idealism) ফ্রয়েবেলের মনে তীব্র প্রভাব বিস্তার করেছিল।

শিক্ষার এই দার্শনিক ব্যাখ্যাকে ফ্রয়েবেল তিনটি নীতির দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন—আত্মসক্রিয়তা, আধ্যাত্মিক একতা এবং উন্মেষণ তত্ত্ব। আমরা নিম্নে ফ্রয়েবেলের তিনটি নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করছি। এ তিনটি নীতিই মূলতঃ এক এবং বিশ্বের মূলনীতি অর্থাৎ পরমচেতনা সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাসকে সমর্থন করে।

(i আত্ম সক্রিয়তাতত্ত্ব (Theory of Self-Activity): ফ্রয়েবেল তাঁর দার্শনিক আলোচনা থেকে শিক্ষাতত্ত্বে প্রতিটি শিশুর আত্মসক্রিয়তাকে একটি মূলনীতি বলে গ্রহণ করেন। প্রতিটি শিশুর মন সৃজনশীল শক্তিতে (creative energy) পূর্ণ। আমরা শিক্ষার দ্বারা শিশুর এই আত্ম-সক্রিয়তাকেই বাস্তবে প্রকাশ করার চেষ্টা করি। আত্মসক্রিয়তা শিশু-মনের নিছক একটি গুণ নয়, আত্মসক্রিয়তাই শিশুর অস্তিত্ব। এই আত্মসক্রিয়তাকে ব্যাখ্যা করে ফ্রয়েবেল বলেছেন, উহা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই শিশু-মনে দেখা দেয়। শিশুকে সক্রিয় করে তোলার জন্য কোন পরিবেশ বা প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না।

ফ্রয়েবেলের আত্মসক্রিয়তাতত্ত্বের সংগে তার খেলার তত্ত্ব (Theory of Play) জড়িত। খেলাই হচ্ছে শিশু-মনের সক্রিয়তার স্বতঃস্ফূর্ত বৈশিষ্ট্য। খেলার সংজ্ঞা প্রদর্শনে ফ্রয়েবেল বলেন: শিশু-মনের আভ্যন্তরীণ চাহিদা ও

তাড়না থেকে উদ্ভূত শিশু-মনের আভ্যন্তরীণ সক্রিয়তার বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে খেলা। শিক্ষা হচ্ছে জীবনের বিকাশ প্রক্রিয়া, আর আত্মসক্রিয়তাই তা সম্ভব করে তোলে। এই আত্মসক্রিয়তাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিশুর খেলার মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করে। সুতরাং খেলার শিক্ষামূলক দিকটি খুবই মূল্যবান। এজন্য তাঁর 'কিণ্ডারগার্টেন' বিদ্যালয়ে খেলাকে তিনি শিক্ষার অংগরূপে গ্রহণ করেন। দৈহিক সঞ্চালনমূলক খেলা ছাড়াও খেলার মধ্যে তিনি সংগীত, ছবি আঁকা প্রভৃতি গ্রহণ করেন। খেলার মাধ্যমেই শিশু বহির্বিশ্বের সংগে পরিচিত হয়ে সামাজিক গুণাবলী অর্জন করে। খেলা সম্বন্ধে ফ্রয়েবেল বলেন, খেলা কোন তুচ্ছ বস্তু নয়, খেলার অশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ফুল যেভাবে কলি থেকে বিকশিত হয়, সেভাবে শিশু খেলার সাহায্যে আনন্দের মধ্যে বর্ধিত হয়, আর আনন্দই এ বয়সে শিশুদের সকল কর্মের প্রাণ।[1] অন্যত্র তিনি খেলাকে শিশুর অন্তরের আধ্যাত্মিকতার প্রতীক বলেও বর্ণনা করেছেন।

(ii) **আধ্যাত্মিক ঐক্য (Divine Unity)**: এ দৃশ্যমান জগতে যা আমরা দেখি, এই জড় প্রকৃতি বা মানুষের জীবনে যে বৈচিত্র্য, যে বহু (plurality) আমরা প্রত্যক্ষ করি, এ সবই এক আধ্যাত্মিক চেতনায় (Spiritual Consciousness) গ্রন্থিবদ্ধ বা ঐক্যবদ্ধ। বিশ্বচরাচর এই পরমসত্তার বৈচিত্র্যময় প্রকাশ। বিশ্বের অর্থ বা স্বরূপ এই পরমসত্তা বা ঈশ্বরের ('God is the essential nature, the meaning of the world') মধ্যেই নিহিত। এই এক ও অনন্য পরমসত্তার প্রকাশই প্রকৃতিতে এবং মানব জীবনে আমরা লক্ষ্য করি। সুতরাং প্রকৃতি ও মানব এ দুয়ের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই, প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য তার শক্তি (Force) মানুষের বৈশিষ্ট্য তার চেতনা (consciousness)। এজন্য ফ্রয়েবেল প্রকৃতিবীক্ষণকে (nature-study) তাঁর শিক্ষাতত্ত্বে প্রচুর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে প্রকৃতিই শিশুর কাছে ঈশ্বরকে প্রকাশিত করে। প্রকৃতিকে অনুধাবন করা শিশুর জীবন বিকাশে অপরিহার্য। এই প্রকৃতিবীক্ষণের সাহায্যে শিশু বাহিরকে অন্তর আর অন্তরকে বাহির করবে

1. "We should not consider play as a frivolous thing. On the contrary, it is a thing of profound significance. By means of play, the child expands in joy as the flower expands when it proceeds from the bud, for joy is the soul of all the actions of that age."

(making inner outer and outer inner)। অবশ্য খেলাও এতে সহায়ক।

এই আধ্যাত্মিক ঐক্য-তত্ত্ব থেকে ফ্রয়েবেল শিক্ষাকে আত্মোপলব্ধি বলে ব্যাখ্যা করেছেন। যেহেতু শিশুর আত্মাই পরমসত্তার প্রকাশ, নিজের আত্মাকে জানা মানে ঈশ্বরকে জানা। আর এই আত্মোপলব্ধিই শিশুর জীবনে ক্রম বিকাশের স্তরে দেখা দেয়। এ প্রসংগে তার উন্মেষণ-তত্ত্বটি প্রণিধানযোগ্য।

(iii) উন্মেষণ-তত্ত্ব (Theory of Unfoldment): ফ্রয়েবেল বিশ্বাস করেন, শিশুর আত্মোপলব্ধি বা জীবন বিকাশ একটি ক্রমাবর্তনের পথে চলে। এটা একমুখী। শিশু ভবিষ্যতে কি পরিণতি লাভ করবে তার সকল সম্ভাবনা শৈশবেই নিহিত থাকে। শিশুর সহজাত অন্তর্বাসী সম্ভাবনাই বিভিন্ন স্তরে নানা বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমে পরিণতি লাভ করে। এই বিচ্ছিন্ন প্রকাশ মূলতঃ এক, কারণ আধ্যাত্মিক চেতনাই সকল স্তরে উন্মেষিত হচ্ছে। আর শিক্ষা এই জীবন বিকাশ বা উন্মেষণ ছাড়া কিছুই নয়।

২। ফ্রয়েবেলের শিক্ষা পদ্ধতি (Froebel's Method of Teaching):

ফ্রয়েবেল তাঁর শিক্ষা পদ্ধতিতে পেস্টালৎসীর বস্তুভিত্তিক পাঠের (Object Lesson) পদ্ধতিকে রূপান্তরিত আকারে গ্রহণ করেন। মন্টেসরীর শিক্ষামূলক সরঞ্জামের (Didactic Apparatus) মত তিনিও কতকগুলি শিক্ষামূলক সরঞ্জামের উদ্ভাবন করেন যাতে এই সরঞ্জামগুলি ব্যবহারের দ্বারা শিশুরা কতকগুলি নির্দিষ্ট ভাবধারার সংগে পরিচিত হতে পারে। পেস্টালৎসী অসংখ্য মূর্তবস্তু শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরেন, তার প্রধান বক্তব্য ছিল, এগুলি ব্যবহারের দ্বারা শিশুর ইন্দ্রিয়ানুশীলন হবে, তাদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, শিক্ষা বাস্তবধর্মী হবে। এসব বস্তুকে তিনি কোন ভাবের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করেননি। কিন্তু ফ্রয়েবেল কয়েকটি নির্দিষ্ট মূর্তবস্তু (materials)-কে তার শিক্ষাপদ্ধতিতে কয়েকটি ভাবের প্রতীক (symbol) হিসেবে গ্রহণ করেন। এই মূর্তবস্তুগুলির সাহায্যে শিশু কাজ করবে, খেলবে। তাঁর উদ্ভাবিত মূর্তবস্তুর সামাজিক, বৈজ্ঞানিক এবং গাণিতিক মূল্য রয়েছে বলে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন।

ফ্রয়েবেলের এই মূর্তবস্তুগুলি দুই জাতের। এক দলের নাম 'উপহার' (Gifts), অন্যদলের নাম 'কাজ' (Occupation)। 'উপহারের' মধ্যে রয়েছে নরম উলের বল। এই রঙিন উলের বল শিশুদের কাছে খুব আকর্ষণীয় খেলার বস্তু। খেলার সাথে তারা বলের রঙ সম্বন্ধে পার্থক্য বা তুলনা করা শিখবে। তারপর 'উপহারের' মধ্যে রয়েছে কাঠের ঘনাকৃতি (cube) বা বেলনাকারের বস্তু। এর দ্বারা বিভিন্ন আকৃতি, বা আকার সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর ধারণা জন্মাবে। ফ্রয়েবেল দুই ইঞ্চির একটি ঘনাকৃতি বস্তুকে আটটি ভাগে ভাগ করেছেন। এ বস্তুর ব্যবহারের দ্বারা শিক্ষার্থী সমগ্র, অংশ, অর্ধেক, চতুর্থাংশ বা অষ্টাংশ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করবে। এ ছাড়াও নানা দৈর্ঘ্যের লাঠি, নানা পরিধির রিং (ring) 'উপহারের' মধ্যে রয়েছে। এসব ব্যবহারের মাধ্যমে শিশু গাণিতিক জ্ঞান বা অমূর্ত ধারণার সংগে পরিচিত হবে। তাছাড়া, এ 'উপহার'গুলি যখন শিশুরা ব্যবহার করবে তখন যদি কোন ভুল করে, তবে তারা নিজেরাই ভুল শোধরাতে পারবে এরূপ ব্যবস্থা রয়েছে এই পদ্ধতির মধ্যে। তারপর শিশুরা যখন মোটামুটিভাবে ভাব সংগ্রহে সক্ষম হয়ে যাবে তখন তাদের সামনে অধিকতর কল্পনা-বিস্তারী শিক্ষামূলক সরঞ্জাম হিসেবে সিঁড়ি, দোলনা, দড়ি, মই ইত্যাদি তুলে দিতে হবে। এই 'উপহার'গুলি নির্দিষ্ট স্থিরবস্তু, শিশুরা এদের মধ্যে কোন পরিবর্তন আনতে পারে না। কিন্তু 'কাজ' পরিবর্তনশীল মূর্তবস্তু, শিশুরা এগুলির ওপর তাদের ইচ্ছামত আকার প্রদান বা পরিবর্তন করতে পারে। 'কাজ'গুলি হচ্ছে প্রধানতঃ মাটির কাজ (clay-modelling), কার্ড বোর্ডের কাজ (cardboard-modelling), কাঠের কাজ (wood-carving), রঙ ও তুলির কাজ (brush-work in colour) ইত্যাদি

'কাজ' ও 'উপহারের' যে পার্থক্য ওপরে উল্লিখিত হল ফ্রয়েবেল সব সময় তা মেনে চলেননি। তিনি এক জায়গায় 'কাজ'কে সকল প্রকার সক্রিয়তা এবং এ সক্রিয়তার মূর্তবস্তু (materials)-কে 'উপরহার' বলে ব্যাখ্যা করেছেন। সে যা হোক, কাজের মধ্য দিয়ে ফ্রয়েবেল চেয়েছেন শিশুর উদ্ভাবনী শক্তি ও নৈপুণ্য (skill) বৃদ্ধি করতে, আর 'উপহারের' মাধ্যমে চেয়েছেন অন্তর্দৃষ্টি এবং ভাব সংগ্রহের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে।

বস্তুভিত্তিক পাঠের সংগে ফ্রয়েবেল নানা রকম নার্সারি গানও তার শিক্ষা পদ্ধতিতে গ্রহণ করেন। গান, গল্প বলা, খেলাধুলা প্রভৃতির গুরুত্ব পেস্টালৎসীর শিক্ষা পদ্ধতিতে অপরিসীম। এই সক্রিয়তাই শিশু-মনের প্রাণ, তার আত্মবিকাশের সহায়ক। সুতরাং শিক্ষক শিক্ষাদানে এগুলিকে যথাসম্ভব গ্রহণ করবেন।

ফ্রয়েবেল তাঁর শিক্ষাপদ্ধতিতে শিশুকে সমাজধর্মী করে তোলার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। 'উপহার', 'কাজ', 'খেলা' প্রভৃতি শিশুর সমাজ চেতনার সহায়ক। ভাববাদী আধ্যাত্মিক ঐক্যে বিশ্বাসী ফ্রয়েবেল বলেন যে, আধ্যাত্মিক ঐক্যের ধারণার সংগে শিশুর পরিচয় ঘটলেই সে সামাজিক হয়ে উঠবে, সকলের সংগে তার অন্তর্নিহিত সম্পর্ক বা একাত্মবোধ জাগবে। গোলাকার বল শুধু খেলার সামগ্রী নয়, উহা ফ্রয়েবেলের কাছে আধ্যাত্মিক একতার প্রতীক এবং শিশু খেলার মধ্যে এ ধরনের ভাবের সংগে পরিচিত হবে। সমবেত কর্ম, সহযোগিতা মূলক আচরণ তাঁর কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। বিদ্যালয়কে শিশুর কাছে সমাজরূপে সৃষ্টি করার জন্য ফ্রয়েবেলের চেষ্টার অন্ত ছিল না।

রুশোর মত ফ্রয়েবেলও পুস্তককেন্দ্রিক শিক্ষার চরম বিরোধী ছিলেন। তিনি তাঁর শিক্ষাপদ্ধতিতে গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণ, বাগান করা, পশু-প্রাণীর যত্ন প্রভৃতি কাজে শিশুকে উৎসাহিত করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন পঠন ও লিখন যদিও প্রয়োজনীয়, তবুও এসব শিক্ষার্থীকে পৃথিবীর বাস্তব জগতের সংগে পরিচিত করে তোলে না। ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি বলেন, শিশুদের ভাষা শিক্ষার জন্য সহজাত প্রবণতা রয়েছে। প্রথমতঃ, তারা ভাষা ও বস্তুর মধ্যে কোন পার্থক্য ধরতে পারে না। পরে ভাষা শেখার পর বস্তুর সংগে তার বিভেদটুকু বুঝতে পারে।

ফ্রয়েবেল কায়িক পরিশ্রম বা হাতের কাজের ওপর তাঁর শিক্ষাপদ্ধতিতে প্রচুর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। রুশো এবং পেস্টালৎসীও কায়িক পরিশ্রম বা শিল্পমূলক কাজ তাঁদের শিক্ষাতত্ত্বে গ্রহণ করেছিলেন। শিক্ষার্থীকে সক্রিয় করে তোলা বা ইন্দ্রিয়ানুশীলনে সহায়তা করা ছিল পেস্টালৎসীর উদ্দেশ্য। আর রুশো শ্রমের মর্যাদা এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেবার জন্য তাঁর শিক্ষাতত্ত্বে শিল্প (trade)-কে গ্রহণ করেছিলেন। ফ্রয়েবেলই সর্বপ্রথম কায়িক শ্রমের শিক্ষামূলক

দিকটি আমাদের সামনে তুলে ধরেন। শ্রমের মাধ্যমেই সক্রিয়তা সম্ভব। শিশুর আত্মসক্রিয়তা তার কর্মবৃত্তির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

৩। শিক্ষাতত্ত্বে ফ্রয়েবেলের অবদান (Contributions of Froebel to the theory and practice of education) :

ফ্রয়েবেলের নাম যাঁরা জানেন না তারাও কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ের নাম শুনেছেন, এতে ফ্রয়েবেলের শিক্ষাপদ্ধতির বিপুল জনপ্রিয়তা সূচিত হয়। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রয়েবেলের কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী পৃথিবীর সর্বদেশের শিক্ষাবিদ্ ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিরা পালন করেছেন। এতে আধুনিক শিক্ষাজগতেও তাঁর প্রভাব প্রমাণ করে।

হারবার্ট শিক্ষাকে দর্শনসম্মত করে তোলার চেষ্টা করেন এবং শিক্ষাদর্শনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। কিন্তু শিক্ষার সার্থক দর্শনসম্মত ব্যাখ্যা ফ্রয়েবেলই প্রদান করেন। পরবর্তী যুগে জন ডিউই শিক্ষাতত্ত্ব এবং দর্শনের মধ্যে যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপন করেন, তারই প্রথম পর্ব ফ্রয়েবেল সমাধা করেন। তিনি শুধু কিণ্ডারগার্টেনের জনক নন শিক্ষাদর্শনেরও একজন সার্থক প্রতিষ্ঠাতা।

ফ্রয়েবেল তার বিদ্যালয়ে শিশুদের সামাজিক আচরণের ওপর গুরুত্ব দিতেন। সকল মানুষের জীবন এবং এই বিশ্ব একই পরমসত্তায় বিধৃত। অতএব প্রতি মানুষের সংগে রয়েছে আমাদের নাড়ির বন্ধন, আত্মার আত্মীয়তা। শিশুরা বিদ্যালয়ে এ সত্য উপলব্ধি করবে—এ ছিল ফ্রয়েবেলের ইচ্ছা। 'বিদ্যালয়ই সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ', শিক্ষাতত্ত্বের এই আধুনিক পরিকল্পনার জনক হলেন ফ্রয়েবেল। পরবর্তী যুগে শিক্ষায় সামাজিক আদর্শের প্রবক্তা ডিউই এ পরিকল্পনার আরও ব্যাপক এবং গভীর ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং বলাবাহুল্য, তিনি ফ্রয়েবেলের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

শিশু শিক্ষার গুরুত্ব সম্বন্ধে ফ্রয়েবেলের আগে অনেকেই অবহিত ছিলেন। কিন্তু শিক্ষার্থীর জীবনের পরবর্তী স্তরের শিক্ষার বুনিয়াদ যে তার শৈশবের শিক্ষায় রচিত হয়ে যায় এই সত্যটি ফ্রয়েবেলের মত আর কেহই এমন গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করতে পারেননি।

ফ্রয়েবেলের শিক্ষাপদ্ধতিতে খেলা, গান, 'কাজ' ও 'উপহার' প্রভৃতি স্থান লাভ করেছে। ফলে শিশুর কাছে তার বিদ্যালয় যেমন হয়েছে আকর্ষণীয়, তেমনি শিক্ষা গ্রহণও হয়েছে সহজ ও সুন্দর।

শিশুরা যতদিন বাঁচবে কিণ্ডারগার্টেনও ততদিন বাঁচবে আর সে সংগে ফ্রয়েবেলের নামও অমর হয়ে থাকবে।

কিন্তু ফ্রয়েবেলের ভাববাদী দর্শনের বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্য হল এই যে, এতে আত্মার উন্মেষণের ওপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে তার সহজাত সম্ভাবনা বা বংশধারাই সব নয়, পরিবেশের প্রভাবও রয়েছে। কিন্তু ফ্রয়েবেল পরিবেশের ওপর কোন গুরুত্ব দেননি। ফলে মানব সমাজের পরিবর্তনের ইতিহাস, পরিবেশের অবদান এ সবের কোন মূল্য স্বীকৃত হয়নি। অথচ শিক্ষা পরিবেশেরই একটি অংগ। তা হলে শিক্ষারও কোন গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা থাকে না।

ফ্রয়েবেল রুশোকে অনুসরণ করে পুস্তক পাঠের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেছেন এবং পঠন বা লিখনকে তার শিক্ষাপদ্ধতিতে শেষ স্তরে রেখেছেন। ভাষাজ্ঞান মোটেই শিক্ষাবিরোধী হতে পারে না, ইহা চিন্তার সহায়ক। শিক্ষার্থী তার ভাষাজ্ঞানের মাধ্যমেই তার পূর্বপুরুষের অর্জিত অভিজ্ঞতার সংগে পরিচিত হতে পারে। সুতরাং শিশু শিক্ষায় লিখন ও পঠনকেও গুরুত্ব দেওয়া একান্ত কর্তব্য।

ফ্রয়েবেলের প্রতীকমূলক শিক্ষা-সরঞ্জামকে অনেকেই সমালোচনা করে বলেছেন যে, শিশুর পক্ষে অমূর্ত ভাব সংগ্রহ কঠিন ব্যাপার। 'গোলাকার বল' থেকে 'আধ্যাত্মিক ঐক্য' অনুভব করা শিশু-মনের পক্ষে সম্ভব নয়।

শিশু-ভবনের জননী

মারিয়া মণ্টেসরী (Maria Montessore)

(১৮৭০-১৯৫২ খ্রীঃ)

ইতালীর মারিয়া মণ্টেসরী শিক্ষাতত্ত্বে অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাসংস্কারের মূল ভাবধারায় এক সুনির্দিষ্ট রূপ ধারণ করে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে রোমে তিনি তাঁর শিশু-ভবন (Children's house or casa dei Bambini)

প্রতিষ্ঠা করেন। গতানুগতিক শিক্ষাপ্রথা বিশেষভাবে শ্রেণীপ্রথার বিলোপ করে মণ্টেসরী তাঁর শিশু-ভবনে শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষার্থীর পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেন। এভাবে মণ্টেসরী শ্রেণী-শিক্ষার পরিসমাপ্তি সংগীত গেয়েছেন।[1]

১। মণ্টেসরীর শিক্ষাতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য (Features of Montessorie's theory of education) :

মণ্টেসরীর শিক্ষাতত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা ও সক্রিয়তা, স্বয়ং শিক্ষণ, স্বতঃস্ফূর্ত বা অন্তর্জাত শৃংখলা, গতানুগতিক শ্রেণীপ্রথার বিলোপ এবং শিক্ষকের স্থান পরিবর্তন এবং বস্তুভিত্তিক পাঠের ব্যবস্থা ইত্যাদি। আমরা নিম্নে এ বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে আলোচনা করছি :

(ক) শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা ও সক্রিয়তা Child's freedom and activity) : আধুনিক শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার প্রধান বক্তব্য হল শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা। রুশো, পেস্টালৎসী, ফ্রয়েবেল প্রভৃতি শিক্ষাগুরু শিশুর স্বাধীনতাকে শুধু সমর্থন করেননি, তাঁদের সমগ্র শিক্ষানীতি শিশুর স্বাধীনতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু শিক্ষার্থীর স্বাধীনতার সঠিক ও বাস্তবধর্মী ব্যাখ্যা সম্ভবতঃ মণ্টেসরীরই প্রথম প্রদান করেন। মণ্টেসরী বলেন, শিশুর ইচ্ছানুযায়ী বাধাহীন আচরণই স্বাধীনতা নয়। স্বাধীনতাকে তিনি আরও ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছেন। 'স্বাধীনতা' শব্দের নেতিবাচক (negative) এবং ইতিবাচক (positive) দুটি দিক আছে। শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর স্বাধীনতাকে আমরা শ্রেণী-প্রথা, শিক্ষকের শাসন, শাস্তির ভয় বা পুরস্কারের প্রলোভন আর নানা অনুশাসনের দ্বারা সংকীর্ণ ও শৃংখলিত করে রেখেছি। প্রথমতঃ, এই সকল প্রকার বন্ধন থেকে শিশুর আচরণকে মুক্তি দিতে হবে। তার কোন আচরণে, চাহিদায় বাধা সৃষ্টি করা হবে না। সকল রকম প্রথা এবং বাধা-নিষেধে অপসারণ করা চাই। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, শিশুর যথেচ্ছচারিতাকে আমরা মেনে নিচ্ছি। স্বাধীন শিশু হল সেই শিশু যে শিশু নিজের অধীন। এ স্বাধীনতা হচ্ছে, শিশু ক্রমাবর্তনের পথে যে আত্মসংযম (Self control) এবং আত্ম-পরিচালনে (Self direction) অভ্যস্ত হয় সে আচরণ। এইটেই হচ্ছে

1. "The Knell of class teaching was rung by Montessori."

স্বাধীনতার ইতিবাচক অর্থ। সুতরাং স্বাধীনতা উদ্দাম অসংযত আচরণ নয়। উহা শিশুর অন্তরের বিবেকবোধ ও নীতিবোধের সংগে জড়িত।

মণ্টেসরীর শিক্ষাতত্ত্বে এই স্বাধীনতাই মূল সূত্র। শিক্ষাতত্ত্বের নীতি বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন : স্বাধীনতাই প্রথম, স্বাধীনতাই দ্বিতীয়, স্বাধীনতাই শেষ (Freedom first, Freedom second and Freedom last)। বিদ্যালয়ে কোন বাইরের চাপ, কোন সুনির্দিষ্ট রুটিনের কাজ (routine work), এমনকি কোন সময়-তালিকাও থাকবে না। শিক্ষার্থী নিজের ইচ্ছানুযায়ী শিক্ষায় প্রবৃত্ত হবে, আর তার নিজস্ব ক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষায় এগিয়ে যাবে।

মণ্টেসরী শিশুর স্বাধীনতার সংগে শিশুর সক্রিয়তাকেও গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন, স্বাধীনতা এবং সক্রিয়তা সমার্থক (Liberty is Activity)। সক্রিয়তাই প্রাণের ধর্ম আর এই সক্রিয়তাই হবে শিক্ষার ভিত্তি। শিক্ষার শুরুতেই সক্রিয় আচরণে শিশুকে উৎসাহিত করা চাই, আর এই সক্রিয়তাই শিশু-মনের স্বাধীনতা। শিশুর স্বাধীন আচরণ শুধু তার সক্রিয়তা নয়, এর ফলে তার অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্ভাবনা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে ওঠে, পূর্ণতা লাভ করে।

(খ) **স্বয়ং শিক্ষণ (Auto-education) :** মণ্টেসরী আত্ম-সক্রিয়তা বা স্বাধীনতা থেকে উদ্ভূত হয়েছে তাঁর স্বয়ং-শিক্ষণ বা আত্ম-শিক্ষার এই মৌলিক নীতিটি। মণ্টেসরীর মতে শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা-নীতির (Paido-centricism) অর্থ শুধু এই নয় যে, শিশুর চাহিদাই শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করবে, এ-নীতির প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, শিশু নিজেই নিজেকে শিক্ষা দেবে। শিক্ষক শিশুকে কোন শিক্ষাদান করতে পারেন না। শিশু স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেই শিক্ষা গ্রহণ করবে। এজন্য তিনি প্রচলিত শিক্ষক-প্রথার বিলোপ সাধন করে তাঁর শিশুভবনে পরিচালিকা (Directress)-রূপে কয়েকজন সহানুভূতিশীলা শিশুদরদী নারীকে শিশুর পরিচর্যার জন্য গ্রহণ করেন। মণ্টেসরী বলেন, শিশু যদি তার শিক্ষা গ্রহণে কোন ভুলও করে, তবুও শিক্ষক ভুল শোধরাতে বা দেখিয়ে দিতে যাবেন না। তিনি সেদিনকার মত তার শিক্ষা-গ্রহণকে স্থগিত রাখবেন এবং পরের দিন আবার সে ঐ কাজ শুরু করবে। অর্থাৎ শিক্ষার্থী নিজেই যেন তার ভ্রান্তি বা অসংগতি অপসারণ করে। শিশুর আপন আগ্রহই

হবে তার আত্ম-শিক্ষার সঞ্চারক। এজন্য তাঁর শিক্ষানীতিকে তিনি আত্ম-শিক্ষা বা স্বাধীন-শিক্ষা (Self-education or Free-education) বলে অভিহিত করেছেন।

(গ) স্বতঃস্ফূর্ত শৃংখলা (Free discipline) : মণ্টেসরী শিশুর সর্বাংগীণ স্বাধীনতাকে তাঁর শিক্ষানীতিতে গুরুত্ব দিয়েছেন। আর সে স্বাধীনতা হল শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ বা সক্রিয়তার নামান্তর। সুতরাং প্রশ্ন হচ্ছে, শিক্ষায় শৃংখলার প্রয়োজনীয়তাকে কি তিনি অস্বীকার করেছেন? সার্থক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি তার শৃংখলাবোধও অত্যাবশ্যক। বলাবাহুল্য, মণ্টেসরী শিশুর শৃংখলাকে প্রচুর গুরুত্ব দিয়েছেন। শিশুর স্বাধীনতা বা সক্রিয়তার সংগে শৃংখলার কোন বিরোধ নেই।

মণ্টেসরী বলেন, গতানুগতিক শৃংখলা ছিল আরোপিত, উহা নেতিবাচক (negative) শাসন এবং ভয় দ্বারা শিশুদের মধ্যে এক জড়তা সৃষ্টি করে সেই শৃংখলা বজায় রাখা হত। সে শৃংখলা ছিল শিশু-মনের অবদমন, তাঁর কর্মক্ষমতার বিনাশক এবং স্বাধীনতার পরিপন্থী। আর সে শৃংখলা দ্বারা শিশুরা ছিল শ্রেণীকক্ষে যেন দেওয়ালের ওপর আলপিনে আবদ্ধ প্রজাপতির সারি। সত্যিকার শৃংখলা শিশুকে কঠোর শাসনে শান্ত করে রাখা নয়। এ ধরনের ভয়গ্রস্ত শান্ত শিশুর দল শৃংখলাবদ্ধ নয়, আসলে মৃত।[1]

মণ্টেসরী এ ধরনের আরোপিত শাসন-কণ্টকিত নেতিবাচক শৃংখলার বিরোধী। তাঁর মতে শৃংখলা হবে স্বতঃপ্রণোদিত। উহা নেতিবাচক নয়, ইতিবাচক। সামাজিক আচরণের প্রয়োজনীয়তা ও মূল্যবোধ থেকেই শিশুর মনে ধীরে ধীরে আত্মসংযম জেগে ওঠে আর আত্মসংযমই তার আচরণে আনে শৃংখলা। সুতরাং শিশুর স্বাধীনতা ও শৃংখলার মধ্যে কোন বিরোধ তো নেই-ই; বরং একটি আর একটির পরিপূরক। কাজেই স্বাধীনতা, সক্রিয়তা ও শৃংখলা সমপর্যায়ভুক্ত।

এজন্য আমরা দেখি, মণ্টেসরী তাঁর শিশু-ভবনে বেঞ্চে বসার প্রথা তুলে দিয়েছেন। বেঞ্চে যে শিশুরা শুধু আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকে তা নয়, এর ফলে

1. 'Real discipline does not aim at reducing children to immobility in the class-rooms like rows of butterflies transfixed with a pin. Such children are not actually disciplined but annihilated.'

তাদের স্বাধীন আচরণ ব্যাহত হয়। শিশুদের সক্রিয়তাকে সাহায্য করার জন্য বিদ্যালয়ের অনেকগুলি কাজ করতে তাদের দেওয়া হয়। তারা তাদের নিজেদের আসবাবপত্রের যত্ন নেয়, নিজেরাই বিদ্যালয় পরিষ্কার রাখে, চেয়ার টেবিল ও অন্যান্য সরঞ্জাম সাজিয়ে রাখে। শিশু যদি কখনও শৃংখলা ভংগ করে তবে সেজন্য তাকে কোন শাস্তি দেওয়া হয় না বা পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে তার মনে কোন প্রলোভন বা অহংকার জাগ্রত করা হয় না। শিশু যদি সদাচার বা সামাজিক রীতি ও সংহতিকে লংঘন করে তবে তাকে শান্তভাবে পরিচারিকা বলবেন যে, সে অসংগত আচরণ করছে। এতেও যদি শিশু তার অশোভন আচরণ থেকে বিরত না হয়, তবে তাকে তার সংগী সাথীর দল থেকে সরিয়ে নিয়ে আরামকেদারায় বসিয়ে খেলার সামগ্রী তার সামনে তুলে দিতে হবে। তখন সে তার সাথীদের সংযত আচরণ লক্ষ্য করবে এবং তাদের মধ্যে ফিরে আসার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠবে। এভাবে শৃংখলা হবে তার মজ্জাগত এবং স্বতঃস্ফূর্ত।

(ঘ) গতানুগতিক শ্রেণী-প্রথার বিলোপ এবং গতানুগতিক শিক্ষকের স্থান পরিবর্তন (Abolition of the traditional system of class-teaching and substitution of traditional teachers) : শিক্ষায় যদি আমরা শিশুর স্বাধীনতা এবং আগ্রহকেই স্থান দেই, তবে শিশুর আচরণ এবং সহজাত সম্ভাবনার বৈচিত্র্যকেই আমরা স্বীকার করি। সুতরাং দলগতভাবে শিশুদের শিক্ষা দেওয়া যায় না। শিক্ষা হবে ব্যক্তিমুখী (individualised) এবং বিশেষ বিশেষ শ্রেণী ভাগ করে আমরা যে শিক্ষা দেই, তা শিশুর স্বাধীনতাকে খর্ব করে, তার আগ্রহকে মূল্য দেয় না। শ্রেণীগতভাবে আমরা যে শিক্ষাদান করি, তাতে বিষয়বস্তুর (Subjects) ওপরই শিক্ষাকে কেন্দ্রীভূত করে ফেলি, শিশুরা এতে থাকে অবহেলিত। শিক্ষা শুরু হবে শিশুর অন্তর থেকে, তার আচরণ থেকে—বিষয়বস্তু থেকে নয়। সুতরাং মণ্টেসরী তার বিদ্যালয় থেকে শ্রেণী-প্রথার বিলোপ সাধন করলেন।

আর গতানুগতিক শিক্ষক ছিলেন জ্ঞানদাতা। তিনি শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত হয়ে সমবেত ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে জ্ঞানের সংবাদ বিতরণ করতেন। এ ধরনের শিক্ষা সংবাদ-বিতরণ (instruction), ইহা শিক্ষা (education) নয়। মণ্টেসরী শ্রেণী-প্রথার সংগে শ্রেণীগত শিক্ষকেরও (class teacher)

বিলোপ সাধন করেন। জ্ঞানদাতা শিক্ষকের পরিবর্তে মণ্টেসরী তাঁর শিশু-ভবনে পরিচালিকা (Directress) নিয়োগ করেন। সে পরিচালিকা রক্তচক্ষু, তর্জনমুখর শিক্ষক নহেন; তিনি স্নেহশীলা, সহানুভূতিসম্পন্না, মধুরভাষিণী নারী। পরিচালিকার দায়িত্ব হল, তিনি কেবল দেখবেন শিশুরা যেন সৎ ও অসৎ আচরণের পার্থক্য বুঝতে পারে—শিশুরা যেন জড়তা বা গতিহীনতার সংগে মহৎ হওয়াকে আর অশোভন আচরণের সংগে সক্রিয়তাকে গুলিয়ে না ফেলে। শ্রেণী-প্রথা এবং শ্রেণীগত শিক্ষকের বিলোপসাধন করার একটি ব্যবহারিক বা বাস্তব সুবিধা হল এই যে, একই শ্রেণীতে পরিচালিকা ভিন্ন ভিন্ন বয়সের ভিন্ন ভিন্ন রুচি ও আগ্রহসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতে পারেন। শিক্ষক কোন কর্তৃত্বের অধিকারী নন্, তিনি সহায়ক, তিনি শিশুর গতিপ্রকৃতি ও আচরণের পর্যবেক্ষক, নিছক নিষ্ক্রিয় দর্শক নন্। যখন শিশুর প্রয়োজন, তাকে তখন সাহায্য করার জন্য তিনি অপেক্ষমান। বিভিন্ন বয়সের একাধিক সন্তানদের মাঝে জননীর মত পরিচারিকা বা মণ্টেসরী শিক্ষক বিরাজমানা। ফ্রয়েবেলও এভাবে সদাশয় তত্ত্বাবধায়কের (benevolent superintendent) কথা বলেছেন। পার্সি নান্ (*Percy Nunn*) মণ্টেসরীর শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষকের স্থান প্রসংগে একটি সুন্দর উপমা দিয়ে বলেছেন: সংক্ষেপে সকল ব্যাপারে শিশু প্রজাতন্ত্রের চিরন্তন সভানেত্রী হলেন পরিচালিকা, কিন্তু এই প্রজাতন্ত্রে শাসনব্যবস্থার দায়িত্ব যারা শাসিত হচ্ছে তাদের ওপরই ন্যস্ত।[1]

২। মণ্টেসরীর শিক্ষাপদ্ধতি (Montessori's Method of Teaching):

মণ্টেসরীর শিক্ষাপদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বস্তুভিত্তিক পাঠের (Object Lesson) ব্যবস্থা, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অর্থাৎ পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণ (observation and experiment)-কে গ্রহণ এবং শিশুর ইন্দ্রিয়ানুশীলনের ওপর গুরুত্ব প্রদান।

1. "The teacher's part in short, in all matters, is that of a perpetual President in the Little Republic where the onus of school government is thrown upon the governed.

শিক্ষাপদ্ধতিতে মণ্টেসরীর প্রধান কৃতিত্ব হল শিক্ষামূলক সরঞ্জামের (Didactic Apparatus) প্রবর্তন। এর আগে ফ্রয়েবেলও বস্তুভিত্তিক পাঠের (Object Lesson) ব্যবস্থা করে গেছেন। কিন্তু গঠন-সৌন্দর্য, পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণের ক্ষমতার উন্মেষ-সাধনে আর ব্যবহারিক মূল্যে মণ্টেসরীর বস্তুভিত্তিক পাঠের আয়োজন অধিকতর ব্যাপক এবং সার্থক। মণ্টেসরী রোমের একটি মানসিক ব্যাধির চিকিৎসালয়ে চিকিৎসক ছিলেন। তখন তিনি ফরাসী চিকিৎসক ইটরাড্ সেগুঁইর (*Edouard Seguin*) পরিকল্পিত ক্ষীণবুদ্ধির (Feeble-minded) ছেলেমেয়েদের জন্য যন্ত্রপাতি অনুশীলনের সুযোগ লাভ করেন। এগুলি তিনি সেখানকার মানসিক ত্রুটিসম্পন্ন ছেলে-মেয়েদের ওপর প্রয়োগ করে যথেষ্ট সুফল লাভ করেন। তখন তিনি ভাবলেন, সুস্থ ছেলেমেয়েদের এসব সরঞ্জামের সাহায্যে আরও সার্থকভাবে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। এরপর এ নিয়ে তিনি বহু গবেষণা করেন এবং তারই ফলশ্রুতি হিসেবে শিক্ষামূলক সরঞ্জামের আবির্ভাব। এ সরঞ্জামগুলির বিস্তারিত তালিকা দেবার অবসর এখানে নেই। প্রধান প্রধান সরঞ্জাম হল কাঠের বেলনাকার বস্তু, নানা কোণের টেবিল, গানের বেল, নানা রঙের, নানা আকৃতির উলের বল, নানা আকারের বাক্স ইত্যাদি।

এসব সরঞ্জামগুলিকে সাধারণতঃ দু'ভাগে ভাগ করা হয়—ইন্দ্রিয়চর্চামূলক এবং বুদ্ধিচর্চামূলক।

মণ্টেসরী তাঁর শিক্ষাতত্ত্বে পরিবেশের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। পরিবেশকে জানবার একমাত্র সহায়ক হল ইন্দ্রিয়নিচয়। তাছাড়া, মণ্টেসরী বিশ্বাস করেন যে ইন্দ্রিয়চর্চার ওপর নির্ভর করেই বুদ্ধির বিকাশ। এই উভয়বিধ কারণে তিনি শিশুর ইন্দ্রিয়ানুশীলনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। শিক্ষামূলক সরঞ্জামের ব্যবহারের দ্বারা শিশুর পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। এগুলি এমনভাবে তৈরী এবং বিন্যস্ত যে শিশু আকার, গঠন, রঙ প্রভৃতির পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষমতা অর্জন করবে। তাছাড়া, শিক্ষামূলক সরঞ্জামের দ্বারা শিশুর লিখন ও পঠনের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এসব স্থলে মণ্টেসরী স্পর্শ-শিক্ষার (education of the touch) কথা বলেছেন। কাগজ দিয়ে তৈরী বর্ণমালা কার্ডবোর্ডের উপর আঁটা থাকে, শিশু হাত বুলিয়ে অক্ষর জ্ঞান লাভ করে, তারপর পঠন ও লিখনের অভ্যাস করে। শিক্ষামূলক সরঞ্জামগুলির

বৈশিষ্ট্য হল এই যে, শিশু যদি কোন ভুল করে:তবে তাকে শিক্ষকেব শিখিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই, এ সরঞ্জামগুলি আপনা থেকেই শিশুকে ভুল দেখিয়ে দেবে। এগুলি স্বয়ং-শিক্ষণকে সম্ভব করে তোলে।

ফ্রয়েবেল তাঁর শিক্ষাদর্শে এক আদর্শ পরিবেশের (ideal environment) ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু মণ্টেসরী একটি বিশেষ পরিবেশের (special environment) ওপর গুরুত্ব দিতেন। আর সৌন্দর্য হল সেই পরিবেশের একটি অংগ। এজন্য শিক্ষামূলক সরঞ্জামগুলির গঠন, আকৃতি এবং রঙের সৌন্দর্যের ওপরও তিনি নজর দিয়েছিলেন। এগুলি ব্যবহারের দ্বারা শিশুর সৌন্দর্যানুভূতি যাতে বৃদ্ধি পায়, শিশুর কাছে এগুলি যাতে পরম আকর্ষণীয় হয়, সে চেষ্টার ত্রুটি তিনি করেননি।

কিন্তু আধুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে কেবলমাত্র সরঞ্জামের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়াকে অমনোবৈজ্ঞানিক বলে গ্রহণ করা হয়। কেননা এতে শিক্ষার্থীর স্বতঃস্ফূর্ত শিক্ষা অনেক সময় ব্যাহত হয়। তাছাড়া, এতে তাদের দৈহিক আচরণের স্বাধীনতা কিছুটা থাকলেও মানসিক স্বাধীনতা খর্ব করা হয়।

৩। কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি এবং মণ্টেসরী পদ্ধতি (Kindergarten System and Monestsori System) ঃ

মৌলিক নীতির দিক থেকে এ দুই পদ্ধতির মধ্যে মিল প্রচুর। শিশুর স্বাধীনতা, সক্রিয়তা, বস্তুভিত্তিক পাঠের সাহায্যে শিক্ষাদান, সৃজনমূলক কাজ এবং অন্তর্জাত শৃংখলা উভয় পরিকল্পনাতে গৃহীত হয়েছে।

কিন্তু তবুও এ দুই পরিকল্পনার মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য বর্তমান। প্রথমতঃ, কিণ্ডারগার্টেন পরিকল্পনায় গতানুগতিক শ্রেণীপ্রথাকে মেনে নেওয়া হয়েছে এবং দলগতভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু মণ্টেসরী পরিকল্পনায় শিক্ষা পুরোপুরি ব্যক্তিমুখী, শ্রেণীপ্রথা এবং দলগতভাবে শিক্ষাদান উভয় প্রথাই পরিহার করা হয়েছে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে দলগতভাবে শিক্ষা দেওয়া যে অধিকতর সার্থক এ কথাও মণ্টেসরী বলেছেন।

দ্বিতীয়তঃ, মণ্টেসরীর শিক্ষামূলক সরঞ্জাম এবং ফ্রয়েবেলের 'উপহার' ও 'কাজের' মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য বর্তমান। ফ্রয়েবেলের 'উপহার' ও 'কাজ'

কয়েকটি ভাবের প্রতীক, এগুলির দ্বারা শুধু ইন্দ্রিয়ানুশীলনই সম্ভব এবং এগুলি ব্যবহারের নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। কিন্তু মণ্টেসরীর উদ্ভাবিত শিক্ষা সরঞ্জাম কোন ভাবের প্রতীক নয়, এ গুলির দ্বারা যুগপৎ ইন্দ্রিয়ানুশীলন এবং লিখন-পঠন সম্ভব। তাছাড়া, এ সরঞ্জামগুলির ব্যবহার করার মধ্যে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম না থাকায় শিক্ষার্থী স্বাধীনভাবে এগুলি প্রয়োগ করতে পারে।

তৃতীয়তঃ, ফ্রয়েবেল তাঁর শিক্ষা পদ্ধতিতে পুস্তক অধ্যয়নের উপর মোটেই গুরুত্ব দেননি। এ ব্যাপারে তিনি রুশোর সমগোত্রীয়। কিন্তু মণ্টেসরী তাঁর পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীর পুস্তক পাঠ বা লিখন-পঠনের উপরও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন।

৪। শিক্ষাতত্ত্বে মণ্টেসরীর অবদান (Contributions of Montessori to the theory and practice of education) ঃ

শিক্ষাতত্ত্বে যে ব্যক্তিমুখী শিক্ষার আন্দোলন রুশোর পর থেকে শুরু হয়েছিল তার বাস্তব রূপ দিয়েছেন মণ্টেসরী। শ্রেণীপ্রথাকে বিলোপ করে তিনি শিক্ষা ব্যবস্থায় এক যুগান্তকারী বিপ্লব এনেছেন।

গতানুগতিক শিক্ষায় শিক্ষক ছিলেন কর্তৃত্বের (authority) অধিকারী। শিক্ষার্থীর জীবনের ব্যর্থতা ও সাফল্য দিয়ে শিক্ষকের বিচার করা হত। শিক্ষকের সংগে শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ছিল ভয়াশ্রিত। কিন্তু মণ্টেসরী এসে ঘোষণা করলেন, শিক্ষক কোন কর্তৃত্বের অধিকারী নন্। তিনি পরিচালক মাত্র। আর শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক হবে মধুর, সহানুভূতিপূর্ণ এবং হৃদ্যতাপূর্ণ। 'শিক্ষক' শব্দের সংগে 'কর্তৃত্ব' শব্দের সম্পর্ক ছিল বলে নব্য শিক্ষায় বা শিক্ষামনোবিজ্ঞানে 'শিক্ষক' শব্দ অনেক সময় ব্যবহার করা হয় না, তার পরিবর্তে 'নির্দেশক' (instructor) শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে।

মণ্টেসরীর আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হল, তিনি তাঁর শিক্ষা-ব্যবস্থায় পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ—এ দুই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে শিক্ষাদানকে বিজ্ঞানসম্মত করে তোলার চেষ্টা করেন।

মণ্টেসরীর আগে আর কেউই শিশুর স্বাধীনতার এমন দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রদান করেননি এবং এ স্বাধীনতাকে শিক্ষার বাস্তব ক্ষেত্রে মূলনীতি হিসেবে প্রয়োগ করতে সমর্থ হননি। তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে হেলেন পার্কহার্স্ট

তাঁর ডাল্টন শিক্ষা পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন এবং বয়স্ক শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রেও এ স্বাধীনতাকে সমান মর্যাদা দেন। আধুনিক খেলাভিত্তিক শিক্ষা ও প্রজেক্ট পদ্ধতি মণ্টেসরীর স্বাধীনতা-নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত।

তবুও মণ্টেসরীর শিক্ষাপদ্ধতির ব্যর্থতা সম্বন্ধে আমরা অবহিত। মণ্টেসরীর শিক্ষাপদ্ধতি তাঁর নিজের দেশ ইতালীতেও যথাযোগ্য মর্যাদা পায়নি। এর কারণ ব্যাখ্যা করে কোন কোন সমালোচক বলেন, মণ্টেসরী পদ্ধতির ব্যর্থতার মূলে রয়েছে আমাদের সহানুভূতির অভাব। এটা একটি সাধারণ অভিজ্ঞতার বিষয় যে, যে কাজ অতি সূক্ষ্ম তা সম্পন্ন করতে অধিকতর সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির প্রয়োজন এবং একমাত্র দক্ষ কর্মীই সে সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারে। আসল কথা মণ্টেসরীর শিক্ষাপদ্ধতি সার্থক করতে হলে প্রয়োজন সার্থক পরিচালিকার।[1] তাঁরা যে সর্বযুগে বিরল, আর বৃত্তিসন্ধানী অর্থকরী বিদ্যার যুগে তাঁদের খুঁজতে যাওয়াও নিরর্থক।

শিক্ষাতত্ত্বে সামাজিক আদর্শের প্রবক্তা
জন ডিউই (John Dewey)
(১৮৫৯ – ১৯৫২ খ্রীঃ)

ডিউই আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসে এক নতুন দিগন্ত সৃষ্টি করেছেন। দার্শনিক শিক্ষাবিদ হিসেবে ডিউই-র নাম সর্বদেশে প্রচারিত। তিনি হলেন আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষার (Progressive Education) জনক। দর্শনের সংগে শিক্ষার মিলন সাধন, শিক্ষার নতুন সংব্যাখ্যান, বিদ্যালয় ও সমাজের সম্পর্ক নির্ণয়, শিক্ষায় ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সামাজতান্ত্রিক দ্বন্দ্বের অবসান, নতুন শিক্ষা-পদ্ধতির উদ্ভাবন, শিক্ষার্থীর শৃংখলা ও আগ্রহের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা, পরিবর্তনশীল মানব সভ্যতায় গণতন্ত্র, শিল্প ও বিজ্ঞানের সমন্বয় প্রভৃতি সমস্যা ও আলোচনায় ডিউই তাঁর অবিস্মরণীয় স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

ডিউই-র শিক্ষাতত্ত্ব আলোচনার পূর্বে তাঁর দর্শন সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ পরিচয় থাকা উচিত। ডিউই প্রয়োগবাদী (Pragmatist)। তাই

1. "It is a matter of common experience that the finer is the piece of work, the greater will be the necessity of delicate tools to perform it and none but the most skillful workman can manage to handle such tools."

ভাববাদের (Idealism) সংগে তাঁর বিরোধ। প্রয়োগবাদ বস্তুর কোন চিরন্তন মূল্য বা কোন চিরন্তন সত্যে বিশ্বাস করে না। ভাববাদ বস্তুর চিরন্তন মূল্য বা বস্তুর সত্ত্বাগত (intrinsic) মূল্য বিশ্বাস করে। প্রয়োগবাদ বিশ্বাস করে, বস্তুর যা কিছু মূল্য তা তার ব্যবহারের বা প্রয়োগের উপর। সুতরাং প্রয়োগবাদী দার্শনিক ডিউই বিশ্বাস করেন, কোন নীতি বা উদ্দেশ্যের সার্থকতা বা মূল্য বাস্তবে প্রয়োগের পর উহা সাফল্যলাভ করে কিনা তার উপর নির্ভরশীল। সময়ের পরিবর্তনশীল প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে কোন নীতিকে আঁকড়ে থাকা গোঁড়ামির নামান্তর। সুতরাং ডিউই তাঁর দার্শনিক নীতিকে বাস্তবে, পরীক্ষণমূলক বৈজ্ঞানিক তথ্যের ওপর এবং এ পৃথিবীর সমাজে যে ভাবে আমরা জীবন যাপন করি তার ওপর প্রয়োগ করতে চেয়েছেন।

আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা আহরণ করি আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সমাজজীবন বা প্রতিবেশীদের কাছ থেকে। তারপর পরিবেশ বা প্রতিবেশীর প্রতি আমাদের যে মনোভাব গড়ে ওঠে একেই শিক্ষা বলা যায়। আর দর্শনের কাজ হল কিভাবে আমরা অভিজ্ঞতা আহরণ করি তা সন্ধান করা নয়, আমাদের অভিজ্ঞতাকে কি ভাবে কাজে লাগাতে পারি, বিজ্ঞানের সাহায্যে পৃথিবীকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করে উন্নত এবং আনন্দদায়ক জীবনের অধিকারী হতে পারি, তা আলোচনা করা।

১। শিক্ষাতত্ত্ব ও দর্শনের সম্পর্ক (Relation between Education and Philosophy) :

জন ডিউই-র মতে 'শিক্ষাতত্ত্ব' এবং 'দর্শন' ভিন্ন অর্থসূচক পদ নয়। উভয় শাস্ত্রেই মানুষ তার নিজকে, তার সমাজকে, যে পৃথিবীতে সে বাস করে সে পৃথিবীকে বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অধ্যয়ন করে। সুতরাং এ দুয়ের কোন মৌলিক পার্থক্য নেই।

কিন্তু 'দর্শন' ও 'শিক্ষাতত্ত্ব' সম্বন্ধে ডিউই-র বক্তব্য আরও গভীর। তিনি বলেন এরা অভিন্ন। তাঁর মতে, 'আমরা যদি শিক্ষাকে প্রকৃতি এবং প্রতিবেশীদের প্রতি বুদ্ধিগত ও প্রক্ষোভগত মৌলিক মনোভাব গঠন করার

প্রক্রিয়া বলে ভাবতে প্রস্তুত থাকি, তবে দর্শনকে সাধারণ শিক্ষতত্ত্ব বলে অভিহিত করা যেতে পারে।[1]

ডিউই-র এই অভিমতকে অনুসরণ করে বলা চলে, দর্শন হল শিক্ষার মৌলিক নীতির তাত্ত্বিক আলোচনা (the theory of education in its most general phases)। আর শিক্ষাতত্ত্ব সে-সব নীতির প্রয়োগ শাস্ত্র। অর্থাৎ শিক্ষাতত্ত্বে দর্শনের নীতির মূল্যায়ন হয় অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে।

ডিউই-র শিক্ষার এ প্রয়োগমূলক দিক থেকেই আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষার (Progressive education) জন্ম হয়েছে। শিক্ষাতত্ত্বে কতকগুলি মৌলিক নীতি স্থির করাই প্রধান বক্তব্য নয়, তার ব্যবহারিকমূল্য এবং বাস্তবজীবনের সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা থাকা চাই। তাই তিনি ব্যক্তির অভিজ্ঞতার ওপর তাঁর শিক্ষানীতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এ শিক্ষা পরিবর্তনশীল-অভিজ্ঞতার মত পরিবর্তনশীল এবং গতিশীল (dynamic)। এ শিক্ষা আপন স্বচ্ছন্দ ও মুক্ত গতিতে চলে। ডিউই তাঁর *Experience and Education* বইতে শিক্ষার অর্থ বিশ্লেষণ করে বলেছেন, শিক্ষা একটি চিরপ্রবাহী প্রক্রিয়া, তার নিরবচ্ছিন্ন গতি ব্যক্তির শৈশব থেকে শুরু করে সমগ্র জীবন ধরে প্রবহমান। আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষার মূল বক্তব্য এখানেই নিহিত।

ডিউই তাঁর দর্শনে বলেছেন, মানুষের অভিজ্ঞতাসমূহের মধ্যে ঐক্য রয়েছে, এগুলি কতকগুলি বিচ্ছিন্ন (atomic) ঘটনা নয়। এ অভিজ্ঞতার প্রবাহই ব্যক্তি সমগ্র জীবনভর সংগ্রহ করে। সুতরাং শিক্ষাও বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ নয় বা জীবনে একটি স্তরে সীমায়িত নয়। তাই বিদ্যালয় এবং বাস্তবজীবন তথা পৃথিবীর সংগে অবিচ্ছেদ্য বন্ধন বা সম্পর্ক থাকা চাই।

২। ডিউই-র শিক্ষাতত্ত্বের মূল সমস্যা (Fundamental problems in Dewey's theory of education) :

ব্যক্তি তার সমগ্র জীবন ধরে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে তা সে সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে, পরিবেশের চাহিদা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তিত

1. "If we are willing to conceive education as the process of forming fundamental dispositions intellectual and emotional, toward nature and fellowmen, philosophy may even be defined as the general theory of education."

করে। এক কথায় ব্যক্তি অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন (reconstruction) করে। এজন্য বিদ্যালয়েই শিক্ষা সমাপ্ত হয়ে যায় না। গতানুগতিক শিক্ষা বিদ্যালয়ের মধ্যেই শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ রেখেছিল, বড়জোর বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে ভবিষ্যৎ বৃহত্তর জীবনের প্রস্তুতি বলে বিবেচনা করত। কিন্তু গতানুগতিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষা এবং জীবনের সংগে অবিচ্ছেদ্য কোন সম্পর্ক ছিল না। তাই বিদ্যালয়কে বৃহত্তর সমাজের মধ্যে আলাদা করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু ডিউই শিক্ষাকে বাস্তব জীবনযাপনের সংগে এক অভিন্ন প্রক্রিয়া বলে গণ্য করেছেন। সুতরাং তাঁর শিক্ষাতত্ত্বে শিক্ষা-সমস্যা জীবন সমস্যার নামান্তর। এ প্রসংগে তিনি চারটি মৌলিক সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন:

প্রথমতঃ, বিদ্যালয় ও পরিবারের মধ্যে, বিদ্যালয় ও বৃহত্তর পৃথিবী বা সমাজের মধ্যে কিভাবে নিকট সম্পর্ক স্থাপন করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ, যে যে বিষয়বস্তুর একটি ইতিবাচক মূল্য (positive value) রয়েছে এবং শিশুর জীবনে সত্যই গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলি কিভাবে পরিবেশিত করা যায়।

তৃতীয়তঃ, কিভাবে পঠন, লিখন, সাধারণ জ্ঞানের বিষয় ইত্যাদি দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা ও কাজের মধ্য দিয়ে শিশুকে শিক্ষা দেওয়া যায়, যেন শিশু এই বিষয়গুলির সংগে তার পরিবার বা পরিবেশের মধ্যে বাস্তব জীবনের সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের সম্পর্ক নির্ণয় করে এবং এদের মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারে।

চতুর্থতঃ, কিভাবে শিক্ষার্থীকে তার ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও চাহিদার পরিতৃপ্তির পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া যায়, ফলে ব্যক্তিগত প্রগতি ও সামাজিক মংগল সম্ভব হয়।

ডিউই তাঁর শিক্ষাতত্ত্বের আলোচনায় উপরিউক্ত চারটি মৌলিক সমস্যার সমাধানের ইংগিত দিয়েছেন। আর এ সব সমস্যা সমাধানে তিনি নতুন দৃষ্টি-ভংগীর দ্বারা শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে চেয়েছেন।

৩। শিক্ষার সংজ্ঞা (Definition of education):

ডিউই নানাভাবে 'শিক্ষা' শব্দের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তাঁর মতে শিক্ষার সংকীর্ণ এবং ব্যাপক দুটি অর্থ বর্তমান। গতানুগতিক শিক্ষা-ব্যবস্থায়

সংকীর্ণ শিক্ষাকেই গ্রহণ করা হয়েছিল। এ শিক্ষা সচেতনভাবে মানুষ গ্রহণ করে। এজন্য তিনি একে ইচ্ছামূলক শিক্ষাও (Intentional Education) বলেছেন। বিদ্যালয়ের নির্ধারিত পাঠ্যসূচী ও কতকগুলি বিশেষ ধরনের সংবাদ এবং অভিজ্ঞতা আহরণের মধ্যেই এ শিক্ষা সীমাবদ্ধ। ডিউই শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থ পরিত্যাগ করে শিক্ষাকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছেন। এ ব্যাপক অর্থে শিক্ষা ও জীবন অভিন্ন, শিক্ষা জীবনের সংগে সমব্যাপক। সুতরাং তিনি নানাভাবে শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। আমরা নিম্নে শিক্ষা সম্বন্ধে ডিউই-র প্রধান প্রধান মন্তব্যগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি।

(ক) শিক্ষা-জীবনের ক্রমবিকাশ (Education is growth): ভাববাদী দার্শনিকরাও শিক্ষার স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রসংগে শিক্ষাকে জীবনের ক্রম-বিকাশের সংগে তুলনা করেছেন। এই ক্রমবিকাশের অর্থ হল ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা বা সত্ত্বার প্রকাশ। ভাববাদীরা মনে করেন, ব্যক্তির জীবন বিকাশে যে পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করি সে পরিবর্তন ব্যক্তিসত্ত্বার কোন মৌলিক পরিবর্তন নয়, উহা নিছক আকারগত (formal) পরিবর্তন, অস্তিত্বগত পরিবর্তনও নয়। ভাববাদীরা আরও বিশ্বাস করেন মানুষের আত্মা বা মন একটি স্থির বস্তু (fixed entity)। বাইরের পরিবেশ এতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসে, সে পরিবর্তন নিতান্ত বাহ্যিক। আত্মা বা মন পরিবর্তনশীল নয়। উহা স্থির, অক্ষয় বলেই মানুষের ব্যক্তিত্ব-বিকাশে পরিবেশের কোন অবদান নেই।

কিন্তু প্রয়োগবাদী দার্শনিক ডিউই ব্যক্তির ক্রমবিকাশের এই ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করেন না। তিনি বিশ্বাস করেন, জগতে স্থির কোন পদার্থ নেই, চিরন্তন সত্য বলে কিছুই নেই। যা অস্তিত্বশীল তা পরিবর্তনশীল। সুতরাং মানব অস্তিত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তার পরিবর্তনশীলতা। পরিবেশ তাই মানবের জীবন বিকাশে শুধু নীরব সহায়ক নয়, মানব-জীবনের বিকাশে পরিবেশের সার্থক এবং সত্যকার অবদান রয়েছে। যেহেতু পরিবর্তনশীলতা জীবনের ধর্ম, অতএব ব্যক্তির জীবনে যে পরিবর্তন আমরা দেখি তা নিছক বাহ্যিক বা আকারগত নয়—এ পরিবর্তনের মধ্যেই মানুষের জীবনের বিকাশ ঘটে, এ পরিবর্তন শুধু আকার বা রূপের পরিবর্তন নয়, উহা ব্যক্তির স্বরূপেরও (nature) পরিবর্তন।

ডিউই মানুষের মনকে একটি স্থির বস্তু (fixed entity) হিসেবে বিবেচনা করেননি। তিনি বলেন, মন একটি বিকাশ-প্রক্রিয়া (a process of growth)। মন নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তনশীল এবং বিকাশোন্মুখ। জীবনের বিভিন্ন স্তরে তাই বিভিন্ন ধরনের সামর্থ্য ও আগ্রহ উপস্থিত হয়।[1] কিন্তু বিকাশের এই বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যে একটি ঐক্য ('a unity in process of development') বর্তমান।

জীবনের ক্রমবিকাশের এ তত্ত্বটির (Theory of growth) উপর নির্ভর করেই ডিউই শিক্ষাকে জীবনের ক্রমবিকাশের সংগে তুলনা করেছেন। ব্যক্তিসত্তার বিকাশের প্রক্রিয়ার মত শিক্ষাও একটি প্রক্রিয়া। শিশু বেঁচে আছে মানে বর্ধিত হচ্ছে, বর্ধিত হচ্ছে মানে পরিবর্তিত হচ্ছে, আর এ পরিবর্তন একটি ছেদহীন প্রক্রিয়া (continuous process)। মানুষের শিক্ষা তার জীবন বিকাশের প্রক্রিয়ার সংগে অভিন্ন। শিশু প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে, তার দেহে, মনে পরিবর্তনের বিচিত্র লীলা। শিশুর জীবনে নতুন আগ্রহ, নতুন চাহিদা উপস্থিত হচ্ছে, পরিবেশ নিত্য নতুন সমস্যা ও প্রভাব সৃষ্টি করছে—শিশু এর মধ্যেই তার জীবনের বিকাশ খোঁজে। সুতরাং শিক্ষা কতকগুলি গতিহীন নিষ্ক্রিয় তত্ত্ব বা তথ্যের সঞ্চয় নয়, নির্ধারিত পাঠ্যবস্তুর অধ্যয়ন নয়—অতীতে পরীক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি বিশ্বাস ও সত্যের পুনরাবৃত্তি নয়, উহা গতিশীল, পরিবর্তনশীল বর্ধিষ্ণু জীবনের সমগোত্রীয়।

ডিউই তাই বিশ্বাস করেন, শিক্ষা কোন স্থির বস্তু নয়, উহা পরিবর্তনশীল। ব্যক্তির প্রগতির সংগে শিক্ষার প্রগতিও অংগাংগীভাবে জড়িত। চলমান বিশ্বের পরিবর্তনের সংগে সার্থক সংগতিসাধনই প্রগতি, আর শিক্ষা তারই নামান্তর। এই ব্যাখ্যাই আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষার বুনিয়াদ রচনা করেছে।

(খ) শিক্ষা অভিজ্ঞতার নিয়ত পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস (Education is the constant reconstruction and reconstitution of experience) : ডিউই বলেন, জীবন একটি সক্রিয় গতিশীল (active and dynamic) প্রক্রিয়া। উহা কখনও স্থাণু হয়ে বসে নেই। নিত্য নতুন

1. 'As essentially in change with the continuity of growth and yet presenting different phases of capacity and interest at different periods.'

অভিজ্ঞতার যে শোভাযাত্রা মানুষের মনের ওপর চলছে, তার প্রতিক্রিয়া করাই মানব-মনের ধর্ম। আর এ সংঘাতের ফলে পরিবেশও যেমন পরিবর্তিত হয়ে যায়, তেমনি ব্যক্তির জীবনও পরিবর্তিত হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রাচীন কৃষিসভ্যতার মানুষ আর যান্ত্রিকযুগের মানুষ অভিন্ন নয়। আজকের যান্ত্রিকযুগের পরিবেশ যে সমস্যা নিয়ে এসেছে, সেদিনকার অভিজ্ঞতা দ্বারা তার সমাধান সম্ভব নয়।

এ পৃথিবী নিয়ত পরিবর্তনশীল, এখানে স্থির অভিজ্ঞতা, চিরন্তন সত্য এবং সর্বকালের তত্ত্ব বলে কিছুই নেই। সবকিছুই বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করে যাচাই করতে হয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুযায়ী সকল তত্ত্ব, সকল অভিজ্ঞতা, সকল বিশ্বাসকে পরিবর্তিত করতে হয়। সভ্যতার অগ্রগতির সংগে মানুষের জীবন আরও অধিকতর জটিল হচ্ছে। জটিল এবং বিপদসংকুল পৃথিবীতে আমাদের জীবন সমস্যা-সমাকীর্ণ। সুতরাং অভিজ্ঞতা বা শিক্ষা সেখানে সমস্যা সমাধানের সহায়ক (instrument), ব্যবহারিক (utilitarian) মূল্য ছাড়া আমাদের তত্ত্ব বা তথ্যের কোন আলাদা মূল্য নেই।

সুতরাং নতুন সমস্যা ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অভিজ্ঞতাকে পুনর্গঠন করতে হয়, পুনর্বিন্যাস বা পুনর্সৃজন করতে হয়। শিক্ষা অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন বা পুনর্বিন্যাস করা ছাড়া কিছুই নয়। শিক্ষা হল পরিস্থিতির চাহিদার দ্বারা নির্ধারিত এক বিশেষ পরিবেশে চিরবিকাশোন্মুখ প্রক্রিয়া।[1]

পরিবেশ আমাদের জীবনে সমস্যার সৃষ্টি করে যে প্রশ্ন উপস্থিত করেছে তার সমাধান প্রয়োজন। এর উদ্দেশ্য কি? এর উদ্দেশ্য সার্থক সংগতি স্থাপন—আর এ সংগতি স্থাপনেরও মান আছে। অতীতের আদিম মানুষ গুহায় বসে ঝড়ঝঞ্ঝা থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য প্রতিকূল পরিবেশের সংগে যেভাবে সংগতি স্থাপন করেছিল, বর্তমান যুগে মানুষ বিজ্ঞানের সহায়তায় তার চাইতে অনেক উচ্চতর সংগতি সাধন করেছে। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা সহায়ক এবং এ অভিজ্ঞতাকে সুদূরপ্রসারী করে তোলার জন্য, নতুন পরিস্থিতিতে উপযোগী করে তোলার জন্য, জীবনকে অধিকতর সহজ ও

1. "Education is thus an ever developing process determined at a particular situation by the needs of that situation.

দীর্ঘস্থায়ী করে তোলার জন্য আমাদের চেষ্টার আর গবেষণার অন্ত নেই। এর ফলে আমাদের অভিজ্ঞতাকে আমরা পরিবর্তিত করছি, নতুন ভাবে গঠন করছি। অভিজ্ঞতার এই পুনর্গঠনের ইতিহাসই শিক্ষা। অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন আমাদের অস্তিত্বের সহায়ক, প্রগতির প্রাণ।

অভিজ্ঞতার এ পরিবর্তনের এবং বিন্যাসের ফলে শুধু প্রাকৃতিক পরিবেশের চেহারাই পাল্‌টে যাচ্ছে তা নয়, আমাদের মানসিক দৃষ্টিভংগী ও জীবনের মূল্যবোধেরও পরিবর্তন আসছে। পৃথিবীকে নতুন দৃষ্টিতে, নতুন অর্থে আমরা দেখি। তাই ডিউই বলেন, শিক্ষা শুধু অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন নয়, উহা দ্বারা আমাদের বিশ্বের অর্থবোধের দিগ্‌বলয়ও প্রসারিত হয় (expansion of the horizen of meaning)।

(গ) শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া (Education is a social process): ডিউই বলেন, শিক্ষা শুধু একটি প্রক্রিয়া (process) নয়, উহা সামাজিক প্রক্রিয়া। প্রক্রিয়া একটি আদি অন্তহীন গতি, এ গতি নিরবচ্ছিন্ন, সদা পরিবর্তনশীল। শিক্ষা কোন কৃত্রিম গতি নয়, উহা মানবজীবনের স্বাভাবিক (natural) গতি বা প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে সামাজিক পটভূমিকায় মানুষ তার জীবনকে পুনর্গঠন করে, নতুন করে আরম্ভ করে। শিক্ষার ব্যাপকতর অর্থ হল, উহা জীবনের সামাজিক নিরবচ্ছিন্ন গতির (continuity) একটি উপায়।[1] মানুষের সভ্যতা যত এগিয়ে যাচ্ছে জীবন তত জটিল হচ্ছে। এই ক্রমবর্ধিষ্ণু জটিল জীবনে শৈশব আর পূর্ণবয়স্কের মধ্যে, জীবনের অপরিণত স্তর আর পরিণত স্তরের পার্থক্যের দুরত্ব অপসারণ করা চাই এবং শিক্ষার প্রয়োজনও তাই অধিকতর।

ডিউই-র বক্তব্যকে আমরা একটু সহজভাবে ব্যক্ত করতে পারি। শিক্ষা অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন। মানুষের জীবনে অভিজ্ঞতার প্রতিফলন হয়। যে সমস্যা বা নতুন পরিস্থিতি অভিজ্ঞতা বহন করে তাকে মানুষ অন্ধভাবে অনুসরণ করে না বা অভিজ্ঞতার কাছে আত্মসমর্পণ করে না। সে তার অভিজ্ঞতাকে প্রয়োজনমত পরিবর্তন করে নেয়। কিন্তু এ অভিজ্ঞতার উৎস সামাজিক পরিবেশ। সামাজিক পরিবেশ ছাড়া অভিজ্ঞতা নিরর্থক, আর ব্যক্তির

1. **"Education, in its broadest sense, is the the means of the social continuity of life."**

অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন বা শিক্ষারও তখন কোন মূল্য নেই। সুতরাং শিক্ষাও একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তি-জীবনে শিক্ষার অর্থ বা প্রয়োজন নেই।

কিন্তু ডিউই শিক্ষাকে একটি সামাজিক প্রক্রিয়া বলে অভিহিত করেন। সেই সংগে উহাকে ব্যক্তির জীবন বিকাশের প্রক্রিয়া বলেও ব্যাখ্যা করেছেন। ব্যক্তির জীবন-বিকাশ সম্ভব, কারণ ব্যক্তি সামাজিক পরিবেশে বাস করে। সামাজিক পটভূমিকায়ই ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক চাহিদার পরিতৃপ্তি হয়, ব্যক্তির সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়। সমাজই ব্যক্তির জীবনে অভিজ্ঞতার প্রবাহ ও পরিবর্তন সম্ভব করে তোলে। আর শিক্ষাই জীবনের সামাজিক অস্তিত্ব রক্ষা করে।

এখানে ডিউই শিক্ষার সমাজতাত্ত্বিক দিকটির গুরুত্ব দিয়েছেন। এর পূর্বে পেস্টালৎসী এবং ফ্রয়েবেল শিক্ষার মনস্তাত্ত্বিক দিকটির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষাকে সমাজ প্রগতির উপায় হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু ডিউই শিক্ষাকে জীবনের সামাজিক অবিচ্ছিন্নতার (continuity) উপায় হিসেবে গণ্য করেছেন। অর্থাৎ শিক্ষাকে তিনি শিক্ষার্থীর বা শিশুর জীবনে কেন্দ্রীভূত করে দেখেননি। শিশুর বাইরে সামাজিক পরিবেশেই শিক্ষার গুরুত্ব।[1] কেননা, ব্যক্তি-মন ও সামাজিক-মন ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি বলেন, ব্যক্তি-মন সমাজ-জীবনের একটি প্রক্রিয়া বিশেষ।[2] ব্যক্তি-মন তার সুসংহত বিকাশের জন্য সামাজিক পরিবেশ থেকেই উদ্দীপক লাভ করে, তার খাদ্য এবং জীবনীশক্তি সংগ্রহ করে। শিক্ষা হল ব্যক্তি ও সমাজের চাহিদা এবং সমস্যার মধ্যে সার্থক সংগতিসাধন।

ডিউই-এর এই ব্যাখ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বহুদিনের ব্যক্তিতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়েছে। মানুষের জীবন তার আপন গণ্ডীর মধ্যে ব্যক্ত একটি গতিহীন বস্তু নয়। সারা জীবনব্যাপী জীবনকে মানুষ সঞ্জীবিত করার চেষ্টা করছে।[3] মানুষের জীবনের এ ব্যাপ্তি সামাজিক পরিবেশ ও পটভূমিকায় সম্ভব হয়। কারিগরী জ্ঞান ও বুদ্ধিগত চেষ্টা ব্যক্তি-মানুষকে অনেকটা

1. "The centre of gravity in education lies elsewhere outside the child."

2. "The individual mind is a function of the social life."

3. "Life is a self-renewing process."

স্বার্থান্বেষী করে তুলছে। তাই শিক্ষার সহায়তায় মানুষ সচেতনভাবে বিশেষজ্ঞ (specialist) হওয়ার শিক্ষা থেকে যে জ্ঞান লাভ করছে আর অন্যদিকে নির্জ্ঞান ভাবে (unconsciously) সামাজিক পরিবেশে চরিত্র সংগঠনের যে প্রয়াস— এ দুয়ের দ্বন্দ্ব পরিহার একটি কঠিন কাজ।[1]

(ঘ) শিক্ষা যেহেতু একটি প্রক্রিয়া, শিক্ষার বাইরে শিক্ষার কোন উদ্দেশ্য নেই (Education being a process can not have an aim outside it) ঃ শিক্ষাকে ডিউই জীবন বিকাশের অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া বলে অভিহিত করেছেন। জীবন ও শিক্ষা সমব্যাপক ও সমার্থক। জীবন মানেই সক্রিয়তা, আর অভিজ্ঞতাই সে সক্রিয়তার প্রকাশ, সে অভিজ্ঞতা আদি অন্তহীন এক প্রক্রিয়া। সুতরাং শিক্ষাও একটি প্রক্রিয়া। প্রক্রিয়ার কোন লক্ষ্য নেই বা থাকতে পারে না, ইহা ছেদহীন গতি। প্রক্রিয়ার লক্ষ্য প্রক্রিয়ার মধ্যেই নিহিত অর্থাৎ প্রক্রিয়াটিকে আরও চালিয়ে যাওয়া। মানুষের জীবনের বাইরে কোন লক্ষ্য নেই, তাই শিক্ষার বাইরে শিক্ষারও কোন লক্ষ্য নেই। জীবনের লক্ষ্য জীবনের মধ্যেই নিহিত, অর্থাৎ আরও সার্থক, সুসংহত স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন। জীবনের বিকাশ মানে আরও বিকাশ, আরও বৃহত্তর, মহত্তর গভীরতর বিকাশ। সুতরাং শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষার মধ্যে নিহিত, অর্থাৎ আরও শিক্ষা,[2] আরও অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন।

গতানুগতিক পাঠ্যসূচীতে শিক্ষার স্থান ছিল সংকীর্ণ। সে শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার একটি বহিস্থ উদ্দেশ্য ছিল। আর শিক্ষা ছিল সে উদ্দেশ্য সাধনের উপায় বা সহায়ক। এ সব উদ্দেশ্য অভিভাবক, পিতামাতা বা শিক্ষক আরোপ করতেন। শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাই প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় তর্কের সীমা ছিল না। ভাববাদীরা বলতেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য আত্মোপলব্ধি; প্রকৃতিবাদীরা বলতেন, প্রকৃতির বিকাশ; জড়বাদীরা বলতেন, জড়জগতের উপর অধিকার বিস্তার এবং অন্যরা চরিত্রগঠন, অর্থোপার্জন, ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি ইত্যাদি

1. "To avoid a split between what men consciously know because they are aware of having learned it by a specific job of learning and what they unconsciously know because they have absorbed it in the formation of their characters by intercourse with others, becomes an increasingly delicate task with every development of special schooling."

2. "The aim of education is more education.

শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয় প্রসংগে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু ডিউই বলেন, এ ধরনের উদ্দেশ্য বিচার নিরর্থক। কেননা, শিক্ষার উদ্দেশ্যকে একটা স্থির বস্তু বলে কল্পনা করা হয়েছে।

ডিউই-র শিক্ষা যে শুধু গতিশীল তা নয় তাঁর কাছে শিক্ষার উদ্দেশ্যও গতিশীল (dynamic) এবং সে উদ্দেশ্য গতিশীল জীবন, অভিজ্ঞতা বা শিক্ষার সংগে গতিশীল। শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার বাইরে কোন শিক্ষা নেই, আর শিক্ষার বাইরে কোন শিক্ষার লক্ষ্য নেই।

৪। বিদ্যালয় ও সমাজ (School and Society) :

ডিউই শিক্ষাকে সামাজিক প্রক্রিয়া বলে অভিহিত করেছেন। একমাত্র সামাজিক পরিবেশ থেকে শিশু তার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এবং জীবনীশক্তি লাভ করে। সুতরাং বিদ্যালয়ের মধ্যে যদি সামাজিক পরিবেশ অনুপস্থিত থাকে তবে শিক্ষা হবে কৃত্রিম আর শিক্ষার্থী বৃহত্তর সমাজ-জীবনের সংগে সংগতি স্থাপন করতে পারবে না। প্রচলিত বিদ্যালয়গুলিকে সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যে পরিবেশে বাস্তব জীবন নিয়ে বাস করবে সে পরিবেশ থেকে এই বিদ্যালয়গুলি বঞ্চিত। ফলে শিক্ষা সেখানে কৃত্রিম, জীবন-বিরোধী। এজন্য ডিউই প্রচলিত বিদ্যালয়গুলির তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, বিদ্যালয়কে বাস্তব ও সাধারণ জীবনের পরিবেশ এবং প্রেষণা (motives) থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছে। ফলে শিল্পবিপ্লব সামাজিক কাঠামোতে যে অভাবনীয় পরিবর্তন এনেছে তার সংগে বিদ্যালয় সংগতি রাখতে পারছে না। প্রচলিত বিদ্যালয়গুলি মধ্যযুগীয় সমাজের ঐতিহাসিক চিহ্ন। এ বিদ্যালয়গুলি বৃহত্তর সমাজ বা বিদ্যালয়ের বাইরের পৃথিবীকে প্রতিফলিত করে না ; শিক্ষার্থীরা এ সব বিদ্যালয়ে নিষ্ক্রিয় শ্রোতা। তাদের নিষ্ক্রিয় মনোভাব এবং সক্রিয় আগ্রহের অভাব এটাই প্রমাণিত করে যে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে জীবন যাপন (live) করে না। এই ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ ফল হল শিক্ষার্থীর জীবনে বুদ্ধিগত উদ্দমশীলতার অভাব এবং নৈতিক জীবনের ব্যর্থতা। কারণ বুদ্ধির অনুশীলন কোন উদ্দেশ্যমূলক কাজে আর নীতিজ্ঞান সামাজিক চাহিদা ও লক্ষ্যে শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশ গ্রহণের দ্বারা সম্ভব হয়।

ডিউই বিদ্যালয় ও সমাজের এই অসংগত ব্যবধান দূর করতে চেয়েছেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি একটি 'গবেষণাগার বিদ্যালয়' (Laboratory School) স্থাপন করেন। তিনি শিশুকে বিদ্যালয়ের মধ্যেই প্রধান প্রধান সামাজিক এবং শিল্পমূলক (industrial) পরিবর্তনের সংগে পরিচয় করে দিতে চেয়েছেন। বিগত শিল্পবিপ্লবের পর আমেরিকা তথা পৃথিবীর সর্বত্র জীবনের প্রতি স্তরে এসেছে পরিবর্তন। প্রাচীন পরিবারিক জীবন পরিবর্তিত হয়েছে, গ্রামীণ সভ্যতায় হয়েছে শহরের পত্তন এবং সমাজে সৃষ্টি হয়েছে প্রচুর জটিলতা। সুতরাং ডিউই-র বক্তব্য হচ্ছে, সামাজিক সংগঠনে যে পরিবর্তন হয়েছে এবং ব্যক্তির জীবনে তার যে প্রতিক্রিয়া এসেছে; শিক্ষার্থীর জীবনে বিদ্যালয় এ সব পরিবেশন করবে।

ডিউই বলেন, বিদ্যালয় শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জীবনের কোন প্রস্তুতির ক্ষেত্র নয়। বিদ্যালয় কোন কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান নয় যে এখানে শিক্ষার্থীর শৈশব এবং পরিণত জীবনের মধ্যে একটি পার্থক্যের প্রাচীর সৃষ্টি করা হবে। শিক্ষার্থীর সমগ্র জীবনই শিক্ষার উদ্দেশ্য। এজন্য বিদ্যালয় জীবনের অনাগত কোন পর্যায়ের প্রস্তুতি পর্ব সমাধা করে না, বিদ্যালয়ই জীবন।[1]

বিদ্যালয়কে ডিউই সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলে অভিহিত করেছেন।[২] শ্রেণীকক্ষ এবং বাইরের পৃথিবীর মধ্যে নিকট সম্পর্ক থাকা চাই। শিশুদের বুদ্ধির ক্ষমতা অনুযায়ী বাস্তব জীবনের (real life) অভিজ্ঞতা বা ঘটনাকে সহজ ও সংক্ষিপ্তভাবে বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিতে হবে। বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে বাস্তব এবং প্রকৃত জীবনে প্রয়োজন ও চাহিদার স্থান থাকা চাই। বিদ্যালয়েই শিশু সামাজিক আচরণ এবং সমবেত কর্মপ্রচেষ্টা অভ্যাস করবে। শিশু-মনকে একটি শূন্য পাত্র মনে করে কতকগুলি নির্দিষ্ট গতানুগতিক ধারণা বা তথ্যের দ্বারা সে পাত্র পূর্ণ করার চেষ্টা বৃথা। শ্রেণীকক্ষেই শিশুকে বাস্তব জীবনের সংস্পর্শে আসার জন্য সাহায্য করতে হবে। তখনই গৃহ এবং বিদ্যালয়, বিদ্যালয় এবং সমাজ, বিদ্যালয় এবং বৃহত্তর পৃথিবীর মধ্যে সকল ব্যবধান মুছে যাবে।

শিশুর সামাজিক আচরণ, সমবেত কর্মপ্রচেষ্টার সুযোগ, চিন্তা ও আচরণের স্বাধীনতা একমাত্র গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সবচেয়ে বেশী সম্ভব। তাই বিদ্যালয়ে

1. 'The school is not a preparation for life ; it is life itself.'
2. 'Th- school is a society in miniature.'

গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রাজন্যশক্তির পতন এবং গণশক্তির উত্থান পৃথিবীর নানাদেশে দেখা দিয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থায়ও পৃথিবীর এ রাজনৈতিক পরিবর্তনের পরিচয় থাকা উচিত। সার্থক ব্যক্তিত্ব ও রাষ্ট্রের নাগরিকত্বে কোন বিরোধ নেই।

সুতরাং বিদ্যালয়ে এই আদর্শ-সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করা উচিত। এই সামাজিক পরিবেশ সৃষ্ট হলে শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা স্বীকৃত হবে, শৃংখলা হবে স্বতঃস্ফূর্ত। ডিউই-র মতে, সকল অসামাজিক পরিবেশই বিশৃংখলার জন্য দায়ী। বিদ্যালয়ে বিশেষ আদর্শ-সামাজিক পরিবেশ উপস্থিত থাকলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সমাজমণ্ডিত (Socialised) হয়ে ওঠে। সামাজিক উদ্দেশ্য, সমবেত কর্মানুষ্ঠানের সুযোগ এবং জীবনের দায়িত্ব গ্রহণের অধিকার প্রভৃতি শিক্ষার্থীর জীবনে শুধু সামাজিক, স্থিতি ও সংহতি রক্ষা করে না, ব্যক্তির অন্তর্নিহিত নিয়ন্ত্রণেরও (internal control) সহায়তা করে।

এজন্য ডিউই বলেন, বিদ্যালয় শুধু সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করবে না, এক আদর্শ সামাজিক পরিবেশও সৃষ্টি করবে। বিদ্যালয় হল একটি বিশেষ সামাজিক পরিবেশ।[1] আর সে পরিবেশ একমাত্র গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় সম্ভব।

৫। ডিউই-র সক্রিয়তা-তত্ত্ব (Dewey's Theory of Activity):

ডিউই বলেন, মানুষের চিন্তাশক্তি বা বুদ্ধির ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে। জটিল এবং অপ্রতিকূল পরিস্থিতিতে মানুষ সংগতি সাধন করতে পারে কারণ বুদ্ধি তার সহায়ক। নিছক বুদ্ধিচর্চার মধ্যে কোন সার্থকতা নেই। ভাববাদী (Idealist) বা বুদ্ধিবাদী (Rationalist) দার্শনিক ব্যক্তির বুদ্ধি চর্চার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু বাস্তব জীবনে এর কোন প্রয়োগ মূল্য (pragmatic value) নেই। ডিউই বলেন, বুদ্ধি আমাদের পরিবেশের সংগে সংগতি সাধনে সহায়তা করে। যেহেতু এ সংগতি-সাধনের উপর আমাদের জীবনের অস্তিত্ব নির্ভর করে সেহেতু বুদ্ধি আমাদের অস্তিত্বরক্ষার একটি প্রধান অবলম্বন (Instrument)। এই বুদ্ধি বা চিন্তা দুই প্রকারের—মননমূলক (reflective)

1. 'School is a special environment.'

এবং কল্পনামূলক (Imaginative)। মননমূলক চিন্তাই আমাদের সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে।

আমাদের জীবনে সমস্যা কি? ব্যক্তির জীবনে অভিজ্ঞতার লীলাখেলা চলছে। এ অভিজ্ঞতা ব্যক্তির মানসিক জগতে তার নতুন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তখন পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা বা ব্যক্তির মনে সঞ্চিত ভাব বা জ্ঞানের সংগে একটি বিরোধ সৃষ্টি হয়। নতুন অভিজ্ঞতা মানেই নতুন পরিস্থিতি। ব্যক্তিকে সেই নতুন পরিস্থিতির সংগে সংগতি রক্ষা করতে হয়, তা না হলে তার অস্তিত্ব বিপর্যস্ত হবে। ব্যক্তি যে-জীবনে বা অভিজ্ঞতায় যে-আচরণ বা সংগতি-সাধনে অভ্যস্ত, নতুন পরিস্থিতিতে সে-সব তাকে রক্ষা করতে পারে না। তখন ব্যক্তিকে নতুন পরিবেশের সংগে সার্থক সংগতি স্থাপনের জন্য নতুন করে জ্ঞান বা সত্য আহরণ করতে হয়।

সমস্যা দেখা দেয় তখনই যখন ব্যক্তি নতুন পরিবেশে তার অভ্যস্ত আচরণকে প্রয়োগ করতে গিয়ে বাধা পায়। অর্থাৎ ব্যক্তির সক্রিয়তা থেকেই সমস্যার উদ্ভব। যে জড়বস্তু সক্রিয় নয় তার কোন সমস্যাও নেই। সমস্যা উপস্থিত হলেই ব্যক্তি তখন আরও কর্মমুখর হয়ে ওঠে। সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন অভিজ্ঞতা বা নতুন তথ্য উদ্ভাবন করেই সম্ভাব্য উপায় স্থির করে নেয়। এভাবেই ব্যক্তির জীবনে অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন চলে, ব্যক্তির জীবনে ও সভ্যতায় প্রগতি সম্ভব হয়, সকল সত্য এবং তথ্য সমস্যা-সমাধানের উপায় হিসেবে পরীক্ষিত হয়।

ডিউই-র মতে সমস্যা সমাধান এবং তত্ত্ব বা সত্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে হল পরীক্ষণ (experiment)। চিন্তায় যাথার্থ্য এবং জ্ঞানের মূল্য বাস্তবে প্রয়োগ করেই যাচাই করতে হয়। এজন্য তাঁর প্রয়োগবাদকে পরীক্ষণবাদ (Experimentalism) বলেও অভিহিত করা হয়।

ডিউই-র এ সক্রিয়তা তত্ত্বের গুরুত্ব এবং অভিনবত্ব খুবই গভীর। ডিউই-র আগেও অনেকেই শিক্ষায় সক্রিয়তার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন এবং শিশু-শিক্ষায় সক্রিয়তাকে স্থান দিয়েছেন। সক্রিয়তাকে ডিউই-র পূর্বে শিক্ষায় স্থান দেবার কারণ প্রসংগে বলা হয়েছে যে, সক্রিয়তার সাহায্যেই শিশুর দৈহিক ও মানসিক সম্ভাবনার বিকাশ হয়, সক্রিয়তার সাহায্যেই শিশুর শিক্ষা

বাস্তবধর্মী হয়। কিন্তু ডিউই সক্রিয়তাকে সমর্থন করেছেন আরও ব্যাপক অর্থে। তাঁর মতে সক্রিয়তা থেকে আসে সমস্যা, আর সে সমস্যা সমাধানেই আমাদের সকল সত্য বা তত্ত্ব পরীক্ষিত হয়, নতুন তত্ত্ব বা সত্য উদ্ভাবিত হয়। এভাবে শুধু সত্য বা জ্ঞানই সক্রিয়তার উপর নির্ভরশীল নয়, ব্যক্তির জীবনের বিকাশ এবং সভ্যতার প্রগতিও এই সক্রিয়তার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং মানব-শিক্ষা একমাত্র এ সক্রিয়তার মাধ্যমেই সম্ভব।

৬। ডিউই-র শিক্ষাপদ্ধতি (Dewey's Method of Teaching):

ডিউই-র শিক্ষাপদ্ধতি মূলতঃ তার সক্রিয়তা-তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ পদ্ধতিকে সমস্যাপদ্ধতিও (Problem Method) বলা হয়। সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা নতুন জ্ঞান বা সত্য আহরণ করি এবং বাস্তবে তা প্রয়োগ করি। এখানে ডিউই পাঁচটি স্তর বা সোপানের (Steps) কথা বলেছেন, সে সোপানগুলি হল :

(১) **সক্রিয়তা (Activity) :** ব্যক্তি তার সক্রিয়তার দ্বারা পরিবেশের ওপর প্রতিক্রিয়া করে।

(২) **সমস্যা (Problem) :** যখন নতুন পরিস্থিতি বা অপ্রতিকূল পরিবেশ উপস্থিত হয়, তখন ব্যক্তি তার অভ্যস্ত আচরণে বাধা পায় এবং সমস্যার সৃষ্টি হয়।

(৩) **তথ্য (Data) :** ব্যক্তি তখন মনে মনে প্রতিকূল পরিবেশকে জয় করার জন্য বা সমস্যা সমাধানের জন্য অনেক তথ্য বা সংবাদ সংগ্রহ করে।

(৪) **প্রকল্প (Hypothesis) :** অনেকগুলি ধারণার মধ্যে একটি ধারণাকে সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য উপায় হিসেবে নির্বাচন করে।

(৫) **পরীক্ষণ (Experiment) :** তারপর ব্যক্তি সে ধারণাকে বাস্তবে প্রয়োগে করে তার কার্যকারিতা পরীক্ষণ করে।

ডিউই তাঁর শিক্ষা পদ্ধতিকে এভাবে বাস্তবক্ষেত্রে পরীক্ষণের ওপর দাঁড় করিয়েছেন। অভিজ্ঞতার পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যেই শিক্ষার্থী জ্ঞান অর্জন

করবে। শিশুর অভিজ্ঞতা আহরণের ক্ষেত্র হবে সামাজিক পরিবেশ। কোন কৃত্রিম অনুশাসন বা নিয়ন্ত্রণের দ্বারা শিশুর স্বাধীনতাকে ব্যাহত করা হবে না। পরস্পর সহযোগিতা, সহানুভূতি প্রভৃতির মাধ্যমে শিশু-মনে সমাজচেতনা জাগিয়ে তুলতে হবে।

ডিউই তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে গতানুগতিক বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষের ব্যবস্থা তুলে দিয়েছিলেন। টেবিল, চেয়ার, ব্ল্যাকবোর্ড দিয়ে সাজান কোন ঘর ছিল না। পুস্তকপাঠকে তিনি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেছিলেন। সক্রিয়ভাবে অভিজ্ঞতা গ্রহণের মাধ্যমেই শিশুরা নানা বিষয়ের জ্ঞান লাভ করত।

৭। ডিউই-র আগ্রহতত্ত্ব (Dewey's Theory of Interest) :

ডিউই-র মতে আমাদের আগ্রহ একটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা। এ প্রসংগে তিনি হারবার্টের আগ্রহতত্ত্বের সমালোচনা করেন। হারবার্টের আগ্রহতত্ত্ব হল আত্মবীক্ষণমূলক। যখন শিক্ষার্থীর আহরিত ভাবগুলির সংগে বা আত্মবীক্ষিত ভাবপুঞ্জের সংগে নতুন ভাবের সাদৃশ্য থাকে, তখনই শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ জন্মে। ডিউই বলেন, এ ধরনের আগ্রহ যান্ত্রিক এবং কৃত্রিম। তাঁর মতে আগ্রহ ব্যক্তির বিকাশের পথে অবস্থিত কোন বস্তুর প্রতি স্বতঃপ্রণোদিত প্রেষণা। আগ্রহ এবং প্রচেষ্টার (effort) মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আগ্রহ যখন বৃদ্ধি পায় তখন প্রচেষ্টাও বাড়ে। ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়েই আগ্রহ প্রকাশ পায়, আগ্রহ সৃষ্টির জন্য কৃত্রিম ব্যবস্থার বা প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই। ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ তার সক্রিয়তার নামান্তর, অথবা যতবেশী আগ্রহ, তত বেশী প্রচেষ্টা।

ব্যক্তিগত বৈষম্যনীতি (Principle of individual difference) অনুসরণ করে ডিউই বলেন, প্রতি ব্যক্তি অনন্য (unique)। তার রুচি, আগ্রহ, সম্ভাবনা, শক্তি ইত্যাদির মধ্যে তার স্বাতন্ত্র্য বর্তমান। সুতরাং প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশ রয়েছে। শিক্ষায় শুধু তার আগ্রহই একমাত্র বিবেচ্য, তার সমগ্র আত্মঅভিব্যক্তি অনুযায়ী শিক্ষাও হবে ব্যক্তিমুখী, বৈচিত্র্যময়।

৮। শিক্ষাতত্ত্বে ডিউই-র অবদান (Contributions of Dewey to the theory and practice of education) ঃ

শিক্ষাতত্ত্বে ডিউই-র অবদান যুগপ্রসারী। রুশো আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের ইতিহাসে যে বিপ্লব এনেছিলেন তার সার্থক পরিণতি ঘটল ডিউই-র শিক্ষাতত্ত্বে। ডিউই প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাদর্শনের (Educational Philosophy) প্রতিষ্ঠাতা। তিনি শুধু শিক্ষার দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়ে ক্ষান্ত হননি, দর্শনের সংগে শিক্ষার পরিণয় ঘটিয়েছেন।

ডিউই আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষার (Progressive education) জনক। শিক্ষা জীবনের সংগে সমব্যাপক, জীবনের প্রগতির সংগে শিক্ষারও প্রগতি। শিক্ষা নির্দিষ্ট পূর্বকল্পিত কতকগুলি অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ন নয়, উহা অভিজ্ঞতার আলোকে অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন।

ডিউই তাঁর শিক্ষাতত্ত্বে ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সামজতান্ত্রিক ভাবধারার এক সার্থক সমন্বয় সাধন করেছেন। ব্যক্তির শিক্ষা একমাত্র সামাজিক পরিবেশেই সম্ভব। সমাজই ব্যক্তির জীবনীশক্তির সঞ্চারক। শিক্ষাকে তিনি তাই সামাজিক প্রক্রিয়া বলে অভিহিত করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ডিউই-র শিক্ষাতত্ত্বে পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করেছে। তাছাড়া, গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাই যে আদর্শ-সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং ব্যক্তির স্বাধীনতা ও সামাজিক চাহিদার সার্থক সমন্বয় যে একমাত্র গণতন্ত্রেই সম্ভব; এই গবেষণালব্ধ সত্য ডিউই আমাদের উপহার দিয়েছেন।

বিদ্যালয়কে সমাজধর্মী করে তোলার যে আন্দোলন আজ পৃথিবীর সর্বত্র দেখা দিয়েছে, সে আন্দোলনের স্রষ্টা হলেন ডিউই। বিদ্যালয় ও সমাজের সম্পর্কের এমন সার্থক ব্যাখ্যা সম্ভবতঃ ডিউই-র আগে আর কেউ দিতে পারেননি। দার্শনিক, সমাজতান্ত্রিক এবং মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে তাঁর এ ব্যাখ্যা সর্বজনের প্রশংসা অর্জন করেছে।

শিক্ষাকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে শিক্ষার্থী গ্রহণ করবে। শিক্ষার বাইরে শিক্ষার কোন লক্ষ্য নেই। শিক্ষাকে এমন ব্যাপক দৃষ্টিভংগী থেকে একমাত্র ডিউই-ই দেখেছেন। শিক্ষা পদ্ধতিকে পরীক্ষণের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে শিক্ষাকে বিজ্ঞানসম্মত করে তোলার জন্য ডিউই বিশ্ববন্দিত হয়েছেন।

প্রশ্নাবলী

1. Give an outline of Rousseau's theory of education.
2. Discuss Rousseau's contributions to the theory and practice of education.
3. Rousseau has been called the father of modern child-centred education. Do you agree ?
4. Discuss Rousseau's four stages of the human development.
5. Why does Rousseau reject the conventional education as all positive ?
6. Comment upon Rousseau's theories of Negative Education and Natural Consequences.
7. Describe Pestalozzi's contribution to educational thought and practice.
8. "The modern education breathes the spirit of Pestalozzi."—Discuss.
9. What is Pestalozzian Movement in education.—Discuss.
10. Discuss Pestalozzi's method of teaching.
11. Pestalozzi has made a marked advance upon Rousseau.—Discuss.
12. 'Education is synonymous with morality.' Discuss in this connection the educational ideas of Herbert.
13. What Rousseau and Pestalozzi felt, Herbert put them into effect.' —Discuss.
14. Discuss Herbert's methods of teaching and evaluate the merit of his Five Formal steps
15. What are the basic ideas of Herbert's theory of education ?
16. Discuss Herbert's contributions to the theory and practice of education.
17. Describe the major features of Froebel's kindergarten system.
18. Discuss Froebel's philosophy of education,
19. Discuss Froebel's method of teaching.
20. Discuss Froebel's theory of unfoldment & theory of self activity.
21. What are the contributions of Froebel to the theory and practice of education ?
22. Discuss the chief features of Montessori's theory of education.
23. Make a comparative study between Kindergarten system and Montessori system.
24. "The knell of class teaching was rung by Montessori"—Discuss.
25. Discuss the contributions of Montessori to the theory and practice of education.
26. Discuss Dewey's theory of education.
27. Discuss Dewey's theory of activity and method of teaching.
28. Bring out the significance of the following statements :
    (a) Education is growth.
    (b) Education is constant reconstruction and reconstitution of experience.
    (c) Education is a social process.
    (d) Education being a process cannot have an aim outside it.
    (e) The aim of education is more education.
    (f) The school is a society in miniature.
    (g) School is a special environment.
29. Discuss Dewey's contributions to the theory and practice of education.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শিক্ষক ও শিক্ষকের গুণাবলী

(Teacher and his qualifications)

শিক্ষাতত্ত্বে 'শিক্ষা', 'শিক্ষার্থী' এবং 'শিক্ষক'—এই তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ। আমরা পূর্বে 'শিক্ষা' এবং 'শিক্ষার্থী' (শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা) সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীই যে প্রধান বিবেচ্য, সমগ্র শিক্ষা পরিকল্পনা যে শিক্ষার্থীকেই কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, এ সব বিষয় আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু এ প্রসংগে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, শিক্ষা পরিকল্পনাকে বাস্তবে সার্থক করে তোলার জন্য যে সব অক্লান্ত কর্মীদের প্রয়োজন তাঁরা হলেন শিক্ষক। এজন্য শিক্ষাতত্ত্বে 'শিক্ষক প্রসংগ' এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। আমরা প্রথমতঃ শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করছি :

১। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক (Relation between the teacher and the taught) :

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক নির্ণয় আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বে একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়। প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় এ সম্পর্কের গুরুত্ব সম্বন্ধে আমরা অবহিত ছিলাম না। তার কারণ সেদিন শিক্ষককে কেন্দ্র করেই হত শিক্ষার আয়োজন। কিন্তু আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র করেই শিক্ষার আয়োজন। সুতরাং উভয়ের সম্পর্ককে আমরা দু' ভাগে আলোচনা করছি—(ক) গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক এবং (খ) আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক।

(ক) গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক (Relation between the teacher and the taught in conventional education) : গতানুগতিক শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, সে শিক্ষা ছিল শিক্ষক-কেন্দ্রিক (teacher-centred)। শিক্ষককে কেন্দ্র

করেই ছিল শিক্ষার সকল আয়োজন, সকল ব্যবস্থা। শিক্ষক ছিলেন জ্ঞানদাতা আর শিক্ষার্থী গ্রহীতা। পৃথিবীর পরিচয় শিক্ষকের মাধ্যমেই শিক্ষার্থী লাভ করত। সকল অভিজ্ঞতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকতেন শিক্ষক, শিক্ষকের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করত শিক্ষার্থী। বিদ্যাবিতরণ, অভিজ্ঞতা পরিবেশন ছিল শিক্ষকের কাজ। নিষ্ক্রিয়ভাবে শিক্ষকের বক্তৃতা শ্রবণ ছিল শিক্ষার্থীর কর্তব্য। শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা, স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ, বাস্তব পরিবেশে অভিজ্ঞতা ইত্যাদি আহরণ কোন কিছুই সম্ভব ছিল না সেদিনকার শিক্ষাব্যবস্থায়।

গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় একমাত্র শিক্ষকই ছিলেন সক্রিয়। শিক্ষাদান কার্যে, শ্রেণীকক্ষে, সর্বব্যাপারে এবং সর্বত্র শিক্ষকের প্রাধান্য ছিল বিস্তৃত। বিদ্যালয় বলতে আমরা জানতাম শিক্ষকের শিক্ষাদানের কার্যস্থল আর শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণের জন্য শ্রেণীকক্ষে বিভক্ত একটি কৃত্রিম পরিবেশ।

উপরের আলোচনা থেকে এইটুকু পরিষ্কার হয়ে যায় যে গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক ছিলেন নানা কর্তৃত্বের অধিকারী (authoritarian)। তাঁর স্থান ছিল অত্যন্ত উচ্চে। 'গাধা পিটিয়ে মানুষ করার' দায়িত্ব ছিল তাঁর। শিক্ষার্থী পেলব মাটি, তাকে ইচ্ছামত রূপ দেবার ভার শিক্ষকের। শিক্ষার্থীর চরিত্র সৃষ্টি, জীবনবিকাশ সবই শিক্ষকের পূত কর্তব্য ছিল।

শিক্ষক ছিলেন উচ্চাসনে, প্রধান ভূমিকায়। আর তাঁকে ঘিরে নীচাসনে ছিল শিক্ষার্থীর দল। সুতরাং শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ছিল দুই অসমান স্তরের। শিক্ষক ছিলেন ভিন্ন স্তরের, ভিন্ন সমাজের মানুষ। শিক্ষার্থীর দলের সংগে তাঁর সম্পর্ক সাময়িক, আনুষ্ঠানিক (formal), মাঝে মাঝে শিক্ষাদান কার্যে, পঠ্যতালিকার মধ্যে সে সম্পর্ক সীমায়িত। শিক্ষার্থীর কাছ থেকে শিক্ষক আশা করতেন নিরবচ্ছিন্ন আনুগত্য (loyalty) আর ষড়রিপুতাড়িত শিক্ষার্থীর জীবনে মানসিক শৃংখলা (mental discipline) আনয়ন করাই ছিল শিক্ষকের অভিলাষ।

এজন্য গতানুগতিক শিক্ষায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ছিল একমুখী (unidirectional) অর্থাৎ শিক্ষকই শিক্ষার্থীর ওপর প্রভাব বিস্তার করার অধিকারী ছিলেন। শিক্ষার্থী নিষ্ক্রিয়, স্থাণু, যেন একটা গ্রাহক-যন্ত্র (receiving apparatus)। ফলে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে কোন

সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। শিক্ষক তাঁর উচ্চ মর্যাদা সম্বন্ধে সদা সচেতন। একমাত্র শিক্ষাদানের সময় তিনি শিক্ষার্থীর সামনে অবতীর্ণ হতেন—তাঁর একমাত্র শিক্ষাদান কাজকে কেন্দ্র করেই তাঁর স্থিতি এবং মর্যাদা। সুতরাং গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্ক ছিল কৃত্রিম, অস্বাভাবিক এবং আড়ষ্ট। অসংগত একটি দূরত্বের ব্যবধান শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে আলাদা করে রেখেছিল।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর এই অসামাজিক, অমনস্তাত্ত্বিক সম্পর্কের জন্য দায়ী ছিল সেদিনকার জীবন ও শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগী। জীবনকে সেদিন আমরা দেখেছিলাম কয়েকটি নির্ধারিত আদর্শের প্রতিফলনের ক্ষেত্র (field) রূপে; আর শিক্ষা ছিল সে আদর্শ রূপায়ণের সহায়ক (instrument) এবং শিক্ষক ছিলেন কর্তা। এর পরিণাম ছিল ভয়াবহ। শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা ও মর্যাদা ছিল গতানুগতিক শিক্ষায় অস্বীকৃত। ফলে শিক্ষার সংগে শিক্ষার্থীর কোন হৃদয়ের যোগ ছিল না, আর হৃদয়ের যোগ ছিল না বলেই সেদিনকার শিক্ষা ছিল আরোপিত (imposed) এবং কৃত্রিম। তারপর যে সমস্যা শিক্ষাব্যবস্থায় সকলকে বিব্রত করত তা ছিল শৃংখলাবিধানের সমস্যা। কতকগুলি কঠোর নিয়ম ও শাসনের দ্বারা শিক্ষার্থীর মধ্যে শৃংখলা স্থাপনের চেষ্টা করা হত। শাস্তির ভয়, পুরস্কারের প্রলোভন, শিক্ষকের ভীতিকর আচরণ প্রভৃতি অস্বাভাবিক পন্থায় শিক্ষার্থীর জীবনে শৃংখলা প্রবর্তন করে শিক্ষাদান সমাপ্ত করা হত। শিক্ষার্থীর সংগে সহজ মেলামেশা, সৌহার্দপূর্ণ প্রীতিময় আচরণকে সেদিন শিক্ষক যতদূর সম্ভব পরিহার করতেন। শিক্ষার্থীর প্রতি এক উদাসীন মনোভাব নিয়ে দূরত্বের এক কৃত্রিম আবরণে শিক্ষক সেদিন নিজেকে ঢেকে রাখতেন এক অলীক মর্যাদা ও উচ্চতাবোধের রাজ্যে।

কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, প্রাচীন ভারতে আর গ্রীসদেশে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক এ ধরনের অসামাজিক ছিল না। গুরুর আশ্রমে শিষ্য বা শিক্ষার্থীরা সমবেত হয়ে এক আদর্শ-সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করত। গুরুর সংগে শিষ্যের সম্পর্ক ছিল গভীর, সহজ ও প্রীতিময়। গুরু ছিলেন শিষ্যের সুখ-দুঃখের নিত্য সাথী। রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাঁর *Ancient Indian Education* বইতে সেদিনকার গুরুশিষ্যের সহজ সম্পর্ক বর্ণনা প্রসংগে

বলেছেন, আজকে শিক্ষার্থীকে কায়িক পরিশ্রমে যে উৎসাহ দেওয়া হয় বা সক্রিয়ভাবে শিক্ষাগ্রহণে যে সুযোগ দেওয়া হয়, প্রাচীন ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থায়ও তা স্বীকৃত ছিল। গুরুর নির্দেশে ব্রহ্মচারী কায়িক পরিশ্রম করত অথবা ভিক্ষায় বেরুত। প্রাচীন গ্রীসদেশেও শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সহজ প্রীতিময় সম্পর্ক ছিল। গ্রীকদার্শনিক সক্রেটিস শিক্ষার্থীকে বন্ধু বলেই জানতেন। সোফিস্টরা (*Sophist*) তাঁদের শিক্ষা প্রচারের সময় শিক্ষার্থীর প্রতি সম্মান দেখাতেন বলে কেউ কেউ বলে থাকেন।

(খ) আধুনিক শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক (Relation between the teacher and the taught in modern child-centred education): আধুনিক শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার আন্দোলন মধ্যযুগীয় শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর বিকৃত সম্পর্কের অবসান ঘটিয়েছে। আধুনিক শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার জনক রুশো ঘোষণা করলেন, শিক্ষা শিশুর জন্মগত অধিকার (birth right)। সুতরাং শিক্ষার ভারকেন্দ্র (centre of interest) হবে শিশু বা শিক্ষার্থী। শিশুর চাহিদা, স্বাধীনতা, আগ্রহ, অভিরুচি ইত্যাদি হবে শিক্ষায় প্রধান বিবেচ্য। সক্রিয়ভাবে ও বাস্তব অভিজ্ঞতা সংগ্রহের মাধ্যমে শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করবে।

এই শিশু-কেন্দ্রিক বা শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক শিক্ষার আন্দোলন শিক্ষাতত্ত্বে এক বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। উহা শুধু শিক্ষা-সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভংগীর আমূল পরিবর্তন করেনি, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্কের মধ্যেও এনেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। শিক্ষক আজ আর শিশুর চরিত্রস্রষ্টা বা ভাগ্যনিয়ন্তা বলে অভিহিত নন। শিক্ষকের পাণ্ডিত্য (scholarly knowledge) শিক্ষাদানে আজ বড় কথা নয়। শিশু-মনকে জানা এবং শিশুর আগ্রহ অনুযায়ী তার শিক্ষা গ্রহণে সহায়তা করা শিক্ষকের কাজ। সুতরাং শিক্ষকের স্থান আজ তথাকথিত উচ্চ আসনে নেই। তিনি শিক্ষার্থীর সমগোত্রীয়। শিশুর কাছে কতকগুলি নির্ধারিত তত্ত্ব ও তথ্য, অভিজ্ঞতা ও সংবাদ পরিবেশন করে শিশুর জীবনকে কৃত্রিমভাবে নিয়ন্ত্রিত করার অধিকার থেকে তিনি আজ বঞ্চিত। আজ শিক্ষক কোন অতিমানবিক ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের অধিকারী তো নন-ই, শিক্ষায় তিনি প্রধান বিবেচ্যও নন। শিক্ষার পুরোভাগে আজ শিশু বা শিক্ষার্থী। শিক্ষার্থী

নিজেই শিক্ষা গ্রহণ করে। শিক্ষক জ্ঞানদাতা বলে যে দেবসুলভ জ্যোতির্মণ্ডল (halo) নিয়ে বিরাজ করতেন, তা আজ আর নেই।

সুতরাং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে কৃত্রিম দূরত্ব আজ অপসারিত। তিনি শিক্ষার্থীর সংগে একই সামাজিক স্তরে নেমে এসেছেন। শিক্ষকের দায়িত্ব প্রচুর, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে তিনি কোন কর্তৃত্ব বা ক্ষমতার অধিকারী (authoritarian)। তিনি শুধু অধিক অভিজ্ঞ, সহানুভূতিশীল, বয়স্ক সংগী (elder companion)। এখানে উল্লেখযোগ্য যে আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষা-পদ্ধতিতে অনেক সময় 'শিক্ষক' শব্দ প্রয়োগ না করে 'নির্দেশক' (instructor) শব্দ ব্যবহার করা হয়। শিক্ষক আজ বাস্তব জগতের অভিজ্ঞতাকে আড়াল করে রাখেন না। শিক্ষার্থী যাতে সক্রিয়ভাবে নিজেই অভিজ্ঞতা গ্রহণ করতে পারে সেদিকে তাঁর সজাগ দৃষ্টি।

তাই শিক্ষক আজ শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণ কার্যে সহায়ক বন্ধু। তিনি সহানুভূতিশীল, পথপ্রদর্শক, শিক্ষার্থীর একান্ত আপনজন। সমীহ করে শিক্ষককে দূরে রেখে শিক্ষার্থী আজ শিক্ষা গ্রহণ করে না। তাদের মধ্যে আজ সম্পর্কের গভীর নৈকট্য বর্তমান। শিক্ষক আজ তাঁর উচ্চাসন পরিত্যাগ করে শিক্ষার্থীর জীবনেই নিজের সার্থকতা খোঁজেন। তিনি শিক্ষার্থীর সহকর্মী— শ্রেণীকক্ষে, খেলার মাঠে, সভাসমিতিতে, শিক্ষার্থীদের সমবেত কর্ম প্রচেষ্টায়, আনন্দ-উৎসবে সর্বত্র তিনি শিক্ষার্থীর সহযোগী। তিনি নিজেও তাদের সংগে শিক্ষা গ্রহণ করেন।[1] শিক্ষক-শিক্ষার্থী এক অভিন্ন শিক্ষা প্রক্রিয়ায় অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শান্তিনিকেতনে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মধ্যে সহজ প্রীতিময় সম্পর্ক স্থাপনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। আধুনিক ভারতের শিক্ষাসংস্কারে বিশ্বভারতীর দান অসীম। সার্থক শিক্ষাদানের প্রথম শর্ত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধুর ও প্রীতিময় এবং সহজ ও সহানুভূতিপূর্ণ সম্পর্ক। এ প্রসংগে রবীন্দ্রনাথ বলেন: "জ্ঞানের আদান-প্রদানের ব্যাপারটি সাত্ত্বিক। তাহা প্রাণকে উদ্বোধিত করে। সেজন্য এইখানেই প্রাণের নাগাল পাওয়া সহজ। এইখানেই গুরুর সংগে শিষ্যের সম্বন্ধ যদি সত্য হয়, তবে ইহ-জীবনে তার বিচ্ছেদ নেই। তাহা পিতার সংগে পুত্রের সম্বন্ধের চেয়েও গভীরতর।"

---

1. 'Teacher is ever a learner.' : Findley

২। শিক্ষকের কাজ (Functions of a Teacher) :

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকের প্রাধান্য নেই, তাঁর কর্তৃত্বময় (authoritarian) পদ থেকে তিনি আজ বিচ্যুত। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে শিক্ষকের কোন দায়িত্ব আজ নেই ; বরং গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকের যে দায়িত্ব ছিল, বর্তমানে সে দায়িত্বের পরিধি এবং প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়েছে। গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় নির্দিষ্ট পুস্তক পড়িয়ে বা শ্রেণীকক্ষে বক্তৃতা দিয়ে শিক্ষক তাঁর শিক্ষাদান কার্য সমাপ্ত করতেন, আর অর্জিত অভিজ্ঞতা বিতরণ করেই তৃপ্ত থাকতেন। শিক্ষার্থীর জীবনের সংগে তাঁর কোন যোগ ছিল না।

কিন্তু আজ শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্মের পরিধি আরও ব্যাপক। শিক্ষক অভিজ্ঞতা বিতরণ করে বা পুঁথিগত জ্ঞানের বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত থাকতে পারেন না। আজ শিক্ষককে দেখতে হয় শিক্ষার্থী তার অর্জিত অভিজ্ঞতাকে কতটুকু কাজে লাগাবে। বাস্তব পরিবেশে শিক্ষার্থী যাতে সক্রিয় অভিজ্ঞতা গ্রহণ করতে পারে, শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশ যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্ভব হয়, কোন প্রতিবন্ধক যেন তার ব্যক্তিত্বকে অপহত না করে—এ সব ব্যাপারে শিশুর সহযোগী হওয়া আজ শিক্ষকের কাজ।

আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি শিক্ষকের শিক্ষাদান কার্যে আমূল পরিবর্তন এনেছে। গতানুগতিক শিক্ষায় শিক্ষকের শিক্ষাদান কার্য সাধারণ বক্তৃতার দ্বারাই সমাপ্ত হত। শিক্ষার্থীর এতে আগ্রহ আছে কিনা, তার গ্রহণ ক্ষমতা কতটুকু এ সব বিবেচনা করা শিক্ষকের কোন কাজ ছিল না। নতুন শিক্ষা-পদ্ধতি (New Teaching) শিক্ষাকে মনস্তত্ত্বসম্মত করে তুলেছে এবং প্রগতিশীল শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হল উহার শিশু-কেন্দ্রিকতা (Paido-centricism)। আজকে শিশু শিক্ষায় শিক্ষকের প্রধান কাজ হল তিনি প্রথম শিশু-মনকে গভীর যত্ন ও অধ্যবসায়ের সংগে অধ্যয়ন করবেন। অর্থাৎ শিক্ষাদানকালে শিক্ষকের বিষয়বস্তুর দক্ষতা বা পাণ্ডিত্য আজ পর্যাপ্ত নয়, তাঁকে শিশু মনস্তত্ত্ব বা শিক্ষা মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। তারপর শিশুর সহযোগী হয়ে তাকে শিক্ষাকাজ মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে সমাধা করতে হবে। বলা বাহুল্য, শিক্ষকের এ কাজ শুধু পরিশ্রম সাপেক্ষ নয়, এতে শিক্ষকের প্রচুর আন্তরিকতা থাকা প্রয়োজন।

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষকের গুরু দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্বন্ধে রাধাকৃষ্ণণ রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, সমাজ-জীবন ও সমাজ-প্রগতিতে শিক্ষকের সক্রিয় সহযোগিতা অত্যাবশ্যক, কেননা শিক্ষকের শিক্ষাদান কার্যের দ্বারা তিনটি উদ্দেশ্য সাধিত হয়—(১) শিক্ষক মানব জাতির যুগ যুগ সঞ্চিত নৈতিক এবং বুদ্ধিগত ঐতিহ্য যুব সমাজের মধ্যে প্রবাহিত করেন; (২) এ দ্বারা শিক্ষক প্রাচীন অভিজ্ঞতার ঐতিহ্যকে বর্ধিত করবেন এবং জ্ঞানের সীমাকে প্রসারিত করবেন এবং ৩) শিক্ষকের আর একটি কাজ হল শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করা।[1]

সুতরাং শিক্ষকের একটি প্রধান কাজ হল শিক্ষাকে সমাজধর্মী করে তোলা। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও সমাজ চেতনার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। ডিউই শিক্ষাকে একটি সামাজিক প্রক্রিয়া বলে অভিহিত করেছেন। সমাজই ব্যক্তির সকল কর্ম, সকল চাহিদা, সকল আকাঙ্ক্ষার পটভূমিকা রচনা করে। সমাজের প্রাচীন ঐতিহ্যকে শিক্ষার্থী শুধু গ্রহণ করবে না, সমাজকে সে সার্থকতা ও প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। সুতরাং শিক্ষার্থী যাতে সামাজিক আচরণে অভ্যস্ত হয়, বৃহত্তর সমাজে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, আপন ব্যক্তিত্বের দ্বারা নব নব সৃষ্টিতে সে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, এ সব ব্যাপারেও শিক্ষকের দায়িত্ব রয়েছে। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা শিক্ষকের এ কাজের ওপর খুবই গুরুত্ব দেয়। ডিউই বলেন, একমাত্র গণতন্ত্রই আদর্শ-সামাজিক পরিবেশ যেখানে ব্যক্তির চাহিদা ও সমাজের চাহিদার মধ্যে সার্থক সংগতি সম্ভব। শিক্ষক তাই বিদ্যালয়ে এই সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। ফলে শিক্ষার্থীর শৃংখলা হবে স্বতঃস্ফূর্ত, স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদাবোধই শিক্ষার্থীর জীবন বিকাশে সহায়ক হয়ে দাঁড়াবে।

গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠ্যসূচী নির্ধারণ ছিল খুবই সহজ। সহপাঠ্য-সূচীর বিশেষ কোন মূল্য সেদিন স্বীকৃত হয়নি, আর প্রচলিত কতকগুলি তত্ত্বমূলক জ্ঞান বা পুস্তককে পাঠ্যসূচীর মধ্যে স্থান দেওয়া হত। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষককে পাঠ্যসূচী পরিকল্পনায় প্রচুর দক্ষতা দেখাতে হয় এবং এজন্য জীবন ও

1. '(i) Transmission of the intellectual and ethical heritage of humanity to the young; (ii) enrichment of this heritage and extension of the boundaries of knowledge; (iii) development of personality'.

সমাজ সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতার অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। পাঠ্যসূচীর মাধ্যমে যাতে শিক্ষার্থী বাস্তব অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করতে পারে, শিক্ষা গ্রহণ যাতে সমাজধর্মী ও জীবনধর্মী হয়ে ওঠে—এসব আজ বিবেচনা করে শিক্ষক পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করবেন। শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ যাতে অজস্র ধারায় আপন বিকাশ পথ খুঁজে পায়, সেজন্য যথাযথ সহপাঠ্য-সূচীর প্রবর্তন করতে হয়। আর সর্বব্যাপারে শিক্ষক শিশুর নিত্য সংগী। শিক্ষককে তাই পার্সিভাল রেন *(Percival Wren)* শিক্ষার্থীর বন্ধু, দার্শনিক ও পথপ্রদর্শক বলে অভিহিত করেছেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্মুখে কেবল কতকগুলি তত্ত্বের উৎস (fountain of facts) হবেন না অথবা বিরাট পাণ্ডিত্য নিয়ে একটি চলমান বিশ্বকোষ (walking Encyclopædia) রূপে অবতীর্ণ হবেন না। শিক্ষক শিশুর সহযোগী হয়ে তার সংগে বন্ধুর মত আচরণ করবেন, তার জীবনদর্শন গঠনে সহায়তা করবেন, তাকে বিপথগামী হতে দেবেন না।[1]

শিশু-শিক্ষা সম্বন্ধে সপ্তদশ শতাব্দীতে ইতালীর শিক্ষাবিদ্ কমেনিয়াস *(Comenius)* বলেছিলেন: শিক্ষা হল শিশু-উদ্যান পরিচালনা। যেভাবে মাছ সাঁতার শেখে, পাখী উড়তে শেখে, প্রাণী দৌড়াতে শেখে, সেভাবেই শিশু শিক্ষা গ্রহণ করবে।[2] ইহা অনুসরণ করেই ফ্রয়েবেল বিদ্যালয়কে একটি শিশু-উদ্যানের সংগে তুলনা করেছেন, আর শিশুরা কোমল চারা গাছ, শিক্ষক উদ্যান পরিচালক। শিক্ষককে ফ্রয়েবেল 'সদাশয় তত্ত্বাবধায়ক'-ও (benevolent superintendent) বলেছেন। মাদাম্ মণ্টেসরী তাঁর বিদ্যালয়ে শিক্ষিকাদের 'পরিচালিকা' (Directress) বলে অভিহিত করেছেন। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষকের কাজ এ কয়েকটি মন্তব্যের মধ্যে অতি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। শিক্ষকের কাজ হবে শিশুদরদী হওয়া। যেভাবে শিশুর জীবন তার আপন সম্ভাবনার স্বচ্ছন্দগতিতে বিকশিত হয়ে ওঠে, শিক্ষক তার সহায়তা করবেন। তিনি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে শিশুকে সার্থক পরিণতি লাভ

1. **'The teacher should not merely be the fountain of facts or the walking Encyclopaedia but the guide, philosopher and friend to the young.'**

2. **'Education is child-gardening. It should come to children as swimming to fish, flying to birds and running to animals'.**

করতে পরিচালনা করবেন। এজন্য শিক্ষকের কাজকে উদ্যানের পরিচালকের সংগে তুলনা করা হয়।[1]

৩। শিক্ষকের গুণাবলী (Qualifications of a Teacher) :

সমাজ জীবনে একজন সৎ নাগরিকের যে সমস্ত গুণাবলী থাকা উচিত মানুষ হিসেবে একজন শিক্ষকেরও সে সমস্ত গুণাবলী থাকবে। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজে বা বৃত্তিতে বিভিন্ন সম্ভাবনা ও উপযুক্ততার ভিত্তিতে কর্মী নির্বাচিত হয়। সুতরাং শিক্ষণকামী ব্যক্তিদেরও যে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ গুণের অধিকারী হতে হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শিক্ষকের ক্ষেত্রে এই সব গুণাবলীর আলোচনা নিছক শুধু তাঁর শিক্ষণ বৃত্তির জন্য নয়। শিক্ষক যদি তাঁর শিক্ষণকার্যে ব্যর্থ হন তবে সে ব্যর্থতা নিছক তার আত্মগ্লানিতে সীমাবদ্ধ থাকে না ; কেননা শিক্ষকের কাজের পরিধি শিক্ষার্থীদের জীবনে ব্যাপ্ত। শিক্ষক শিশুদের জীবনের বিকাশসাধনে সহায়ক, ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জীবন শিক্ষকের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। সুতরাং শিক্ষককে হতে হয় সুশিক্ষক, তাঁর কর্মক্ষেত্র ক্রমবর্ধিষ্ণু মানব সন্তানের জীবন নিয়েই রচিত হয়। শিক্ষক স্থির জড়বস্তু নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন না। প্রতিটি শিশু তার সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে শিক্ষকের সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং শিক্ষকের স্নেহশীল ও সহানুভূতিপূর্ণ প্রভাবের দ্বারা শিশুর সকল সমস্যার সমাধান হয়, সম্ভাবনা বিকশিত হয়, সে পূর্ণতা লাভ করে। তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব ও আচরণের দ্বারা শিক্ষক পাঠ্যসূচীর নৈর্ব্যক্তিক (impersonal) অভিজ্ঞতাকে শিশুর কাছে ব্যক্তিত্বময় (personalise) করে তোলেন। এজন্য অনেক সময় বলা হয় 'শিক্ষক' শব্দ 'প্রভাব' শব্দের নামান্তর।[2]

এজন্য টমাস্ এবং ল্যাঙ্ (*Thomas and Lang*) বলেন যে, শিক্ষক এমন একজন শিক্ষিত মানুষ যাঁর আচরণকে আদর্শ বা নমুনা (model) হিসেবে সবাই অনুকরণ করে, তিনি সবার মনে উত্তেজনা এবং প্রেরণা সৃষ্টি করেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব সবার মধ্যে বিচ্ছুরিত (radiate) হয় এবং এই ব্যক্তিত্বই তাঁকে

1. 'The function of a teacher is somewhat like that of a gardener.'
2. 'Teacher' is essentially another name for 'influence.'

শিক্ষাক্ষেত্রে একটি সৃজনধর্মী শক্তি হিসাবে গড়ে তোলে।[1] সুতরাং শিক্ষক শিশুদের জীবনে প্রেরণা সঞ্চার করবেন। তাঁর শিক্ষাদান ব্যর্থ হতে বাধ্য যদি তিনি শিশু-মনে কোন প্রেরণা সৃষ্টি করতে না পারেন। উত্তপ্ত লোহায় ঘা দিতে হয়, শীতল লৌহখণ্ডে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা যেতে পারে না। শিক্ষক যখন শিশুকে উদ্দমশীল, আগ্রহী করে তুলবেন তখনই তাঁর প্রভাব শিশুর ওপর প্রতিক্রিয়া করবে।[2]

সুতরাং শিক্ষকের শিক্ষাদানকার্য সংসারের আর দশ-পাঁচটি কাজ থেকে পৃথক। এ কাজ অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং দায়িত্বপূর্ণ। শিক্ষককে তাই কতকগুলি বিশেষ গুণের অধিকারী হতে হয়। বলা বাহুল্য, এ সব গুণ অনেকটাই জন্মগত। 'শিক্ষক তৈরী করা যায় না, শিক্ষক জন্মেন।'[3]—এ প্রবাদবাক্য মিথ্যা নয়। শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থায় শিক্ষক ব্যবহারিক গুণগুলিই শেখেন, শিক্ষকের মানবীয় গুণ সহজাত।

শিক্ষকের গুণাবলী (marks) নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। শিক্ষকের কোন্ কোন্ গুণ তাঁর শিক্ষাদান কার্যের সহায়ক অথবা শিক্ষকের কোন্ কোন্ গুণ বা আচরণ শিক্ষার্থী পছন্দ করে, কোন্ কোন্ গুণ থাকলে শিক্ষক শিক্ষাকে শিশুর জীবনে সার্থক করে তুলতে পারেন, এ সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। মনোবিজ্ঞানী বার্‌র্ (*Barr*) এ সমস্ত আলোচনার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা আমাদের উপহার দিয়েছেন। আমরা নিম্নে বার্‌র্‌কে (*Barr*) অনুসরণ করে শিক্ষকের গুণাবলী আলোচনা করছি :

(ক) শিক্ষকের ব্যক্তিগত গুণাবলী (Personal marks of a Teacher) : শিক্ষকের প্রধান গুণ হবে তাঁর সুবিবেচনা। সুশিক্ষকের পক্ষে ধৈর্য, সহনশীলতা, সহজ, সরল ও ভদ্র আচরণ এবং শিশুকে শিশুর মন অনুযায়ী বিবেচনা করা ও শিক্ষার্থীর কাজের মূল্যদান ইত্যাদি অত্যন্ত প্রয়োজন।

1. 'It is the exempler of an educated person that the teacher is, it is the stimulation and inspiration which he generates, it is the personality that he radiates, it is the person that is the back of the teacher which make him the great formative force.

2. 'The teacher who is attempting to teach without inspiring the pupil with a desire to learn, is hammering on cold iron'.

3. 'Teachers are born not made.'

তারপর শিক্ষক হবেন তীক্ষ্ণধী ও বিচক্ষণ। শিক্ষণকার্য পরিচালনা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শিক্ষার্থীকে সুসংহত এবং সুশৃংখলভাবে বিদ্যালয়ের পরিবেশে পরিচালনা করতে প্রচুর বুদ্ধি, বিচারবোধ, বিচক্ষণতা এবং উদার দৃষ্টিভংগীর প্রয়োজন।

সুশিক্ষকের আর একটি গুণ হল প্লবতা (buoyancy)। প্লবতা শব্দের অর্থ হল প্রতিকূল পরিবেশে অবদমিত না হয়ে পরিবেশকে আয়ত্ত করা এবং মনে সাহস ও আশা বজার রাখা। শিক্ষাদান কার্যে এবং ছাত্রদের সংগে মেলামেশার সময় শিক্ষক নানা অবাঞ্ছিত বা প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন হতে পারেন। সে সময় পরিবেশের কাছে যদি তিনি হার মানেন তবে সুশিক্ষক হওয়া দূরের কথা তাঁর পক্ষে শিক্ষাদানই সম্ভব হবে না। তাই শিক্ষক চতুর হবেন এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেকে প্রকাশ করবেন। এ ব্যাপারে শিক্ষকের উদ্দমশীলতা, মনের আশা, প্রফুল্লতা, বাগ্মিতা, ক্রীড়াসুলভ মনোভাব এবং রসজ্ঞান অত্যন্ত প্রয়োজন।

শিক্ষার্থী চিরকাল নতুনের পিয়াসী, গতানুগতিক আচরণ এবং আদর্শের পরিবর্তন তারা কামনা করে। এ ব্যাপারে শিক্ষকই একমাত্র সহায়ক। সুতরাং শিক্ষককে গোঁড়া হলে চলবে না, তিনি তাঁর চিন্তায়, বাক্যে এবং আচরণে প্রগতিশীল হবেন। তাঁর দৃষ্টিভংগী উদার এবং বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন।

শিক্ষক নিজে একটি সুসমন্বিত ব্যক্তিত্বের (intergrated personality) অধিকারী হবেন। তাঁর আচরণে ও চিন্তায় একটি সুসংহত এবং সুসমন্বিত রূপ থাকবে। খামখেয়ালীভাব এবং অস্থিরচিত্ততা শিক্ষকের শিক্ষাদানকে পদে পদে ব্যর্থ করে তোলে। সুতরাং তাঁর প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ বা আবেগের মধ্যে একটি নিগূঢ় সমন্বয় থাকবে।

শিক্ষকের মধ্যে গভীর আত্মবিশ্বাস থাকবে। শিক্ষার্থীরা যদি শিক্ষকের ব্যক্তিত্বে বিশ্বাসী বা নির্ভরশীল না হয় তবে তাকে অনুসরণ করা সম্ভব নয়, সেখানে শিক্ষাদান অসার্থক, সময় এবং শক্তির অপব্যবহার মাত্র।

সর্বশেষে শিক্ষক নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভংগীর অধিকারী হবেন। বার্ (Barr) এই নৈর্ব্যক্তিকতাকে (Objectivity)-কে খুব গুরুত্ব দিয়েছেন। সকলের প্রতি সমান আচরণ, পক্ষপাতিত্বহীনতা সুশিক্ষকের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। পক্ষপাতহীন না হলে শিক্ষককে শিক্ষার্থীরা মনে মনে খুব ঘৃণা করে।

শিক্ষকের দৈহিক সৌন্দর্য, বয়স, উচ্চতা ইত্যাদির সংগে শিক্ষণের সাফল্যের কোন অনিবার্য সম্পর্ক নেই বলে বার্‌র্ (*Barr*) মনে করেন। সুশিক্ষক সুশ্রী বা সুন্দর হবেন, তাঁর দৈহিক সৌষ্ঠব থাকবে—এ ধরনের কথা বলা চলে না। তবে দুর্বল, রোগগ্রস্ত বা বিকলাংগ শিক্ষক সুশিক্ষক হতে পারেন না বলে বার্‌র্ (*Barr*) অভিমত প্রকাশ করেছেন।

(খ) **শিক্ষকের জ্ঞান ও শিক্ষণকার্যে দক্ষতা (Teacher's academic qualifications and efficiency in teaching)**: শিক্ষক যে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শিক্ষা দেবেন সে বিষয়ে তাঁর ব্যাপক জ্ঞান থাকা চাই। শিক্ষককে তাই হতে হবে প্রচুর পাণ্ডিত্য এবং বিদ্যাবত্তার অধিকারী। যে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শিক্ষকের গভীর জ্ঞান নেই, সে বস্তু তিনি শিক্ষা দিতে পারেন না। নিজের বিষয়টি ছাড়াও শিক্ষককে অন্যান্য বিষয়ের সংগে পরিচিত হতে হয়। একদল মনোবিজ্ঞানী এবং শিক্ষাবিদ্ বলেন, অনুবন্ধ নীতিতে (Principle of Correlation) শিক্ষাদান সার্থক। একটি বিষয়ের সংগে অন্য বিষয়ের যোগসূত্র স্থাপন করে শিক্ষাদান করলে তা শিক্ষার্থী সহজভাবে গ্রহণ করে এবং শিক্ষণ দীর্ঘস্থায়ী হয়। কিন্তু অনুবন্ধ নীতিতে সকল বিষয় পড়ান যায় কিনা এবং সব সময় তা সাফল্যলাভ করে কিনা এ নিয়ে বিতর্কের যথেষ্ট অবকাশ আছে। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, একটি বিষয়ের সংগে অন্য বিষয়ের মোটামুটি পরিচয় করিয়ে দিলে শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহের সৃষ্টি হয়। এজন্য শিক্ষককে জ্ঞানের সকল শাখা সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। তাহলে শিশুর বহুমুখী কৌতূহলকে তিনি নিবৃত্ত করতে পারেন।

শিক্ষাদান কার্যে শিক্ষকের প্রচুর দক্ষতা থাকা উচিত। বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শিক্ষকের পাণ্ডিত্য বা নিজের অধীত জ্ঞানের ওপর দখলই শিক্ষকের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। প্রতিভাবান হলেই শিক্ষক হওয়া যায় না, শিক্ষাদান এবং শিশু-মনস্তত্ত্ব (Child Psychology) সম্বন্ধে শিক্ষকের ব্যবহারিক দক্ষতা (practical efficiency) থাকা প্রয়োজন। শিক্ষকতা বা শিক্ষাদান এ অর্থে একটি প্রয়োগশাস্ত্র (Art)। আধুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান শিক্ষাপদ্ধতি এবং শিক্ষাদানের মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলি সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য আবিষ্কার করেছে। সুতরাং শিক্ষক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান (Educational Psychology) সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করবেন। তাছাড়া, বিদ্যালয়ের ছাত্রদলের সামনে শিক্ষককে

উপস্থিত হতে হয়। শিক্ষার মাধ্যমে এদের মধ্যে সামাজিক আচরণ প্রবর্তন এবং বিদ্যালয়ে সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করাও সার্থক শিক্ষাদানের একটি পূর্ব শর্ত। এজন্য যৌথ-মনোবিজ্ঞান (Group Psychology) সম্বন্ধেও শিক্ষকের জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়।

(গ) শিক্ষকের আচরণমূলক গুণ (Qualities related to the behaviour of teacher): বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রচুর বিদ্যাবত্তা এবং গুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষক সুশিক্ষক হতে পারলেন না বা শিক্ষাদান কার্যে তাঁকে ব্যর্থ হতে হয়েছে। এসব ঘটনা আলোচনা করলে দেখা যায় কতকগুলি আচরণমূলক গুণের অভাবহেতু শিক্ষক শিক্ষকতায় সাফল্য লাভ করতে পারেননি। শিক্ষকের আচরণে শিক্ষার্থীর প্রতি গভীর দরদ, সহানুভূতি এবং পক্ষপাতহীন মন থাকা প্রয়োজন। কোন সময়েই যেন শিক্ষকের আচরণ রূঢ় এবং অপ্রিয় না হয়।

শিক্ষকের আচরণে, পরিচ্ছন্ন পোশাক-পরিচ্ছদে, কথাবার্তায়, তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকবে। তিনি শিশুদরদী, সংবেদনশীল। তিনি শিক্ষার্থীর সমস্যা, অসুবিধা প্রভৃতিকে গভীর সহানুভূতির সংগে বিবেচনা করবেন এবং তিনি যে তার একান্ত আপনজন, পরম শুভাকাঙ্ক্ষী এ পরিচয় দেবেন।

শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীকে ভালবাসতে চান তবে তাঁর শিক্ষকতা-বৃত্তিকেও ভালবাসতে হবে। শিক্ষাদানের প্রতি অনুরাগ না থাকলে সুশিক্ষক হওয়া যায় না। নিছক প্রয়োজনের খাতিরে যাঁরা শিক্ষকতা গ্রহণ করেন বা বেকারদশা থেকে মুক্তি পাবার জন্য শিক্ষকতা করেন, তাঁরা এ কাজে ব্যর্থ হবেন। কেননা এতে তাঁদের আগ্রহ নেই, তাই কোন আনন্দ নেই। প্রকৃত শিক্ষক শিক্ষালাভের জন্য শিক্ষকতা-বৃত্তি গ্রহণ করেন, শিশুর সংগে তিনিও শিক্ষার্থী, তাই শিক্ষকতা তাঁর কাছে আনন্দময় ব্যাপার।[1]

(ঘ) শিক্ষকের মানসিক স্বাস্থ্য (Mental health of a teacher): আমরা শিক্ষকের ব্যক্তিগত এবং আচরণমূলক গুণাবলী উল্লেখ করলে দেখতে পাই, শিক্ষক একটি সুসমন্বিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবেন। শিক্ষকের ধৈর্য,

1. 'Education to those who give their lives to it is a joyous adventure just because the teacher is ever a learner.

সহনশীলতা, সহজ, সরল ও ভদ্র আচরণ, শিশুর প্রতি বিবেচনাবোধ, সহানুভূতি সম্পন্ন ও পক্ষপাতহীন মন প্রভৃতি থাকা উচিত। তাঁর আচরণে ও চিন্তায় একটি সুসংহত এবং সুসমন্বিত রূপ থাকবে। তার প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ বা আবেগের মধ্যে একটি নিগূঢ় সমন্বয় থাকবে। এ সমস্ত গুণাবলীকে এক কথায় শিক্ষকের মানসিক সুস্থতা বলে অভিহিত করা যেতে পারে। মানসিক স্বাস্থ্য বলতে আমরা মানসিক ভারসাম্য (equilibrium) এবং প্রক্ষোভমূলক সুস্থিতি (stability) বুঝি। ব্যক্তি তার শৈশব থেকে শুরু করে জীবনভর বহুবিধ বিবদমান প্রবণতা, প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভজনিত তাড়না, পরস্পর বিরোধী প্রেরণার সম্মুখীন হয়। কিন্তু ব্যক্তি যখন তার প্রবণতা, প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ ও প্রেরণার মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বিধান করে, ভারসাম্য সৃষ্টি করে, একটি সংহতি ও সংগঠন সৃষ্টি করে, তখন সে মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। বলাবাহুল্য, মানসিক স্বাস্থ্য, কোন স্থির বস্তু নয়, জীবনভর আমরা মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হবার চেষ্টা করি। ব্যাপক অর্থে, সুসমন্বিত ব্যক্তিত্ব ও মানসিক স্বাস্থ্য সমার্থক।

শিক্ষকের পক্ষে মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া অপরিহার্য গুণ। কারণ তাঁর আচরণের প্রভাব শিক্ষার্থীর উপর প্রতিফলিত হয়। বিদ্যালয় পরিবেশকে শিক্ষক শিক্ষার উদ্দেশ্যে নিপুণভাবে ব্যবহার (manipulate) করেন। যে শিক্ষক নিজে অন্তর্দ্বন্দ্বে বিক্ষিপ্ত, বদমেজাজী, খেয়ালী ; শিক্ষার্থীর উপর তার প্রভাব যে প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যে শিক্ষক হতাশা, হীনমন্যতাবোধ, মানসিক দুশ্চিন্তা, স্নায়বিক দুর্বলতা প্রভৃতির দ্বারা আক্রান্ত তারপক্ষে মানসিক স্থৈর্য, সহানুভূতি সম্পন্ন আচরণ করা সম্ভব নয়। কারণ, এর ফলে তাঁর মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। কখন যে তিনি রাগী, কখন হাস্যরসিক, কখন কি করেন বলা মুশকিল। কখন অল্পেতে চটেন, কখনও বড় ধরনের নোংরামি সহ্য করেন। তার মানসিক ও প্রক্ষোভমূলক সুস্থিতির অভাবের ফলে তিনি ছাত্রদের কাছে অশ্রদ্ধার পাত্র ও উপহাসের বস্তু হয়ে পড়েন।

সুতরাং শিক্ষককে তার দৈহিক মানসিক আচরণের মধ্যে একটি গতিশীল সুস্থিতি আনয়ন করতে হবে। তা না হলে শিক্ষার সকল আয়োজন ব্যর্থ হবে।

৪। প্রধান শিক্ষকের কার্যাবলী (Function of a Headmaster) :

প্রধান শিক্ষকের উপর বিদ্যালয়ের পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। সুতরাং একদিকে তাঁকে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের সংগে সংযোগ রাখতে হয়, অন্যদিকে বিদ্যালয় পরিচালনার গুরু কর্তব্য সম্পন্ন করতে হয়। কিন্তু প্রধান শিক্ষকও মূলতঃ শিক্ষক। এজন্য একজন সহকারী শিক্ষকের যা কর্তব্য তাও তাঁকে পালন করতে হয়। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা নিয়ে প্রধান শিক্ষকের কয়েকটি কার্যাবলী বিবৃত করছি।

(ক) শিক্ষক হিসেবে প্রধান শিক্ষকের কর্তব্য (Duties of a Headmaster as a Teacher) : প্রধান শিক্ষক মূলতঃ শিক্ষক। সুতরাং শিক্ষার্থীদের সংগে তাঁর সহজ ও প্রীতিময় সম্পর্ক স্থাপন করা চাই। প্রধান শিক্ষকের সকল দায়িত্ব পালনের মূলে রয়েছে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ গঠন। সুতরাং তাঁর সকল কর্ম শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়। অবশ্য এ ব্যাপারে আনুসংগিক অনেক কিছুই প্রধান শিক্ষককে করতে হয় বটে কিন্তু সবই শিক্ষার্থীকে সহায়তা করার এবং শিক্ষাদান কাজ সার্থক করে তোলার জন্য।

এজন্য প্রধান শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য হল তিনি সকল ছাত্রের সংগে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করবেন। পদমর্যাদায় দাম্ভিক হয়ে তিনি শিক্ষণ কাজকে তাঁর সময়ের অপব্যবহার বলে মনে করবেন না। শিক্ষণের মাধ্যমেই অপরিচিত জ্ঞানপিপাসু মানব সন্তানদের সংগে শিক্ষক তাঁর অন্তরের যোগ সাধন করতে পারেন। বিদ্যালয় পরিচালনার কাজে যদি তিনি সদাব্যস্ত থাকেন এবং ছাত্রদের কাছ থেকে যদি দূরে বিরাজ করেন তবে তিনি শুধু শাসক (Administrator), শিক্ষক নন। শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে যে সমাজ সৃষ্টি করে তার প্রধান নাগরিক হলেন প্রধান শিক্ষক। সুতরাং বিদ্যালয়ে ছাত্রদের কাছে নিজের স্বতন্ত্র সত্ত্বা নিয়ে প্রধান শিক্ষক দূরে সরে থাকতে পারেন না। তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষার্থীদের সংগে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হয়।

(খ) বিদ্যালয়ের পরিচালক হিসেবে প্রধান শিক্ষকের কর্তব্য (Duties of a Headmaster as an administrator of a School) : বিদ্যালয় পরিচালনার কঠিন এবং দায়িত্বশীল কাজ প্রধান শিক্ষকের উপর ন্যস্ত। এজন্য তাঁর প্রচুর অভিজ্ঞতা, গঠন ক্ষমতা এবং পরিচালনা ক্ষমতা থাকা চাই।

শিক্ষক নিয়োগ, পরীক্ষা গ্রহণ, বিদ্যালয়ের যাবতীয় কর্ম, অর্থনৈতিক ব্যাপার প্রভৃতি সব কিছু সমস্যার সমাধান প্রধান শিক্ষককেই করতে হয়। প্রধান শিক্ষকের উপরেই বিদ্যালয়ের শৃংখলা, নিয়মানুবর্তিতা, শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক ঐক্য সৃষ্টি করার দায়িত্ব ন্যস্ত। তাছাড়া, শিক্ষকদেরও নানা সমস্যা রয়েছে। এ সব প্রধান শিক্ষককেই সমাধান করতে হয়। তারপর বিদ্যালয়ের যারা কর্তৃপক্ষ সে সরকারই হোক বা পরিচালক সমিতি হোক, তার সংগে প্রধান শিক্ষককেই যোগাযোগ রাখতে হয়। সুতরাং বিদ্যালয়ের সকল কাজের দায়িত্ব পরোক্ষভাবে বা প্রত্যক্ষভাবে প্রধান শিক্ষকের। সকল ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য তাঁকেই কৈফিয়ত দিতে হয়।

কিন্তু এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শাসন ও পরিচালনায় ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক ছাত্রদের উপর প্রচুর দায়িত্ব অর্পণ করতে পারেন। ছাত্রদের মধ্যে শৃংখলা বজায় রাখা, ছাত্রাবাস পরিচালনা করা, খেলাধূলা বা অন্যান্য সম্মিলিত কাজ সম্পন্ন করা, বিদ্যালয় পরিষ্কার রাখা এবং অন্যান্য নানাবিধ সমস্যা নিরসনের দায়িত্ব প্রধান শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উপর ছেড়ে দিতে পারেন। এতে তাঁর কাজেরই শুধু লাঘব হবে না, বিদ্যালয় হয়ে উঠবে বৃহত্তর সমাজের প্রতিচ্ছবি এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হয়ে উঠবে আরও দৃঢ়।

(গ) সমন্বয় সাধক হিসেবে প্রধান শিক্ষকের কর্তব্য (Duties of a Headmaster as a harmonizer): প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের মধ্যে বিভিন্ন ভাবে সমন্বয় সাধন করেন। বিদ্যালয় শুধু শিক্ষার্থীদের সমবেত উপস্থিতির স্থল নয়—শিক্ষার্থী, শিক্ষক, বিদ্যালয়-পরিচালকবর্গ আর শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের বিভিন্ন চাহিদা এবং স্বার্থের মিলন স্থল। সুতরাং এদের মধ্যে সার্থক সমন্বয় সাধন না করলে বিদ্যালয়ে যে শুধু শিক্ষাদান অসম্ভব হয়ে পড়বে তা নয়, বিদ্যালয়ের কোন অস্তিত্বই থাকবে না। প্রধান শিক্ষকই এদের বিচ্ছিন্ন প্রভাবের মধ্যে ঐক্য আনেন। এজন্য তিনি বিদ্যালয়ের প্রাণ ও কর্ণধার। তাঁকে কেন্দ্র করেই বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলি একমুখী হয় এবং শিক্ষার প্রবাহকে বাঁচিয়ে রাখে।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাতে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সম্পর্ক যাতে শিক্ষার অনুকূল হয়, বিদ্যালয়ের কাজে যাতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী

এক সংগে, এক মনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে—প্রধান শিক্ষক তা সম্ভব করে তুলবেন।

অন্যদিকে প্রধান শিক্ষক শিক্ষকদের মধ্যে প্রীতি ও সহযোগিতার সম্পর্ক, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে সম্ভাব্য সকল সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করবেন। বিদ্যালয়ে যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা আসে তারা বিশেষ বিশেষ পরিবার থেকে আসে। সুতরাং এদের পরিবারের সংগে সংযোগ স্থাপন করাও সার্থক শিক্ষার একটি অংগ।

তারপর শিক্ষার্থী এবং বিদ্যালয়ের পরিচালক, শিক্ষক এবং বিদ্যালয়ের পরিচালক—এই দুই স্তরেও প্রধান শিক্ষক একটি সম্পর্ক বজায় রাখবেন। বিদ্যালয় পরিচালকদের সংগে যদি কোন সংঘাত এদের সৃষ্টি হয় তবে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। আসল কথা, সকল বিচ্ছিন্ন শক্তিই যে একই শিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রধাবিত, প্রধান শিক্ষকের সমন্বয়ী শক্তি তা সম্ভব করে।

এজন্য প্রধান শিক্ষককে ঘড়ির মূল স্প্রিং, যন্ত্রের মূল চাকা (fly wheel) অথবা জাহাজের এঞ্জিনের সংগে তুলনা করা হয়।[1]

৫। শিক্ষকতা অর্জিত, না সহজাত গুণ? (Is teacher born or made):

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষকের কাজ ও গুণাবলী আলোচনা করলে দেখা যায়, শিক্ষকতা কার্যে সাফল্য ও সার্থকতা লাভ করতে গেলে শিক্ষকের কার্য সম্পাদনের যথেষ্ট ব্যবহারিক জ্ঞান ও প্রস্তুতি থাকা চাই। আধুনিক শিক্ষায় কেবলমাত্র বিষয়বস্তুতে পাণ্ডিত্য ও দক্ষতা থাকলে শিক্ষক হওয়া যায় না। শিক্ষার্থীকে পুস্তক পড়ান বা ভাষাগত বিদ্যা বিতরণ করা, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করার মধ্যে আধুনিক শিক্ষকের কর্তব্য ও দায়িত্ব সীমাবদ্ধ নেই। শিক্ষককে শিশুর চাহিদা, গ্রহণ-ক্ষমতা প্রভৃতি বিচার করে নানা অভিজ্ঞতা সৃষ্টি ও সক্রিয়তার মাধ্যমে শিক্ষাদান করতে হয়। এজন্য আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা দান পদ্ধতি, শিশু মনোবিজ্ঞান প্রভৃতিতে শিক্ষকের যথেষ্ট দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। যে যুগে আমরা বাস করছি তা বিজ্ঞান ও যন্ত্র সভ্যতার যুগ। মানুষের জীবন ও সমাজ

1. 'What the main spring is to the watch, the fly wheel to the machine or the engine to the steamship, the headmaster is to the school.'

এ যুগে জটিল ও নানা কৃত্রিম পরিবেশে আবৃত। সুতরাং শিক্ষককে আজ শিক্ষাদান করেই ক্ষান্ত হতে হয় না, শিশুকে তার শিক্ষাগ্রহণ, ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও জীবিকা গ্রহণে সুপরিচালনা করাও শিক্ষকের কর্তব্য। এজন্য শিক্ষক পরিচালনার নিয়ম, সমাজের সমস্যা, দেশের চাহিদা আর অন্যদিকে শিশুর নানা সমস্যার সংগে পরিচিত হবেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সুশিক্ষক হওয়ার মূলে প্রচুর ব্যবহারিক জ্ঞান ও শিক্ষণ থাকা উচিত। আধুনিক শিক্ষককে শিক্ষাদানের বিশেষ দক্ষতা অর্জন করতে হয়।

কিন্তু অনেকে বলেন, শিক্ষকতার জন্য শিক্ষণের প্রয়োজন নেই—শিক্ষকতা জন্মগত গুণ। তার জন্য ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন অর্থহীন। উদাহরণ স্বরূপ তারা রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মাগান্ধী, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, জাকির হোসেন প্রভৃতির নাম উল্লেখ করেন। উপযুক্ত ব্যক্তিত্বই শিক্ষকের লক্ষণ, যার ব্যক্তিত্ব নেই তার পক্ষে শিক্ষকতার শিক্ষণ লাভ কোন কাজে লাগে না। অর্থাৎ শিক্ষক-শিক্ষণের দ্বারা শিক্ষক সৃষ্টি করা যায় না। এ প্রসংগে আমাদের অভিমত হল, এ ধরনের শিক্ষক সর্বদেশে সর্বকালে বিরল। আধুনিক সমাজে জন্মগত শিক্ষকের অনুসন্ধানের দ্বারা শিক্ষক সমস্যার সমাধান করা যাবে না। তাছাড়া উল্লিখিত পুণ্যশ্লোক ব্যক্তির শিক্ষকতা শিক্ষণ-নিরপেক্ষ নয়। তাদের আপন প্রতিভার দ্বারা বহু বিষয় তারা বিদ্যালয় নিরপেক্ষভাবে শিক্ষা করেছেন। তবে একথা ঠিক শিক্ষকতার প্রতি প্রবণতা জন্মগত হতে পারে, কিন্তু এ প্রবণতা স্থায়ী ও সার্থক রূপ পাবে শিক্ষণের দ্বারা। আধুনিক জটিল সমাজে শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান ও পরিচালনা করার জন্য শিক্ষকের বহু বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। সুতরাং শিক্ষকতা অর্জিত না জন্মগত গুণ এ দ্বন্দ্ব নিরর্থক।

প্রশ্নাবলী

1. Write an essay on—Relation between the teacher and the taught.

2. What are the functions of a teacher? Why is he considered the most important in the educational system?

3. Describe the marks of a good teacher.

4. What according to you, are the essential qualifications of a teacher? In this connection discuss the statement 'The function of a teacher is somewhat like that of a gardener.'

5. 'The teacher should not merely be the fountain of facts on the walking Encyclopaedia but the guide, philospher and friend to the young.' —Discuss.

6. What the main spring is to the watch, the fly wheel to the machine, or the engine to the steamship, the headmaster is to the school.—Discuss.

চতুর্দশ অধ্যায়

পুরস্কার ও শাস্তি

(Reward and Punishment)

আলো-ছায়ার সম্পর্কের মত শিক্ষাদানের সংগে পুরস্কার ও শাস্তির প্রথা সুপ্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতিতে শাস্তি ও পুরস্কারকে সার্থক শিক্ষাদানের একটি অংগ মনে করা হত। শিক্ষার্থীকে অনভিপ্রেত আচরণ থেকে বিরত করা এবং তার মনে শিক্ষায় আগ্রহ সৃষ্টি করা শাস্তিদানের উদ্দেশ্য। আর শিক্ষার্থীকে অভিপ্রেত আচরণে উৎসাহী করা, তার মনে প্রতিযোগিতার প্রেরণা জাগিয়ে তোলা, তাকে আনুগত্য ও শৃংখলা মেনে চলতে সাহায্য করা প্রভৃতি উদ্দেশ্য সাধনে পুরস্কার প্রথার প্রবর্তন হয়েছিল। শিক্ষাব্যবস্থার বিবর্তনের সংগে সংগে শাস্তি ও পুরস্কার প্রথার অনেক পরিবর্তন আজ হয়েছে, কিন্তু এ দুই প্রথা কোন না কোন ভাবে শিক্ষাব্যবস্থার সংগে জড়িয়ে আছে। আমরা নিম্নে পুরস্কার ও শাস্তির প্রথা সম্বন্ধে আলোচনা করছি।

১। পুরস্কার (Reward) :

শিক্ষা আমাদের অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন, আমাদের আচরণের পরিবর্তন। কিন্তু সে আচরণের পরিবর্তন যেন বাঞ্ছিত হয়, ব্যক্তি ও সমাজের মংগলাদর্শে নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক শিশুকে কতকগুলি আচরণে অভ্যস্ত করতে চান। শিশু পাঠে অমনোযোগী হলে বা শৃংখলা ভংগ করলে তাকে পুরস্কারের দ্বারা উদ্‌বোধিত করা যায়, পুরস্কারের দ্বারা তার মনে আগ্রহ সৃষ্টি করা যায় এবং অভিপ্রেত উদ্দেশ্যে শিশুকে পরিচালিত করা যায়। অর্থাৎ পুরস্কার একটি কৃত্রিম উদ্‌বোধক (artificial incentive)। যেখানে আগ্রহের অভাব, সেখানে এই কৃত্রিম প্রচেষ্টার দ্বারা আগ্রহের সৃষ্টি করা হবে।

পুরস্কার প্রথাকে সমর্থন করে অনেকে শিক্ষণ সম্বন্ধে থর্নডাইক্ প্রবর্তিত নীতির (Thorndike's Laws of Learning) উল্লেখ করে থাকেন।

থর্নডাইক্ বলেন প্রাণীমাত্রই প্রীতিপদ কাজগুলি বার বার করে এবং এই কাজগুলি তার মনে গভীর রেখাপাত করে (Stamped in)। সুতরাং মানুষের বেলাও এর ব্যতিক্রম নেই। শিক্ষার্থীকে অভিপ্রেত আচরণে পুরস্কারের দ্বারা উৎসাহিত করলে তার মনে তৃপ্তির সঞ্চার হয়।

মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে পুরস্কারকে সমর্থন করে আরও একটি যুক্তি দেখান হয়েছে। যে আচরণ এবং কাজের জন্য শিক্ষার্থীকে পুরস্কার দেওয়া হল, শিক্ষার্থী যে শুধু বার বার ঐ একই কাজ অনুশীলন করবে তা নয়। তার মনে যে প্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়, উহা সমগ্র শিক্ষা পরিস্থিতির অন্যান্য বিষয়ে প্রতিবর্তিত (conditioned) হয়ে যায়। যে শিক্ষক পুরস্কার দিলেন, যে বিষয় বা কাজে সাফল্যের জন্য শিক্ষার্থী পুরস্কার লাভ করল, সেই শিক্ষক, সেই বিষয় বা কাজের প্রতি এবং আনুষংগিক অন্যান্য কাজ বা বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীর একটি প্রীতিকর মনোভাব গড়ে ওঠে। ফলে শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহের সৃষ্টি হয় এবং এই আগ্রহ শিক্ষাদানকে সুগম করে।

পুরস্কারকে সাধারণতঃ আমরা দু' শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি—অর্থাৎ কোন বস্তু বা উপহারের দ্বারা শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ বা প্রীতি সৃষ্টি করা বা মানসিক স্তরে বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে আগ্রহ বা সন্তোষজনক মনোভাব জাগ্রত করা। এজন্য পুরস্কারকে বস্তুগত ও মানসিক— এ দু' শ্রেণীতে ভাগ করছি।

(ক) বস্তুগত পুরস্কার (Material Reward): শিক্ষার্থীকে নানা উপহারের সামগ্রী অর্থাৎ বই, খেলনা প্রভৃতি এবং সাফল্যের প্রতীক হিসেবে পদক, অভিজ্ঞানপত্র (certificate) প্রভৃতি বস্তুগত পুরস্কার প্রদান করা যেতে পারে। অনেক সময় অর্থও পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয়, সে অর্থদান নগদ টাকা দিয়ে বা মাইনে দেওয়া থেকে পূর্ণ বা আংশিক রেহাই বা বৃত্তি প্রদানও (Scholarships)[1] হতে পারে।

1. রেমণ্ট (Raymont) বৃত্তিদান প্রথাকে পুরস্কার বলেন না, তার কারণ উহা কৃতকর্মের জন্য নয়, ভবিষ্যতের একটি ব্যবস্থা এবং সম্প্রদায়গত স্বার্থ তার লক্ষ্য। 'It should be added that scholerships differ essentially from prizes. They are not so much a reward for what has been done, as a provision of the means whereby further progress may be affected, this provision being made in the tnterests of the community rather than of the individual.'

(খ) মানসিক পুরস্কার (Mental Reward): ছাত্রের ডায়রীতে সুমন্তব্য করা, প্রশংসা করা, সম্মানজক তালিকায় নাম উল্লেখ, প্রকাশ্যে শিক্ষার্থীর নান উল্লেখ করে তার সাফল্যকে অভিনন্দন করা, তার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া ইত্যাদি মানসিক পুরস্কারের পর্যায়ে পড়ে।

২। বিদ্যালয়ে পুরস্কার প্রথার উপকারিতা ও অপকারিতা (Advantages and disadvantages of Reward):

বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শিক্ষকই হচ্ছেন শিশুর অভিভাবক। সুতরাং শিশুকে শুধু শিক্ষাদানই শিক্ষকের কর্তব্য নয়। মাতাপিতার মত (*in loco parentis*) শিশুর আচরণকে সংযত করার দায়িত্বও শিক্ষকের। সুতরাং শিক্ষার্থীর ওপর একটি নৈতিক কর্তৃত্ব (moral authority) রয়েছে শিক্ষকের। এই কর্তৃত্বের পরিধি নির্ভর করে রাষ্ট্রের আইন এবং সামাজিক প্রথার ওপর। আর দেশে দেশে এই কর্তৃত্বের পার্থক্যও রয়েছে। কিন্তু শিক্ষার্থীর পিতামাতার মত শিক্ষার্থীর উপর শিক্ষকেরও যে কিছুটা কর্তৃত্ব আছে তার স্বীকৃতি সর্বত্র পাওয়া যায় এবং শিক্ষা-প্রক্রিয়ার মধ্যে ইহা একটি কার্যকরী উপকরণ (potent factor)। শিক্ষার্থীর উপর এ অধিকার থেকেই শাস্তি ও পুরস্কার প্রথার প্রবর্তন।

পুরস্কারের উপকারিতা (Advantages of Reward): প্রথমতঃ, থর্নডাইক তার পরীক্ষণের দ্বারা প্রমাণিত করেছেন যে মানুষের শিক্ষণের ক্ষেত্রে পুরস্কার উদ্‌বোধক (incentive) হিসেবে কাজ করে। শিক্ষণের বিষয়বস্তুর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে পুরস্কার প্রচুর সহায়তা করে। দ্বিতীয়তঃ, শাস্তিদানের অনেক কুফল থেকে পুরস্কার প্রথা মুক্ত। উহা শিশুর মনে কোন ঘৃণা, গ্লানি, ভীতি বা বিরাগ সৃষ্টি করে না। তৃতীয়তঃ, পুরস্কার শুধু শিক্ষার্থীর অভিপ্রেত আচরণে সাফল্যের সূচক নয়, উহা দ্বারা শিক্ষাদান কার্যও সহজ এবং সার্থক হয়। যে শিক্ষক পুরস্কার দিলেন বা যে কাজে শিশু পুরস্কার লাভ করল তার প্রতি এবং অন্যান্য আনুষংগিক বিষয় বা কাজের প্রতি শিশুর প্রীতিকর মনোভাব প্রতিবর্তিত হয়ে (conditioned) যায়। ফলে সন্তুষ্টচিত্তে শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করে এবং বিদ্যালয়ের সমগ্র পরিস্থিতির প্রতি অনুরক্ত হয়। চতুর্থতঃ, পুরস্কার শিক্ষার্থীর মনে প্রতিযোগিতার মনোভাব জাগিয়ে তোলে। এতে সে অধিক সক্রিয় হয় এবং অভীষ্ট কাজে সাফল্য অর্জন করার জন্য অধ্যবসায়ী হয়। পঞ্চমতঃ,

বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার সভার আয়োজনের একটি সামাজিক দিক আছে। এই অনুষ্ঠানে শিক্ষার সংগে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি—শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং বিদ্যালয় পরিচালকবর্গ উপস্থিত হয়ে একই সাধারণ ক্ষেত্রে সমবেত হয়। ফলে বিদ্যালয়ের সামাজিক ঐক্য বৃদ্ধি পায়।

পুরস্কারের অপকারিতা (Disadvantages of Reward) : প্রথমতঃ, পুরস্কার প্রথার অপকারিতারও সীমা নেই। পুরস্কার হল একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের উপায় (means)। কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায়, শিক্ষার্থী অভিপ্রেত কাজ সাধনের চাইতে পুরস্কারের প্রতি বেশী আকৃষ্ট হয়। এতে সে লোভী হয়ে যায় এবং অনেক সময় সাফল্য অর্জনের জন্য ছলনার আশ্রয় নেয়। দ্বিতীয়তঃ, পুরস্কার শিক্ষার্থীর মধ্যে যে প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করে তা অনেক সময়ই অবাঞ্ছিত, অসামাজিক এবং অস্বাস্থ্যকর মানসিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। ক্রপট্‌কিন (*Kropotkin*) মানুষের জীবন ও সমাজ ব্যবস্থা থেকে প্রতিযোগিতার মনোভাব দূর করতে চেয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, প্রতিযোগিতা মানুষের জীবনের ধর্ম নয়। আমাদের স্নায়ুতন্ত্রে বা রক্ত প্রবাহে আমরা সহযোগিতাই দেখি। প্রতিযোগিতা জৈবিক নিয়ম নয়। তাঁকেই অনুসরণ করে বার্ট্রাণ্ড রাসেল (*Bertrand Russell*) আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে সকল প্রকার প্রতিযোগিতা অপসারিত করতে চেয়েছেন। তিনি বলেন, প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতার স্থান থাকবে। যে শিক্ষার্থী পুরস্কার পেল সে হয় অহংকারী, আর যে পেল না তার মধ্যে আসে ব্যর্থতা এবং পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর প্রতি হিংসা। এমন কি তার ব্যর্থতার জন্য সে শিক্ষকের বিচারবোধ বা শিক্ষা-ব্যবস্থাকেও দায়ী করে। তৃতীয়তঃ, আর্থিক পুরস্কারের মারাত্মক কুফল রয়েছে। উহা শিশুর মনে লাভ-লোকসানের মনোভাব জাগিয়ে তোলে, অর্থের প্রতি আসক্তি সৃষ্টি করে এবং শিক্ষা গ্রহণকে ব্যর্থ করে তুলতে পারে। এ ধরনের পুরস্কার (বিশেষভাবে নগদ অর্থদান) আজকাল পরিত্যক্ত হয়েছে।

৩। পুরস্কার প্রথার কার্যকারিতার কয়েকটি শর্ত (Some Conditions of effectiveness of Reward) :

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পুরস্কার প্রথার কি কোন কার্যকারিতা নেই? উহা কি সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য? এ সম্বন্ধে রেমণ্ট কতকগুলি শর্তের (Conditions of

effectiveness) উল্লেখ করেছেন। তাঁকে অনুসরণ করেই প্রধান প্রধান শর্তগুলি আমরা আলোচনা করছি। প্রথমতঃ, রেমণ্ট বলেন, কোন সার্থক পুরস্কার প্রথার প্রধান নীতি (Cardinal Principle) হল শিক্ষার্থীর বিশেষ ক্ষেত্রে কোন সাময়িক সদ্ আচরণ পুরস্কারের লক্ষ্য নয়, তার লক্ষ্য হবে শিশুর চরিত্রে চিরন্তন প্রভাব সৃষ্টিকারী আচরণসমূহ। এ জন্য ঘন ঘন পুরস্কার দিতে নেই এবং উহার উদ্দেশ্য শুধু বিশেষ কোন আচরণে সীমাবদ্ধ নয়, শিক্ষার্থীর সমগ্র শিক্ষাই উহার লক্ষ্য। যে আচরণ বা কাজ শিশুর চারিত্রিক বা শিক্ষাগত দিকটিকে পরিস্ফুট করে সে সব গুরুত্বপূর্ণ সার্থক আচরণের জন্যই পুরস্কার প্রদান করা উচিত। দ্বিতীয়তঃ, আমরা যদি পুরস্কারের দ্বারা শিশু-মনে কোন নীচ বা অসামাজিক মনোভাব সৃষ্টি করতে না চাই বা পুরস্কারকে শিশু-মনের নীচ প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত করতে চাই তবে আমাদের লক্ষ্য হবে শিশু যেন পুরস্কারের প্রতি আকৃষ্ট না হয়। অর্থাৎ প্রচুর প্রচেষ্টা এবং অধ্যবসায়ের পর যদি অপ্রত্যাশিতভাবে শিশুকে উপহার দেওয়া হয় তবে তার শিক্ষামূলক কার্যকারিতা বেড়ে যাবে। তৃতীয়তঃ, পুরস্কার প্রথাকে বিদ্যালয়ের সাধারণ নিয়ম-কানুনের (minor morals) মধ্যেই সীমিত রাখা উচিত। শিশুর মনে সময়ানুবর্তিতা, ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পরিশ্রম এবং নিজের জিনিসপত্রকে সযত্নে রক্ষণ প্রভৃতি অভ্যাস বা নীতি জাগ্রত করার মধ্যে কোন ক্ষতিকর কিছুই নেই। তাকে মিথ্যা বলার জন্য শাস্তি দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু সত্য বলার জন্য তাকে পুরস্কার দিতে হবে না। কিন্তু বিদ্যালয়ে কখনও পুরস্কার প্রথাকে উচ্চতর নৈতিক বিষয়ের সংগে যুক্ত করতে নেই। চতুর্থতঃ, পুরস্কার বুদ্ধিগত ক্ষমতার জন্য শিক্ষার্থীকে প্রদান করার মধ্যে অনেক সময় মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। যে কোন দুটি শিক্ষার্থীর মধ্যে যদি বুদ্ধিগত পার্থক্য প্রচুর থাকে এবং প্রথমটির যদি বেশী বুদ্ধিগত ক্ষমতা থাকে, তবে সমানভাবে চেষ্টা করার ফলেও হয়ত দ্বিতীয় শিক্ষার্থীটি প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করবে না। তখন প্রথমটিকে পুরস্কার দেওয়ার অর্থ, দ্বিতীয়টিকে জীবনের কদর্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

৪। শাস্তিদান (Punishment) :

পুরস্কারের মত শাস্তিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—যে শাস্তির দ্বারা শিশুর দেহকে পীড়ন করে শিক্ষক কোন উদ্দেশ্য সাধন করেন তাকে দৈহিক শাস্তি

বলে। আর যে শাস্তির দ্বারা শিশুর মনে কষ্টের বা যাতনার সৃষ্টি করে শিক্ষক কোন উদ্দেশ্য সাধন করেন তাকে মানসিক শাস্তি বলে।

(ক) দৈহিক শাস্তি (Corporal Punishment) : দৈহিক শাস্তির মধ্যে শিক্ষার্থী অপমান ও লজ্জা অনুভব করে এবং সেই সংগে দৈহিক কষ্ট ও যাতনা লাভ করে। দৈহিক শাস্তির কোন তালিকা প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। মোটামুটিভাবে প্রচলিত দৈহিক শাস্তির উল্লেখ করা গেল। শিশুকে তার অপরাধের জন্য ছাত্রদের মাঝখান থেকে সরিয়ে নিয়ে, গৃহের কোণে বসিয়ে বা দাঁড় করিয়ে রাখা, নিম্ন শ্রেণীর শিশুদের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখা অথবা বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে রাখা, বিদ্যালয়ের ছুটির পর কিছু কাজ দিয়ে বা কোন কাজ না দিয়ে আটক রাখা ; কানমলা, বেত মারা ইত্যাদি। শাস্তির আরও কঠিন রূপ প্রচলিত ছিল, যেমন—রোদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকা, ইঁট হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কত কি ?

(খ) মানসিক শাস্তি (Mental Punishment) : মানসিক শাস্তির কোন বিস্তারিত তালিকা প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, শিক্ষার্থীর ডায়রীতে খারাপ মন্তব্য লেখা, শিক্ষার্থীর নম্বর (morals) কাটা বা শাস্তিমূলক নম্বর দেওয়া, জরিমানা করা, ভৎ´সনা করা, শ্রেণীতে সকলের সম্মুখে নিন্দা করা ইত্যাদি।

৫। শাস্তিদানের যাথার্থ্য (Appropriateness of Punishment) :

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, শাস্তিদান যথাযথ হয়েছে কিনা তা কিভাবে জানা যায় ? এ সম্বন্ধে প্রথমেই রুশোর শাস্তি সম্বন্ধে মতবাদটি আলোচনা করা দরকার। রুশো শিক্ষার্থীকে কৃত্রিমভাবে শাস্তি দেওয়ার বিরোধী। মানুষের শাস্তি যথাযথ হতে পারে না এবং শিশুর স্বাধীন বিকাশকে উহা অপহত করে। শিশু যদি জলে ভিজতে থাকে তবে তাকে কোন বাধা দেওয়া হবে না বা শাস্তিও দিতে হবে না। সে যখন অসুস্থ হয়ে গৃহে বন্দী থাকবে তখন প্রকৃতির দেওয়া শাস্তিই সে উপভোগ করবে। অর্থাৎ শিশুর মন্দ কাজের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া

হিসেবেই শাস্তি আসবে প্রকৃতির কাছ থেকে।[1] পরবর্তী স্তরে স্পেন্সার (*Spencer*) রুশোর এ ব্যাখ্যাকে তাঁর *Moral Education* প্রবন্ধে বিস্তারিত রূপ প্রদান করেন। স্পেন্সার বলেন, প্রকৃতির শিক্ষার (Nature's lesson) বৈশিষ্ট্যই হল এই যে, উহা সৎ কাজের সংগে সুখ এবং মন্দ কাজের সংগে দুঃখকে সংযুক্ত করে দেয়।

কিন্তু এ ধরনের শাস্তির ব্যাখ্যা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। শিশুকে প্রকৃতির অন্ধগতির উপর ছেড়ে দেওয়া শিক্ষকের কখনই উচিত নয়। যে শিশু জলে ভিজে জ্বরে পড়ল, তাকে আমরা কোন বাধা দিলাম না, কিন্তু এখানে তার প্রাণ সংশয়ের প্রশ্নও আছে। এতে লঘুপাপে গুরুদণ্ড হল। তাছাড়া, প্রকৃতির কাছে অপরাধ করলে কখন কিভাবে শাস্তি আসবে তা কেউ জানে না। শিশুর শিক্ষা হওয়া দূরের কথা বয়স্করাও নিয়ম লংঘন এবং তার শাস্তির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করতে পারে না। সামাজিক নিয়মভংগ করলে প্রকৃতি কিভাবে শাস্তি দেবে এ ব্যাখ্যা বোধগম্য নয়।

শাস্তির যাথার্থ্য সম্বন্ধে বেন্থাম (*Bentham*) কতকগুলি মূলসূত্রের উল্লেখ করেছেন। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এই নীতিগুলি বিদ্যালয় পরিচালনায়ও শিক্ষক গ্রহণ করতে পারেন। এ সূত্রগুলি বেন্থামের শাস্তিদানের মূলসূত্র (Bentham's canons of punishment) বলে খ্যাত। (১) বেন্থামের প্রথম সূত্র হল শাস্তি সব সময় অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী যথাযথ (proportionate) এবং নিখুঁত হবে। এ প্রসংগে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, একটি নির্ধারিত শাস্তি একটি নির্ধারিত অপরাধের জন্য দান করা উচিত নয়, অপরাধের পরিস্থিতি এবং অপরাধীর মানসিক অবস্থা বিবেচনা করে শাস্তি দিতে হবে। (২) বেন্থামের দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে শাস্তি বৈশিষ্ট্যমূলক (characteristical) হবে। কোন অপরাধের জন্য যদি শিক্ষার্থীকে গাধার টুপি পরিয়ে দেওয়া যায় তবে শাস্তির বৈশিষ্ট্যটি সবার মনে থাকবে এবং অপরাধমূলক কাজ থেকে তাদের বিরত করবে। (৩) বেন্থামের তৃতীয় সূত্র হল শাস্তি হবে উদাহরণ বা নমুনার (exemplary)

1. **'that punishment must never be inflicted on children as punishment, but that it ought always to come to them as the natural consequences of their bad acts.'**

যোগ্য। অর্থাৎ গুরুতর অপরাধের জন্য এমন শাস্তি দেওয়া উচিত যা সকলের নিকট একটা উদাহরণ হয়ে দাঁড়ায়। (৪) বেন্থামের চতুর্থ সূত্র হল শাস্তি হবে পরিমিত (economical)—যেন খুব হিসেব করে শাস্তি প্রয়োগ করা হয় যতটুকু না দিলে নয় ততটুকু শাস্তি দেওয়াই উচিত। লঘুপাপে গুরুদণ্ড দান আর এক অপরাধ। (৫) বেন্থামের পঞ্চম সূত্র হল, শাস্তি হবে সংশোধনকারী (corrective) অর্থাৎ শাস্তিদানের উদ্দেশ্য মানব প্রকৃতির নীচ প্রবৃত্তিকে দুর্বল করে দিয়ে মহৎ প্রবৃত্তিকে শক্তিশালী করা। কোন প্রতিহিংসার মনোভাব নিয়ে শাস্তি দেওয়া উচিত নয়। (৬) বেন্থামের ষষ্ঠ এবং সর্বশেষ সূত্র হল, শাস্তি হবে জনপ্রিয় (popular). অপরাধী ও তার সংগে সকলেই যেন বুঝতে পারে শাস্তিদান যথাযথ হয়েছে এবং তার পেছনে যুক্তি রয়েছে।

৬। শাস্তির উপকারিতা ও অপকারিতা (Advantages and Disadvansages of Punishment) :

শাস্তির উপকারিতা (Advantages of Punishment) : প্রথমতঃ, শাস্তিকে শিক্ষাদানের সময় পুরস্কারের মত একটি কৃত্রিম উদ্‌বোধক (artificial incentive) হিসেবে প্রয়োগ করা হয়। অতিরিক্ত চঞ্চল, পাঠে অমনোযোগী শিশুকে কিছুটা শাস্তির ভয় দেখিয়ে পাঠে মনোযোগী করে তোলা যায়। দ্বিতীয়তঃ, বিদ্যালয়ে শিশুকে কতকগুলি নির্দেশ (order) এবং শৃংখলা মেনে চলতে হয়। বিদ্যালয় একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। প্রতিটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সুপরিচালনার জন্য কতকগুলি নৈর্ব্যক্তিক (impersonal) নিয়ম থাকা চাই। আর সে প্রতিষ্ঠানের সভ্যরা (members) নির্দেশ (order) হিসেবে সেগুলি মেনে না চললে প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব থাকে না। অন্যদিকে ব্যক্তিকে তার আচরণেও শৃংখলা মেনে চলতে হয়। জনতা (mob) এবং সামাজিক সংঘ বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য হল, জনতার মধ্যে প্রতিষ্ঠানের মত কোন নির্দেশ মেনে চলার বাধ্যবাধকতা নেই, শৃংখলার কোন স্থান নেই। বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সুতরাং তার সভ্য হিসেবে শিক্ষার্থীরা নির্দেশ ও শৃংখলা (order and discipline) মেনে চলবে। এতে তারা অমনোযোগী হলে, শৃংখলা লংঘন করলে, বিদ্যালয়ে শিক্ষকের নির্দেশ ও আদেশ মেনে না চললে

সংশোধনকারী (corrective) শাস্তির প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ, শিক্ষার্থীর ওপর শিক্ষকের একটি নৈতিক দায়িত্ব এবং অধিকার আছে। শিক্ষার্থীর আচরণকে সুসংহত পথে পরিচালনা করাও তাঁর কর্তব্য। এ ব্যাপারে পিতামাতার ন্যায় বিদ্যালয়েও যদি কিছু শাস্তি প্রদান করা হয় তবে অনেক সময় সুফল হয়।

শাস্তির অপকারিতা (Disadvantages of Punishment) : প্রথমতঃ, শাস্তিকে থর্নডাইকের কার্যফল সম্বন্ধীয় নীতির (Law of Effect) ওপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। যে আচরণের শেষে থাকে বিরক্তিকর বা অপ্রীতিকর অবস্থা (discomforting or annoying state) তাকে প্রাণীমাত্রই পরিহার করে এবং উহার প্রভাব অবলুপ্ত (stamped out) হয়ে যায়। কিন্তু থর্নডাইকের এই তত্ত্বটি সকলেই সমর্থন করেননি। কারণ অনেক সময় মানুষ প্রচুর দুঃখ-দুর্দশাকেও বরণ করে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চায়। তাছাড়া, থর্নডাইক নিজেও শাস্তির উপকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, পুরস্কার কৃত্রিম উদ্‌বোধক হিসেবে কিছু কাজ করলেও শাস্তি শিক্ষণের ব্যাপারে বিশেষ ফলপ্রদ নয়। দ্বিতীয়তঃ, শাস্তি শিশুর মনে ভীতির সঞ্চার করে। ফলে অনেক সময় শাস্তির ভয় থেকে তার পলায়ন মনোবৃত্তি (escapism) জেগে ওঠে। বিদ্যালয় থেকে এবং গৃহ থেকে পালিয়ে গিয়ে শাস্তিকে সে এড়াতে চায়। তৃতীয়তঃ, শাস্তি শিক্ষার্থীর মনে নানা মিশ্র অনুভূতির (mixed feelings) সৃষ্টি করে। শিক্ষার্থীর মনে হীনমন্যতা (inferiority complex), আতংক প্রভৃতি দেখা দিতে পারে। ফলে জীবন সম্বন্ধে সে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। চতুর্থতঃ, শিশুকে যখন শাস্তি দেওয়া হয় তখন যে-অসংগত আচরণ বা নিয়ম লংঘনের জন্য তাকে শাস্তি পেতে হল, তার প্রতি শিশুর সময় সময় বিতৃষ্ণা জেগে ওঠে। পরে এই ঘৃণা শাস্তিদাতা শিক্ষক, পাঠ্যবিষয় বা বিদ্যালয়ের প্রতি নিবদ্ধ হয়। তখন শাস্তিদানের আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। পঞ্চমতঃ, দৈহিক শাস্তি খুবই মারাত্মক। উহার মধ্যে বর্বরোচিত মনোভাবই প্রকাশ পায়। শিশু ভাবে, যেহেতু গায়ের জোরে সে শিক্ষকের সংগে পেরে উঠবে না, অতএব তাকে শাস্তি মেনে নিতে হচ্ছে। ষষ্ঠতঃ, বিদ্যালয়ের নির্দেশ এবং শৃংখলা (order and discipline) মেনে চলার ব্যাপারে শাস্তি প্রয়োগ খুব সহায়ক বলে অনেকে মনে করে না। শাস্তির ভয়ে যে শৃংখলা শিশুরা মেনে চলে তার সংগে তার হৃদয়ের যোগ নেই, সুযোগ পেলেই সে তা লংঘন করবে। যে নির্দেশ সমাজধর্মী বা শিশুর স্বাভাবিক

বিকাশে সহায়ক নয়, সে নির্দেশ শিশুরা সহজে মেনে নেবে না। এজন্য শৃংখলা স্বতঃস্ফূর্ত হওয়া চাই। বিদ্যালয়ে সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করলে এবং বিদ্যালয়ে শিশুদের গণতন্ত্রসম্মত অধিকার দিলে তারা নিজেরাই নির্দেশ এবং শৃংখলা সমস্যার সমাধান করতে পারে। এজন্য শিক্ষক শাস্তিদানকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করবেন না।

উপসংহার ঃ আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বে পুরস্কার ও শাস্তিদান প্রথাকে বর্জন করার কথা বলা হয়েছে। মাদাম মণ্টেসরী তাঁর বিদ্যালয় থেকে এ দুটি প্রথাকেই নির্বাসিত করেন। ডিউই বলেন, বিদ্যালয়ের অসামাজিক পরিবেশই শাস্তি ও পুরস্কার প্রথাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। বিদ্যালয়ে আদর্শ-সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করলে, বিদ্যালয় পরিচালনায় শিশুদের গণতন্ত্রসম্মত অধিকার দিলে নির্দেশ, শৃংখলা, শিক্ষা সবই সার্থক হবে।

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে যে অগণিত শিক্ষকরা শিক্ষাদান কাজে ব্যাপৃত আছেন তাঁদের মধ্যে অনেকে বলেন নীতির দিক থেকে এই দুটি প্রথা খুব সমর্থনযোগ্য না হলেও সময় বিশেষে এগুলি বেশ সুফল দেয়। মানুষ অসম্পূর্ণ (imperfect) জীব, সুতরাং তার শিক্ষার আয়োজনে, বাস্তব প্রয়োজনে ত্রুটিপূর্ণ কিছু নিয়মও থাকবে, এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। শাস্তি ও পুরস্কার হল এ ধরনের একটি প্রয়োজনীয় কু-প্রথা (necessary evil)। মণ্টেসরী যিনি সকল শাস্তি ও পুরস্কার প্রথাকে তাঁর বিদ্যালয় থেকে নির্বাসন দিয়েছিলেন, তিনিও সময় বিশেষে শাস্তির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। অসংযত শিশুকে শ্রেণীর অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে দূরে গৃহের কোণে সরিয়ে নিয়ে খেলনা দিতে বলেছেন ; ইহা শাস্তির প্রকারভেদ মাত্র।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the merits and defects of reward and punishment as incentive to learning in school.

2. Distinguish between order and discipline. Discuss in this connection the place of punishment in maintenance of discipline.

3. Is there any justification for the institution of punishment and reward in a school ?

পুরস্কার ও শাস্তি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জন্য লেখকের "শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান" দ্রষ্টব্য।

পঞ্চদশ অধ্যায়

শিক্ষাদান ও পাঠটীকা

(Teaching and Lesson Notes)

শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে আমরা এর আগে আলোচনা করেছি। আধুনিক শিক্ষাদান ব্যক্তিমুখী (individualised) এবং শিক্ষাপদ্ধতিতে বস্তুভিত্তিক পাঠের (object lesson) প্রচলন বেশী। শিশুরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মূর্ত বস্তুর মাধ্যমে সহজে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। ফ্রয়েবেল এবং মন্টেসরী মূর্ত বস্তুর সাহায্যে শিক্ষাদান করেছেন এবং এ সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণালব্ধ তথ্য আমাদের উপহার দিয়েছেন। শিক্ষকের শিক্ষাদান যাতে বিজ্ঞানসম্মত বা তর্কশাস্ত্রসম্মত ভাবে সম্পন্ন হয়, এজন্য পাঠটীকা প্রস্তুতির প্রয়োজন। অল্প সময়ে বা শ্রেণীকক্ষে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শিক্ষার বস্তুকে যথাযথভাবে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করতে হয়। তাছাড়া, পাঠটীকা প্রস্তুত করলে শিক্ষকের বিষয়টি সম্বন্ধে একটি পূর্ব প্রস্তুতি হয়ে যায় এবং এলোমেলোভাবে বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত না করে তর্কশাস্ত্রসম্মত ভাবে আলোচনা করতে পারেন।

পাঠটীকা প্রস্তুতির জন্য শিক্ষকের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং বিষয়বস্তুর উপর পূর্ণ দখল থাকা চাই। তবে এ ব্যাপারে হারবার্ট পথিকৃৎ। হারবার্টের পঞ্চসোপান নীতিকে অনুসরণ করেই আজকাল পাঠটীকা প্রস্তুত করা হয়। অবশ্য অভিজ্ঞ শিক্ষক তাঁর বিবেচনা এবং প্রয়োজনমত পঞ্চসোপান নীতির পরিবর্তন করতে পারেন। আমরা হারবার্টকে অনুসরণ করে আমাদের দেশে প্রচলিত কয়েকটি পাঠটীকার উল্লেখ করছি। সাহিত্য, অংক, ইতিহাস এবং ভূগোল এ চারটি পাঠটীকা প্রদান করা হল।

এ সম্বন্ধে আমাদের দু'একটি বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ, এ পদ্ধতি সব সময় গ্রহণ করা যায় না। শিক্ষাদান এভাবে কৃত্রিম ছন্দে চলে না, তার নিজস্ব একটি সহজ গতি আছে বলে অনেকে মনে করেন। তাছাড়া, সকল বিষয় এভাবে পাঠটীকা প্রস্তুত করে শিক্ষা দেওয়া যায় না। অনেকগুলি বিষয়কেই সমগ্রভাবে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করতে হয়। তাছাড়া, শিক্ষাদান একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। একে এভাবে কৃত্রিম স্তরে ভাগ করা মনস্তত্ত্বসম্মত নয়।

(৩) পাঠটীকা (Lesson Notes)

বিদ্যানগর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়	সাধারণ পাঠ
শ্রেণী—৪র্থ মান	ভারতের ইতিহাস
বিষয়—ইতিহাস	লেখক—ক্ষীরোদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গড় বয়স—৯	অন্তকার পাঠ
ছাত্রসংখ্যা—৩০	বুদ্ধদেব
সময়—৪০ মিনিট	
শিক্ষক : নিতাই ধর	
তারিখ—১৫।৭।৬৪ ইং	

উদ্দেশ্য	প্রত্যক্ষ : শিক্ষার্থীকে বুদ্ধদেবের জীবনের সংগে পরিচয় করান। পরোক্ষ : প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও ধর্মনৈতিক অবস্থার বিবরণ সংগ্রহে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করা।
আয়োজন	ছাত্রদের পূর্বজ্ঞানের সংগে পরিচিত হবার জন্য শিক্ষক মহাশয় নিম্নোক্ত প্রশ্ন করতে পারেন। ১। তোমরা বুদ্ধদেবের নাম শুনেছ কি ? ২। তিনি যে ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন তার নাম কি ? ৩। বুদ্ধদেব কখন কোথায় জন্মেছিলেন ? ৪। বুদ্ধদেবের সম্পর্কে কোন গল্প শুনেছ কি ?
পাঠ ঘোষণা	এর পর শিক্ষক মহাশয় বুদ্ধদেবের জীবনী আরম্ভ করবেন বলে ছাত্রদের ঘোষণা করে দিবেন।
উপস্থাপন	শিক্ষক মহাশয় তখন বুদ্ধদেবের জীবনীকে নানা অংশে ভাগ করে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপিত করবেন।

(৪) পাঠটীকা (Lesson Notes)

কুঞ্জবন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	সাধারণ পাঠ
শ্রেণী—৪র্থ মান	ভূগোল
বিষয়—ভূগোল	লেখিকা – রমা দেবী
গড় বয়স—৯	অদ্যকার পাঠ
ছাত্রসংখ্যা—৩০	ত্রিপুরার প্রাকৃতিক বিবরণ
সময়—৪০ মিনিট	
শিক্ষয়িত্রী : গীতা রায়	
তারিখ—১৫।৭।৬৪ ইং	

উদ্দেশ্য	প্রত্যক্ষ : শিক্ষার্থীদের দেশের ভৌগোলিক জ্ঞান সংগ্রহে সহায়তা করা। পরোক্ষ : ভৌগোলিক জ্ঞানের সংগে দেশের মানুষের পরিচয় দান।
আয়োজন	ছাত্রদের পূর্বজ্ঞানের সংগে পরিচিত হবার জন্য শিক্ষিকা নিম্নোক্ত প্রশ্ন করতে পারেন। ১। ত্রিপুরার জলবায়ু কি রকম ? ২। ত্রিপুরায় কত নদী বা পাহাড় আছে ? ৩। ত্রিপুরার কৃষিকার্য সম্বন্ধে কি জান ?
পাঠ ঘোষণা	এরপর শিক্ষয়িত্রী মহাশয়া ত্রিপুরার প্রাকৃতিক বিবরণের পাঠ ঘোষণা করবেন।
উপস্থাপন	ত্রিপুরার প্রাকৃতিক বিবরণকে নানা অংশে অর্থাৎ জলবায়ু, মাটির বিবরণ, জনসংখ্যা, পাহাড় পর্বতের বিবরণ, কৃষি-কার্যের অবস্থা ইত্যাদি অংশে ভাগ করে উপস্থাপিত করতে হবে।

প্রশ্নাবলী

1. **What do you understand by Lesson Notes? Prepare one Lesson Notes.**
2. **Do you think that it is always possible to follow such notes? If not, why?**

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

অভীক্ষা এবং পরীক্ষা

(Test and Examination)

পরীক্ষা এবং অভীক্ষার মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। শিক্ষার্থী কতটুকু শিক্ষা গ্রহণ করেছে, তার শিক্ষা গ্রহণে অগ্রগতি বা অবনতি ঘটেছে কিনা এসব পরিমাপ করার জন্য পরীক্ষা পদ্ধতির প্রয়োজন এবং শিক্ষাদান কার্যের একটি অংগ বলে স্বীকৃত। আমরা নিম্নে লিখিত পরীক্ষা (Paper and pencil achievements) অর্থাৎ রচনামূলক পরীক্ষা (Essay-type) এবং বিষয়াত্মক পরীক্ষা বা অভীক্ষা (Objective test or examination) নিয়ে আলোচনা করছি। পরীক্ষা এবং অভীক্ষাকে আমরা এক সংগে পরীক্ষা বলতে পারি, তার কারণ উভয় পরিমাপেই কাগজ-কলমের প্রয়োজন এবং পরীক্ষার্থীকে প্রশ্নের জবাব লিখতে বা চিহ্নিত করতে হয়। তাছাড়া, উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর যোগ্যতা বা শিক্ষণের সার্থকতা সম্বন্ধে নম্বর (marks) প্রদান করা হয়। এদের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তা আমরা অন্যত্র আলোচনা করছি। অনেক সময় মৌখিক পরীক্ষার (Oral examination) ব্যবস্থাও করা হয়। ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে বা সময় সংক্ষিপ্ত করার জন্য বা শিক্ষার্থীর বাচনভংগী পরীক্ষার জন্য এরূপ পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। কাগজ কলমের প্রয়োজন এতে না হলেও উদ্দেশ্যের দিক থেকে লিখিত পরীক্ষার সমগোত্রীয় হল মৌখিক পরীক্ষা।

১। পরীক্ষা গ্রহণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (A short note on the history of examination system) :

পরীক্ষা প্রথার একটি দীর্ঘ ইতিহাস আছে। কুয়ো (*Ping Wen Kuo*) তাঁর *Chinese System of Public Examination* বইতে পরীক্ষার বিষয় উল্লেখ করেছেন। মহামতি শান (*Shun*) খ্রীষ্টপূর্ব দুই হাজার বছরের আগেও তাঁর রাজকর্মীদের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করতেন। প্রতি তিন বছর অন্তর তিনি এভাবে পরীক্ষা নিতেন। যারা অনুত্তীর্ণ হত তাদের তিনি কাজ থেকে বরখাস্ত

করতেন। এ ধরনের পরীক্ষাকে আজকের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার (Competetive examination) সংগে তুলনা করা যেতে পারে। ইউরোপে বিদ্যালয়ের শুরুতে এ ধরনের পরীক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হত এবং পরীক্ষার সাফল্যের উপর নির্ভর করেই সম্মানসূচক পদবী (degree or certificate) দেওয়া হত।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হরেস্ মান্ (*Horace Mann*) আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পরীক্ষা প্রথার মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন আনয়ন করেন। শিক্ষামূলক কৃতিত্ব বা শিক্ষার্থীর গুণাবলী পরিমাপের বিষয় নিয়ে মানের সংগে তদানীন্তন শিক্ষক এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তুমুল বিরোধ উপস্থিত হয়। মানের প্রচেষ্টার ফলেই একটা সমজাতীয় (uniform) পরীক্ষা-ব্যবস্থার উদ্ভব হয় এবং শিক্ষামূলক যোগ্যতা পরিমাপক নানা ধরনের পদ্ধতির সৃষ্টি হয়। মান্ মৌখিক পরীক্ষার বিরোধী ছিলেন, তার পরিবর্তে লিখিত পরীক্ষার (written examination) ব্যবস্থা হয় এবং গতানুগতিক নির্ধারিত কতকগুলি মুষ্টিমেয় প্রশ্নাবলীর পরিবর্তে নানা ধরনের সূক্ষ্ম প্রশ্নপত্র উদ্ভাবিত হয়। বলা বাহুল্য, আজকের বিষয়াত্মক (objective) পরীক্ষার উদ্ভাবনও সে সময় থেকেই শুরু হয়।

২। বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা (Different types of examination) :

শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত গুণ বা ব্যক্তিত্ব সংক্রান্ত উন্নতির পরিমাপক হিসেবে নানা ধরনের পরীক্ষা নানা ভাবে গ্রহণ করা হয়। লিখিত পরীক্ষাকে আমরা রচনামূলক (essay) বা বিষয়াত্মক (objective) এই দু'ভাগে ভাগ করেছি। বিষয়াত্মক পরীক্ষাগুলির মধ্যে আবার নানা শ্রেণীর পরীক্ষা পদ্ধতি আছে। এগুলির প্রচলন খুব বেশী দিন ধরে হয়নি এবং এখনও এদের প্রয়োগ ও গঠন সম্বন্ধে নতুন নতুন গবেষণার ফল বেরুচ্ছে। এজন্য এগুলিকে নতুন ধরনের অভীক্ষা (New-Type test) বলা হয়। এগুলির বহুল প্রচলিত একটি পরীক্ষা হল আদর্শায়িত অভীক্ষা (standardised test)। আবার যদি পরীক্ষার্থী মুখে মুখে প্রশ্নের জবাব দেয় তবে তাকে মৌখিক (oral) পরীক্ষা বলে। পরীক্ষাকে অনেক সময় যোগ্যতাবৃদ্ধির (Qualifying) পরীক্ষা এবং প্রতিযোগিতামূলক

(Competetive) পরীক্ষা—এ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যোগ্যতা বৃদ্ধির পরীক্ষা বলতে বিদ্যালয়ে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে বা অন্যান্য কোন সংস্থার দ্বারা গৃহীত পরীক্ষা বোঝায়। এ পরীক্ষায় শিক্ষার্থী যে শিক্ষা গ্রহণ করছে তার পরিমাপ করা হয়। কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা বলতে শিক্ষার্থীর বৃত্তিগত (vocational) যোগ্যতার পরিমাপ বোঝায়। যারা শিক্ষার্থীকে কোন কাজ বা বৃত্তি (vocation) বা পেশাতে নিয়োগ করবেন তারাই তাদের উদ্দেশ্য অনুসারে এ পরীক্ষা গ্রহণ করেন। এই গেল পরীক্ষার জাতিগত ভাগ সম্বন্ধে মোটামুটি পরিচয়।

এ ছাড়া পরীক্ষা গ্রহণকারী ভেদে পরীক্ষাকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—অন্তর্বৃ্ত (internal) এবং বহির্বৃ্ত (external) পরীক্ষা। প্রতি বিদ্যালয়েই অন্তর্বৃ্ত পরীক্ষার প্রচলন আছে। সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক বা বাৎসরিক পরীক্ষার ব্যবস্থা বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ করে থাকেন। শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণে অগ্রগতি হচ্ছে কিনা, বা শিক্ষকের শিক্ষাদান এগিয়ে চলছে কিনা, এ সব নির্ণয় করার জন্য বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বা শিক্ষকগণ এ পরীক্ষার ব্যবস্থা করে থাকেন। বহির্বৃ্ত পরীক্ষা হল বিদ্যালয়ের বাইরের কোন কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ রাষ্ট্র, বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড কর্তৃক প্রস্তুত প্রশ্নপত্রের দ্বারা শিক্ষার্থীর যোগ্যতা নির্ণয়ের ব্যবস্থা। এই বহির্বৃ্ত পরীক্ষাই সাধারণী পরীক্ষা (Public Examination) বলে অভিহিত হয়েছে। অন্তর্বৃ্ত পরীক্ষার বিশেষ কোন সামাজিক স্বীকৃতি নেই। সাধারণী বা বহির্বৃ্ত পরীক্ষাকেই রাষ্ট্র বা সমাজ স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। শিক্ষার্থীর যোগ্যতার নিদর্শন স্বরূপ অভিজ্ঞানপত্র (certificate) বা পদবী (degree) দেওয়া হয়। এগুলির একটি সামাজিক মানও (Social standard) রয়েছে।

৩। পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য (Purpose of Examination):

(১) পরীক্ষা গ্রহণের দ্বারা মূলতঃ এবং প্রধানতঃ শিক্ষার্থীর শিক্ষণের অগ্রগতি পরিমাপ করা হয়। শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকের শিক্ষাদানই যথেষ্ট নয়। শিক্ষার্থী কতটুকু শিখল, যে বিশেষ পাঠ্যসূচী সম্বন্ধে তাকে শিক্ষা প্রদান করা

হচ্ছে, সে তা যথাযথ গ্রহণ করতে পেরেছে কিনা তার পরিমাপ করাই পরীক্ষার উদ্দেশ্য।

(২) শিক্ষার্থীর কোথায় কোন্ ত্রুটি হয়েছে বা সে কেন পিছে পড়ে আছে তা পরীক্ষার মাধ্যমেই ধরা পড়ে। শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণে সক্ষম হয়েছে কিনা বা তার ত্রুটির কারণ কি—এ সব নির্ধারণ করার একমাত্র উপায় পরীক্ষার ব্যবস্থা। শিক্ষার্থী যদি পরীক্ষাতে ব্যর্থ হয়, তা হলে তার ব্যর্থতার কারণ নির্ধারণ **(diagnosis)** করা যায়। কিভাবে শিক্ষার্থী তার ত্রুটিগুলি সংশোধন করতে পারে এজন্য শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক উভয়ই সচেষ্ট হতে পারেন।

(৩) শিক্ষার্থীকে তার শিক্ষা গ্রহণ পরিচালনা করা, তার ভবিষ্যৎ জীবন-গঠনে সহায়তা করাও **(Prognosis)** পরীক্ষার উদ্দেশ্য। শিক্ষার্থী ভবিষ্যৎ সমাজজীবনে কি ধরনের দায়িত্ব নিতে পারবে, কোন্ বৃত্তি গ্রহণ তার পক্ষে উপযুক্ত হবে ইত্যাদিও পরীক্ষার মাধ্যমে স্থির করা যায়।

(৪) পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে যে শুধু শিক্ষার্থীর শিক্ষণের পরিমাপ করা যায় তা নয়, অনেক সময় শিক্ষকের শিক্ষাদানের দক্ষতারও বিচার করা হয়। যদিও শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণে অক্ষমতার সংগে শিক্ষকের অযোগ্যতার কোন কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না, তবুও শিক্ষকের শিক্ষাদানের সার্থকতার পরিচয় বহন করে পরীক্ষার্থীর সাফল্য।

(৫) পরীক্ষা পদ্ধতি শিক্ষার্থীর মনে শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ সৃষ্টি করে, ইহা অনেক সময় একটি কৃত্রিম উদ্‌বোধকের **(artificial incentive)** কাজ করে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচীকে সমাপ্ত করতে হবে, এ ধরনের একটি তাড়না **(needs)** শিক্ষার্থী অনুভব করে। শিক্ষার্থীর বিক্ষিপ্ত মনের উপর পরীক্ষার ব্যবস্থা এক ধরনের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ **(Social control)** রূপে কাজ করে।

(৬) পরীক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জনের পরিমাপই শুধু হয় না, পরোক্ষ-ভাবে শিক্ষার্থীর অন্যান্য গুণের পরিমাপও হয়। যে শিক্ষার্থী পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হয়েছে বা যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছে সে যে শুধু পাঠ্যসূচীর বিষয়গুলিই অধ্যয়ন করেছে তা নয়, পাঠ্যসূচীর বাইরে অন্যান্য বিষয়ও সে অনুশীলন করেছে এবং তার পেছনে শিক্ষার্থীর পরিশ্রম, অধ্যবসায়, নিয়মানুবর্তিতা, তিতিক্ষা প্রভৃতি গুণ রয়েছে। অর্থাৎ পরীক্ষার মাধ্যমে কেবল শিক্ষার্থীর

অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপ হয় না, এর সংগে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব সংক্রান্ত অন্যান্য মানসিক গুণাবলীরও একটি পরিচয় পাওয়া যায়।

৪। প্রচলিত রচানামূলক পরীক্ষার সুবিধা এবং অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of the Conventional Essay-Type Examination):

রচনামূলক (essay-type) পরীক্ষা বলতে আমরা কি বুঝি? রচনামূলক পরীক্ষায় শিক্ষার্থীকে যে প্রশ্নপত্র দেওয়া হয়, তার মধ্যে একাধিক প্রশ্ন থাকে। শিক্ষার্থী যথাসম্ভব নিজ ভাষায় এই প্রশ্ন বা প্রশ্ন সমষ্টির জবাব দেয়। সিমস্ (*Sims*) তাঁর *The Essay Examination is a Projective Technique* বইতে রচনামূলক পরীক্ষা সম্বন্ধে বলেন: রচনামূলক পরীক্ষার যে সমস্যাধর্মী পরিস্থিতি থাকে অধিকতর স্বাধীনভাবে শিক্ষার্থী তার উত্তর লিখতে পারে, এতে শিক্ষার্থীর মানসিক অভিজ্ঞতার গঠন, গতিশীলতা এবং ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। এই আলোচনা থেকে রচনামূলক পরীক্ষার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করা যেতে পারে: (ক) পরীক্ষার্থীকে প্রশ্নের জবাব লিখতে তার নিজস্ব মতামতের স্বাধীনতা দেওয়া হয়।[1] (খ) সম্পূর্ণ এবং যথার্থ হিসেবে এসব প্রশ্নের একটি মাত্র জবাব নেই, এমনকি বিশেষজ্ঞরাও ঠিক করে দিতে পারে না।[2] (গ) বিভিন্ন গুণ ও কৃতিত্বের তারতম্যের দ্বারা এ প্রশ্নের জবাব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।[3]

রচনামূলক পরীক্ষার সুবিধা (Advantages of Essay-Type Examination): (১) প্রচলিত রচনামূলক পরীক্ষার প্রধান সুবিধা হল, শিক্ষার্থীর অধীত পাঠ্যসূচীর বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিমাপ করা যায়। (২) এই পরীক্ষার মধ্যে শিক্ষার্থীর নিজস্ব দৃষ্টিভংগী ও মতের স্বাধীনতা থাকে। শিক্ষার্থীর জীবনে স্বাধীন মত প্রকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। (৩) শিক্ষার্থীর ভাষা-

1. The examinee is permitted freedom of response in answering the question.

2. There is no single answer to the question which can be regarded as correct and complete, even by experts.

3. Answers of the question are characterised by different degrees of ity or merit.

জ্ঞান, রচনা শৈলী, ভাব প্রকাশের ক্ষমতা ইত্যাদি প্রচলিত রচনামূলক পরীক্ষার মাধ্যমেই যাচাই করা যায়। (৪) এই পরীক্ষাতে পরীক্ষার্থীর যুক্তি বা অনুমান ক্রিয়ার যথেষ্ট সুযোগ থাকে, জ্ঞান অর্জনের শ্রেষ্ঠ মানসিক প্রক্রিয়া হল যুক্তি। সুতরাং এদিক থেকে রচনামূলক পরীক্ষার যথেষ্ট সুবিধা আছে। (৫) রচনামূলক পরীক্ষাকে অনেকে সমালোচনা করে বলেন যে উহা ব্যক্তির আচরণের প্রলক্ষণকে (individual traits) পরিমাপ করতে পারে না। কিন্তু এখানে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, রচনামূলক পরীক্ষা কি পরিমাপ করতে চায়? পরীক্ষার্থীর সাবলীলভাবে গদ্যে (prose) একটি প্রশ্নের জবাব লিখবার কতটুকু ক্ষমতা (ability) আছে, তা এই পরীক্ষা পরিমাপ করে। সুতরাং ব্যক্তিত্ব সংক্রান্ত আচরণ এর মুখ্য উদ্দেশ্য নয়।

রচনামূলক পরীক্ষার সার্থকতা সম্বন্ধে বলা হয় যে, ভাবসংগঠন ও নির্বাচনে, প্রকল্প গঠন ও সমর্থনে, তর্কসম্মতভাবে যুক্তি প্রসারে, গঠনধর্মী ভাষা প্রকাশে যে উচ্চতর মানসিক প্রক্রিয়া নিয়োজিত তা পরিমাপ করাই রচনামূলক পরীক্ষার উদ্দেশ্য। সুতরাং এই পরীক্ষার দ্বারাই শিক্ষার কতকগুলি ব্যাপক প্রতিফল যাচাই করা যেতে পারে, যা অন্য কোন কাগজ-কলমে বা লিখিত পরীক্ষার দ্বারা পরিমাপ করা যায় না।

রচনামূলক পরীক্ষার অসুবিধা (Disadvantages of Essay-Type Examination): (১) প্রচলিত রচনাধর্মী পরীক্ষার প্রধান ত্রুটি হল এতে কোন নির্ভরযোগ্যতা (Reliability) নেই। একই পরীক্ষক এই ধরনের প্রশ্নের খাতায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের নম্বর (marks) দিয়ে থাকেন। বিভিন্ন পরীক্ষক সম্বন্ধে তো কথাই নেই। কারণ বিভিন্ন পরীক্ষক পরীক্ষার্থীর সাফল্য পরিমাপের বিভিন্ন মান (standard) প্রয়োগ করেন। পরীক্ষার্থীর মানসিক ও দৈহিক অবস্থার উপরও তার পরীক্ষার ফলাফল নির্ভর করে। সুতরাং এ ধরনের পরীক্ষার দ্বারা পরীক্ষার্থীর শিক্ষণের পরিমাপ করা যায় না। তাছাড়া, পরীক্ষকের মেজাজ বা মানসিক অবস্থার উপরও পরীক্ষার্থীর সাফল্য নির্ভর করে। একই প্রশ্নপত্র ক্লান্তি ও দুশ্চিন্তার মধ্যে যে পরীক্ষক দেখছেন, উহা সুস্থ বা প্রফুল্ল মনে দেখলে এ দু'প্রকার খাতার নম্বরদানের পার্থক্য লক্ষ্য করা যাবে। আসল কথা, পরীক্ষার ফলাফল বিচার অনেকটা ব্যক্তিসাপেক্ষ (subjective) ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

(২) প্রচলিত রচনাধর্মী পরীক্ষায় প্রয়োগশীলতার (administrability) অভাব রয়েছে। প্রথমতঃ, প্রশ্নপত্রের মধ্যে পরীক্ষক কতটুকু জবাব চান বা একটা প্রশ্নের জবাব লিখতে পরীক্ষার্থী কোন্ কোন্ দিক বিবেচনা করবে এ ধরনের কোন ইংগিত প্রশ্নপত্রে থাকে না। দ্বিতীয়তঃ, পরীক্ষার্থীর প্রশ্নোত্তরে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে নম্বর দেবার (scoring) কোন ব্যবস্থা নেই। উহা অনেকটাই ব্যক্তিসাপেক্ষ ব্যাপার।

(৩) রচনাধর্মী পরীক্ষায় প্রশ্নের উত্তর লিখতে যথেষ্ট সময় লাগে। পরীক্ষার্থীরা প্রায়ই অভিযোগ করে যে, যে ধরনের প্রশ্নের জবাব চাওয়া হয় তা তিন-চার ঘণ্টায় যথাযথভাবে সম্পন্ন করা যায় না। তারপর প্রশ্নের উত্তরপত্র পরীক্ষা এবং পরীক্ষার ফল প্রকাশ ইত্যাদিতে প্রচুর অর্থ এবং সময়ের অপব্যবহার হয়। এ পরীক্ষাব্যবস্থায় তাই পরিমিততার (economy) অভাব রয়েছে।

(৪) এই রচনাধর্মী পরীক্ষাতে কোন মান (norm) নেই। অর্থাৎ পরীক্ষার্থীর একটি বিষয়ের ফলাফলের সংগে অন্য বিষয়ের ফলাফলকে যথাযথ ব্যাখ্যা করার এবং তুলনা করার (interpretation and comparability) কোন সুযোগ নেই। নম্বরদান (scoring) এত ব্যক্তিসাপেক্ষ ব্যাপার যে তার কোন বিজ্ঞানসম্মত মান নেই।

(৫) এ ধরনের পরীক্ষাতে পরীক্ষার্থী অধ্যয়নের চাইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই বড় করে দেখে। তাই তারা শিক্ষকের শিক্ষাদান বা ভাবসংগ্রহের চাইতে পরীক্ষাতে কি ধরনের প্রশ্ন আসবে এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করে আর বাজারের নোটবই (Sure Success, Made Easy, One Minute's Preparation) পড়ে। শিক্ষার্থীর কাছে বিদ্যালয় পরীক্ষায় পাশ করান একটি কল বা কারখানা ছাড়া আর কিছুই নয়। অবশ্য এর পেছনে কারণও রয়েছে। রচনাধর্মী পরীক্ষাতে সমগ্র পাঠ্য বইয়ের উপর প্রশ্ন থাকে না, সুতরাং পরীক্ষার্থীরাও পাঠ্যবই পড়বার আগেই কি ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে এ নিয়েই ব্যস্ত থাকে।

রচনামূলক পরীক্ষার এ সব অসুবিধার জন্য এ পরীক্ষার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন দেখা দেয়। সে আন্দোলনের ফলস্বরূপ আধুনিক বিষয়াত্মক

অভীক্ষার (New-Type Test) প্রচলন হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, রচনামূলক পরীক্ষাকে কি সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া চলে ? এ পরীক্ষার ভবিষ্যৎ কি ?

৫। রচনামূলক পরীক্ষার ভবিষ্যৎ (Future of Essay-Type Examination) :

প্রথমতঃ, অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে বিদ্যালয়গুলি থেকে রচনামূলক পরীক্ষাকে নির্বাসিত করা উচিত। কিন্তু পরে দেখা গেল আধুনিক বিষয়াত্মক অভীক্ষার মধ্যেও এমন কতকগুলি ত্রুটি রয়েছে যার ফলে উহা রচনামূলক পরীক্ষাকে স্থানচ্যুত করতে পারে না। রচনামূলক পরীক্ষায় যে সুবিধা বর্তমান, শিক্ষার্থীর স্বাধীন মত প্রকাশ, অনুমান করার সুযোগ, ভাব প্রকাশের অধিকার ইত্যাদি কোন কিছুই অন্য কোন পরীক্ষাতে সম্ভব নয়। আর শিক্ষার মূলসূত্র শিক্ষার্থীর স্বাধীন মত গঠন এবং ভাব সৃষ্টিতেই নিহিত। সুতরাং এ পরীক্ষাকে পরিত্যাগ করা চলে না।

এজন্য ১৯৪৮–৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন এই রচনামূলক পরীক্ষার সংস্কার করতে চেয়েছেন।[1] প্রশ্নকর্তা প্রশ্ন তৈরির সময় যদি সমগ্র পাঠ্য বইয়ের উপর প্রশ্ন করেন, প্রশ্নের কোন্ কোন্ অংশের উপর কিভাবে কত নম্বর দেবেন ইত্যাদি স্থির করেন, তবে পরীক্ষার্থীর প্রশ্নোত্তরকে যথাসম্ভব বিজ্ঞানসম্মত ভাবে পরীক্ষা করা যেতে পারে। আর শিক্ষার্থী ও পরীক্ষা উত্তীর্ণ হবার জন্য সহজ বই না পড়ে পাঠ্যবই পড়বার প্রবণতা দেখাবে।

তাছাড়া, প্রশ্নপত্র তৈরির সময় প্রশ্নগুলি যাতে নির্ভরশীল হয় তাও বিবেচনা করতে হবে। কারণ সময় সময় এমন প্রশ্ন করা হয় যার সঠিক উত্তর পরীক্ষার্থী ঠিক করতে পারে না। এজন্য বিশেষ কোন সমস্যা প্রশ্নের মধ্যে উপস্থাপিত করলে পরীক্ষার্থী ঠিক বুঝতে পারে, কোন্ সমাধান তার কাছ থেকে চাওয়া হচ্ছে।

পরীক্ষার নম্বরদান (scoring) যাতে পুরোপুরি ব্যক্তি-সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে না দাঁড়ায় তার জন্য একই প্রশ্নোত্তর একাধিক পরীক্ষক পরীক্ষা করতে পারেন।

1. If examinations are necessary, a thorough reform of these are still more necessary. (The Report of the University Education Commission, 1948-49.)

আধুনিক বিষয়াত্মক অভীক্ষার সংগে রচনাধর্মী পরীক্ষার যথাসম্ভব একটি সমন্বয় বা একটিকে আর একটির সহায়করূপে বিবেচনা করলে রচনামূলক পরীক্ষার উন্নতি সম্ভব।

রচনাধর্মী পরীক্ষা থেকে ব্যক্তি-সাপেক্ষতা (subjectivity) দূর করার জন্য এবং শিক্ষার্থীর শিক্ষা-জীবনের একটি সামগ্রিক রূপ বিবেচনা করার জন্য আমাদের দেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে ধারাবাহিক পরিমাপ পত্র (Cumulative Record Card) প্রবর্তন করা হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীর শুধু বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন জীবনের শিক্ষার অগ্রগতি লিপিবদ্ধ করা হয় না, তার ব্যক্তিগত ইতিহাস (পারিবারিক, সামাজিক), ব্যক্তিগত গুণাবলী, (আগ্রহ, কর্মক্ষমতা, উৎসাহ, সামাজিক কর্মানুষ্ঠান প্রভৃতির বিবরণ), ব্যক্তিসত্ত্বা ও বুদ্ধির ক্রমবিকাশ, সহপাঠ্য-সূচীর কার্যাবলীতে তার অংশ গ্রহণ, তার স্বাস্থ্যের বিবরণ প্রভৃতি আনুষংগিক সকল বিষয় উল্লিখিত হয়।

যদিও এই ধারাবাহিক পরিমাপপত্রে শিক্ষকের ব্যক্তিগত মত ও আকর্ষণের ছাপ পড়ার আশংকা আছে, তবুও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায় গ্রহণ করলে এতে শিক্ষার্থীর একটি সামগ্রিক জীবনের পরিচয় আমরা পেতে পারি।

৬। আধুনিক বিষয়াত্মক অভীক্ষা (New-Type Objective Test) :

আধুনিক বিষয়াত্মক অভীক্ষাকে সাধারণতঃ দু' শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। একটিকে বলা হয় সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর (Short answer item) এবং অন্যটিকে বলা হয় বহু নির্বাচনী প্রশ্নোত্তর (Multiple-choice item)। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরে পরীক্ষার্থী একটি শব্দ, সংখ্যা বা প্রতীক চিহ্ন বসিয়ে প্রশ্নের জবাব দেয়। বহু নির্বাচনী প্রশ্নোত্তরে প্রশ্নের অনেকগুলি সম্ভাব্য উত্তর বা উত্তরটি এলোমেলোভাবে বিভিন্ন স্তরে সাজান থাকে, পরীক্ষার্থীকে যথাযথ প্রশ্নটি নির্বাচন করে নিতে হয়। অনেকে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরকে স্মৃতিমূলক (recalling) এবং বহু নির্বাচনী প্রশ্নোত্তরকে স্বীকৃতিমূলক (recognition) বলে অভিহিত করেন। কিন্তু এ ধরনের ব্যাখ্যা সংগত নয়। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরে স্মৃতিই একমাত্র সহায়ক নয়, অনেক সময় নতুন বিষয়ও থাকে। বহু নির্বাচনী প্রশ্নোত্তরে অনেক সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর থাকে যার সংগে পরীক্ষার্থীর কোন পরিচয়ই নেই।

আমরা নিম্নে এই দুই ধরনের বিষয়াত্মক অভীক্ষার কয়েকটি বহুল প্রচলিত উদাহরণ দিচ্ছি।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর (Short Answer Item) :

(ক) সম্পূর্ণকরণ অভীক্ষা (Completion *or* Recall Type) : এখানে একটি বাক্য থাকে এবং এ বাক্যের মধ্যে বিশেষ শব্দ বা শব্দসমষ্টি উহ্য থাকে, পরীক্ষার্থীকে তা পূরণ করতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ—

১। গীতাঞ্জলির রচয়িতা হলেন— ।

২। চুম্বকের ধর্ম— ।

(খ) হ্যাঁ অথবা না (Yes or No Type) :

(১) জলের চেয়ে বরফ হাল্কা। হ্যাঁ/না।

(২) সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। হ্যাঁ/না।

(৩) সম্রাট আকবর ধর্ম সমন্বয়ের বাণী প্রচার করেন। হ্যাঁ/না।

'হ্যাঁ অথবা না' এ ধরনের অভীক্ষণ 'সত্য-মিথ্যা' বিচারের (True or False Type) নামান্তর। এ ধরনের প্রশ্নের গঠনরীতি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন শুধু সত্য কিনা বা মিথ্যা কিনা জিজ্ঞাসা করা হবে। অথবা শুধু যে প্রশ্ন সত্য বা যে প্রশ্ন মিথ্যা তা-ই জিজ্ঞাসা করা হবে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস সত্য বা মিথ্যা প্রশ্নের প্রতি প্রশ্নকর্তার পক্ষপাতিত্ব না থাকাই ভাল। প্রশ্নের সংখ্যা যত বেশী হবে ততই এ ধরনের অভীক্ষার নির্ভরশীলতা এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে। সত্য বা মিথ্যা প্রশ্নের মধ্যে অনুপাত না থাকাই ভাল। এ ধরনের অভীক্ষাতে সাধারণতঃ অনুমান করার কোন সুযোগ থাকে না। কিন্তু কোন কোন স্থলে অনুমান করার সুযোগ দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীর পাঠ্যপুস্তক বা অর্জিত জ্ঞানের ওপর পরীক্ষা গৃহীত হলে অনুমানের কোন সুযোগ দেওয়া হয় না।

(গ) উপমান অভীক্ষা (Analogy Type) : এখানে দুই বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য লেখা থাকে, শিক্ষার্থীকে তৃতীয় বস্তুর সংগে চতুর্থ বস্তুর সাদৃশ্য খুঁজে নিতে হয়।

(১) পিতার সংগে পুত্রের যে সম্বন্ধ শিক্ষকের সংগে — সে সম্বন্ধ।

(২) জলের সংগে মাছের যে সম্বন্ধ কেঁচোর সংগে — সে সম্বন্ধ।

(৩) দুঃখের সংগে সুখের যে সম্পর্ক আলোর সংগে —সে সম্পর্ক।

বহু নির্বাচনী প্রশ্নোত্তর (Multiple choice Test) :

(ক) নির্বাচনী পরীক্ষা (Choice Test) : এখানে প্রশ্নের জবাবের অনেকগুলি সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া থাকে বা এলোমেলোভাবে প্রশ্নের জবাব লেখা থাকে, পরীক্ষার্থীকে সেটা খুঁজে নিতে হয় অথবা ঠিকভাবে সাজিয়ে নিতে হয়।

(১) ভারতে নোবেল পুরস্কার পান গান্ধীজী / রবীন্দ্রনাথ / দাদাভাই নৌরজী।

(২) ভারত অর্থনীতিতে অনগ্রসর দেশ তার কারণ—ভারতের মানুষ অলস/ ভারতের সরকার ইহা চান না / শিল্প ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির এবং দক্ষ কারিগরের অভাব।

(খ) মিলনকরণ পরীক্ষা (Matching Test) : এখানে প্রশ্নের ডান দিকে উত্তর দেওয়া থাকে, যেখানে যেটি খাটে সেখানে সেটি সাজিয়ে লিখতে হয়।

(১)	রবীন্দ্রনাথ প্রথম লাভ করেন	(১)	প্রধানমন্ত্রী
(২)	পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চল	(২)	নোবেল পুরস্কার
(৩)	জহরলাল ভারতের প্রথম	(৩)	ঘনবসতি।

৭। আদর্শায়িত অভীক্ষা (Standardised Test) :

পরীক্ষার সার্থকতা নির্ভর করে তার যাথার্থ্য এবং নৈর্ব্যক্তিকতার ওপর। কিন্তু প্রচলিত পরীক্ষার (এমন কি নতুন অভীক্ষারও) ত্রুটি হল এদের ফলাফলকে অন্যান্য ফলাফলের সংগে তুলনা করা যায় না। অর্থাৎ একটি পরীক্ষার্থী অংকে ৩৫ নম্বর পেয়েছে, তার এই ফলকে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করব? যদি ধরা যায় অংকে মোট নম্বর ছিল ১০০ এবং উত্তীর্ণ হওয়ার নম্বর ৩০, তবে ছেলেটি মোটামুটিভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে, কিন্তু অংকে কাঁচা। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে, এ ব্যাখ্যা মোটেই যথাযথ নয়। ছাত্রের কৃতিত্ব বা দুর্বলতাকে বিচার করতে গেলে আমাদের আরও কয়েকটি প্রশ্ন করতে হয়। যেমন, এই শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যা কত? তারা কে কত নম্বর পেয়েছে? তাদের গড় (average) নম্বর কত? সে তুলনায় ছাত্রটি যদি ৩৫ পায় তবে এ নম্বর গড় নম্বরের উর্ধ্বে, না নিয়ে ইত্যাদি। এ সব প্রশ্নের সমাধান

না করে ছাত্রের ফলকে ব্যাখ্যা করা যায় না এবং নম্বর দান কখনও বিজ্ঞানসম্মত হতে পারে না।

অতএব একটি সাধারণ মান (Standard or Norm) নির্ণয় করা প্রয়োজন। এই মানের সংগে পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বরকে তুলনা করে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি। এ ধরনের মানকে জনসাধারণের মান (Population Norm) বলা হয়ে থাকে। বারবার প্রয়োগের দ্বারা একটি অভীক্ষার প্রতিনিধিমূলক গড় মান স্থির করা হয় এবং জনসাধারণ একে আদর্শায়িত অভীক্ষা (Standardised Test) হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। এ ধরনের পরীক্ষার সহায়করূপে নম্বর দানের জন্য নানা ধরনের পরিমাপক (Scale) আছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে গড় নম্বর এবং আদর্শায়িত মান এক জিনিস নয়। গড় নম্বর হল শিক্ষার্থী গড়ে যে নম্বর পেয়েছে অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের সংখ্যা দিয়ে সকলের মোট নম্বরকে ভাগ করে যা লাভ করা যায়। কিন্তু আদর্শ মান হল শিক্ষার্থীর যা ন্যায্য প্রাপ্য। মনে করা যাক্, যে শিক্ষার্থী অংকে ৩৫ পেয়েছে, সেই শ্রেণীতে ২০ জন ছাত্র এবং গড়ে প্রত্যেকে ২৫ পেয়েছে। তা হলে দেখা যাচ্ছে, সে ছেলে ৩৫ পেলেও অংকে দুর্বল নয়, বরং অন্যতম ভাল ছাত্র। প্রতিটি পরীক্ষার্থীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে আদর্শায়িত মান ঠিক করা হয়। মনে করা যাক সেই আদর্শ মানটি ৪০। যদি পরীক্ষার্থী ৩৫ বা ৫০ নম্বর পায়, তখন ঐ আদর্শ মানের সংগে তুলনা করে তার ফলাফল ব্যাখ্যা করা যাবে। তাছাড়া, পরিমাপক (Scale) ব্যবহার করার ফলে নম্বর দান নির্ভরশীল এবং ব্যক্তি-সাপেক্ষতা থেকে মুক্ত। আধুনিক বিষয়াত্মক অভীক্ষাগুলিকে এভাবে আদর্শায়িত মানের দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়।

৮। আধুনিক বিষয়াত্মক পরীক্ষার সুবিধা এবং অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Objective Type Test) :

আধুনিক বিষয়াত্মক পরীক্ষার সুবিধা (Advantages of Objective-Type Test) : এই নতুন পরীক্ষাপদ্ধতির প্রধান সুবিধা হল, উহা নৈর্ব্যক্তিক বা বস্তুনিষ্ঠ (objective), পরীক্ষক বা পরীক্ষার্থীর ব্যক্তি-সাপেক্ষতা (subjectivity) থেকে উহা মুক্ত। এজন্য উহা নির্ভরশীল।

প্রশ্নের জবাব স্থির করা থাকে। সুতরাং নম্বরদান (scoring) এতে যথাযথভাবে করা যেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, এতে সময় এবং পরিশ্রম কম লাগে। তৃতীয়তঃ, সমগ্র পাঠ্য বইয়ের উপর ব্যাপকভাবে প্রশ্ন করা যেতে পারে বলে শিক্ষার্থী কয়েকটি প্রশ্নের জবাব মুখস্থ করে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য সচেষ্ট হয় না। চতুর্থতঃ, অভিজ্ঞ পরীক্ষক ছাড়াও যে কেহ প্রশ্নোত্তর পরীক্ষা করতে পারেন।

আধুনিক বিষয়াত্মক পরীক্ষার অসুবিধা (Disadvantages of Objective Type Test): এ পরীক্ষায় নিছক তথ্যগত জ্ঞানের (Subject knowledge) উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ভাব, ভাষা বা রচনা কৌশলের ওপর কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। দ্বিতীয়তঃ, এ ধরনের পরীক্ষার ব্যবস্থা ব্যয়বহুল এবং বিশেষজ্ঞ (expert) ছাড়া প্রশ্নপত্র তৈরি করা যায় না। তৃতীয়তঃ, এই পরীক্ষায় প্রয়োগশীলতার অভাব রয়েছে। কারণ এ ধরনের পরীক্ষা চালাতে প্রচুর কৌশলের প্রয়োজন। সাধারণ বিদ্যালয়ে এ ধরনের কৌশলী পরীক্ষকের সংখ্যা খুবই কম। চতুর্থতঃ, এ পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর স্বাধীন মতামত ও ভাবপ্রকাশের সুযোগ নেই। এজন্য অনেকে বলেন, শিক্ষার্থীর জ্ঞানের সঠিক পরিমাপ এ পরীক্ষার দ্বারা সম্ভব নয়। স্যাণ্ডিফর্ড (*Sandiford*) বলেন: পরীক্ষকের পক্ষে বলা সম্ভব নয় যে কোথায় জ্ঞানের পরিসমাপ্তি আর কোথায় অনুমান শুরু হয়।[1] বিষয়াত্মক পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর পক্ষে বুদ্ধিচর্চার বিশেষ কোন সুযোগ নেই। পরীক্ষার্থী অনেক সময় না বুঝেই প্রশ্নোত্তরে একটি দাগ বসিয়ে দেয়, কোন সময় উহা ঠিক হয়ে যায়, কোন ক্ষেত্রে বা ঠিক হয় না। পঞ্চমতঃ, যে কোন বিষয়াত্মক পরীক্ষায় ফলাফলের ব্যাখ্যা এবং তুলনা (Interpretation and Comparability) সম্ভব নয়। একমাত্র আদর্শায়িত অভীক্ষায় (Standardised Test) ফলাফলকে ব্যাখ্যা এবং অন্যান্য ফলের সংগে তুলনা করা যেতে পারে।

তারপর এ ধরনের পরীক্ষার সাহায্যে পরীক্ষার্থীর মৌলিকতা (originality) পরিমাপ করা যায় না।

---

1. "The examiner can not tell where knowledge stops and guessing begins"

৯। শিক্ষাদানে সাধারণী পরীক্ষার প্রভাব (Influence of Public Examination on teaching) :

সাধারণী পরীক্ষা (Public Examination) বলতে আমরা বুঝি রাষ্ট্র, বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক গৃহীত অনেকগুলি বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পরীক্ষা। পরীক্ষার্থীরা একটি নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত বিষয়াবলী অধ্যয়ন করে। এই পাঠ্যসূচীকে ভিত্তি করেই প্রশ্নপত্র রচিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ডের অধীন এবং অনুমোদিত সকল বিদ্যালয়ের ছাত্ররা সববেতভাবে পরীক্ষা দিয়ে থাকে। তারপর তাদের ফলাফলের স্বীকৃতি রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের সমর্থিত বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড দিয়ে থাকে। যারা সাফল্য লাভ করে তারা অভিজ্ঞান পত্র (certificate), পদবী (degree) ইত্যাদি লাভ করে। যেহেতু পরীক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি এবং শিক্ষার্থীর অগ্রগতির সংগে পরোক্ষভাবে শিক্ষকের দক্ষতা এবং যোগ্যতাও জড়িত, সেহেতু সাধারণী পরীক্ষার যথেষ্ট প্রভাব শিক্ষাদানে রয়েছে। আমরা নিম্নে সাধারণী পরীক্ষার এ প্রভাব এবং তার ত্রুটিবিচ্যুতি আলোচনা করছি।[1]

শিক্ষাদানের ওপর সাধারণী পরীক্ষার একটি মারাত্মক প্রভাব এই যে এই পরীক্ষাকেই শিক্ষকরা তাদের সক্রিয়তার প্রধান উৎস বলে বিবেচনা করেন। বিদ্যালয়ের সমস্ত সংগঠন এবং বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব যেন এই পরীক্ষাকে কেন্দ্র করেই স্থির হয়। পরীক্ষা গ্রহণের অসুবিধা বা সুবিধা দ্বারা যে কোন ভাবে একটি পাঠ্যসূচী নির্ধারিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, সাধারণী পরীক্ষার আর একটি মারাত্মক প্রভাব হল যে এর ফলে বৈষয়িক সাফল্যকে (material success) মুখ্য বলে গণ্য করা হয়, আর জ্ঞানার্জন হল গৌণ। শিক্ষার প্রতি গভীর আগ্রহ সৃষ্টি করাই শিক্ষাদানের লক্ষ্য। কিন্তু সেখানে পরীক্ষার দেয়াল অতিক্রম করাই শিক্ষার্থীর লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়।

তৃতীয়তঃ, অনেক পরীক্ষক আছেন যাঁদের বিশেষ বিশেষ কতকগুলি প্রশ্নের ওপর ঝোঁক থাকতে পারে, তাছাড়া অনেক অনিপুণ পরীক্ষক আছেন যাঁরা

1. "The Influence of Public Examination on teaching.'
Raymont : Principles of Education, Chapter XIII

পাঠের প্রয়োজনীয় বিষয়ের চাইতে অপ্রয়োজনীয় অংশকেই গুরুত্ব দেন। ফলে তাদেরী প্রশ্নপত্রে অবান্তর, জটিল ও অপ্রয়োজনীয় বিষয় স্থান পায়।

চতুর্থতঃ, এই পরীক্ষাপদ্ধতিতে কতকগুলি তথ্যগত বিষয়ের উপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়, ফলে শিক্ষার্থীরা এই তথ্যগত বিষয়গুলিকে মুখস্থ করে (cram) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা করে।

সাধারণী পরীক্ষার কুফলের প্রতিকার (Remedies for the evils of examination): রেমণ্ট বলেন, কুফলের প্রথম প্রতিকার করবেন পরীক্ষক। পরীক্ষক তাঁর প্রতি প্রশ্ন সম্বন্ধে প্রশ্ন করবেন, এ প্রশ্ন কি শিক্ষাদানের উপর সুপ্রভাব বিস্তার করবে? এ প্রশ্ন কি সহজবোধ্য এবং শিক্ষার্থীর ক্রমবিকাশের সংগে কি তার মিল আছে? এ প্রশ্ন কি শিক্ষার্থীকে মুখস্থ করার অভ্যাসে উৎসাহিত করবে? অর্থাৎ রেমণ্টের বক্তব্য হচ্ছে, প্রশ্নপত্র সুস্পষ্ট এবং সহজবোধ্য হবে, শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করবে, ছাত্ররা যাতে প্রয়োজনীয় বিষয় অধ্যয়ন করতে পারে তার জন্য একটা প্ররোচকের (incentive) কাজ করবে।

তারপর পরীক্ষক শিক্ষার সংগে সম্পর্কশূন্য ব্যক্তি হবেন না। পরীক্ষক তাঁর বিষয়বস্তুর উপর দক্ষতাপূর্ণ একজন ব্যক্তি হলেই চলবে না, তিনি হবেন একজন অভিজ্ঞ এবং সার্থক শিক্ষক। সাধারণতঃ অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিকে প্রশ্নকর্তা নিয়োগ করা হয় যাদের সংগে শিক্ষাদানের কোন সম্পর্ক নেই। এ ধরনের প্রথা অচিরে বন্ধ করা উচিত।

তারপর প্রশ্নকর্তা বা পরীক্ষক কেবল পাঠ্যসূচীকে কেন্দ্র করেই পরীক্ষার প্রশ্ন প্রস্তুত করবেন না। শিক্ষাদান এবং পরীক্ষার (teaching and examining) মধ্যে গভীর সংযোগ থাকা চাই। আমাদের দেশে অনেক সময় যাঁরা বহু দিন ধরে শিক্ষাদান থেকে বিরত আছেন, বা বর্তমান পরিবেশে শিক্ষাদান কিভাবে চলছে তার সংগে যোগাযোগ রাখেন না, তাঁরাও প্রশ্নকর্তা নির্বাচিত হন, এ ধরনের ব্যবস্থা না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

এ সব ছাড়াও রচনামূলক পরীক্ষার যে সব ত্রুটি রয়েছে, সাধারণী পরীক্ষা সে-সব থেকে মুক্ত নয়। সুতরাং আমরা মনে করি বিষয়াত্মক অভীক্ষা এবং রচনামূলক পরীক্ষার মধ্যে একটি সামঞ্জস্য আনা দরকার। পরীক্ষা ঘন ঘন না হয়ে দুটো পরীক্ষার সময়ের মধ্যে প্রচুর ব্যবধান থাকা উচিত। তা না হলে

পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন এবং পরীক্ষার জন্য ব্যস্ততাই শিক্ষার্থীর জীবনে বড় হয়ে উঠবে এবং জ্ঞানার্জন মোটেই মুখ্য উদ্দেশ্য বলে গৃহীত হবে না।

১০। পরীক্ষা কি গুণাবলী পরীক্ষা করে? (What Qualities do Examinations Test ?) :

পরীক্ষার সংগে শিক্ষার অংগাংগী সম্পর্ক। শিক্ষা ব্যবস্থা রইলে তার পরিমাপ বা মূল্যায়ন থাকা চাই, আর তা-ই পরীক্ষা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শিক্ষা ও পরীক্ষা সম্বন্ধে যে স্তূপীকৃত সমালোচনার সংগে আমরা পরিচিত হই, তার অধিকাংশই আমাদের অজ্ঞতা প্রসূত। পরীক্ষা সম্বন্ধেও এমন অনেক কিছু দাবী করা হয়, যা পরীক্ষার উদ্দেশের পরিসীমার বাইরে। সুতরাং পরীক্ষা কি পরিমাপ করতে চায় এবং তাতে পরীক্ষার বর্তমান পদ্ধতি সার্থক কিনা, এবং পরীক্ষা কি পরিমাপ করতে ব্যর্থ হয়, এ সম্বন্ধে আমাদের সুসংহত ধারণা থাকা উচিত। এ সমস্যাকে আমরা তিনটি অংশে ভাগ করে আলোচনা করছি।

পরীক্ষা কি পরিমাপ করে? (ক) পরীক্ষা গ্রহণের দ্বারা মূলতঃ এবং প্রধানতঃ শিক্ষার্থীর শিক্ষণের অগ্রগতি পরিমাপ করা হয়। (খ) শিক্ষার্থীর কোথায় কোন ত্রুটি হয়েছে বা সে কেন পিছিয়ে পড়ে আছে তা পরীক্ষার মাধ্যমেই ধরা পড়ে। (গ) শিক্ষার্থীকে তার শিক্ষাগ্রহণ পরিচালনা করা, তার ভবিষ্যৎ জীবনে সহায়তা করাও পরীক্ষার উদ্দেশ্য। (ঘ) পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে যে শুধু শিক্ষার্থীর শিক্ষণের পরিমাপ করা যায় তা নয়, অনেক সময় শিক্ষকের শিক্ষাদানের সার্থকতাও পরিমাপ করা যায়। (ঙ) পরীক্ষা পদ্ধতি শিক্ষার্থীর মনে শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহ সৃষ্টি করে। শিক্ষার্থীর বিক্ষিপ্ত মনের উপর পরীক্ষা ব্যবস্থা এক ধরনের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (social control) রূপে কাজ করে। সুতরাং পরীক্ষা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত জীবন ও বিদ্যালয়-জীবনের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। পরীক্ষা দ্বারা শিক্ষক শিক্ষার্থীর আগ্রহ, তার মনের ওপর শিক্ষার প্রভাব ইত্যাদি পরিমাপ করতে পারেন।

অতএব দেখা যাচ্ছে, পরীক্ষার উদ্দেশ্য বা পরিমাপ প্রক্রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধতা বর্তমান। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব, তার জীবনের বহুবিধ আচরণ ইত্যাদি পরীক্ষা পরিমাপ করে না। এখন দেখা যাক্, পরীক্ষা যা পরিমাপ করতে চায়, তা কতকুটু সার্থকভাবে পরিমাপ করে?

পরীক্ষা কি যথাযথ পরিমাপ করে ? এখন প্রশ্ন হচ্ছে প্রচলিত পরীক্ষা কি শিক্ষার ফলাফল নির্ভরযোগ্য ও যথাযথভাবে পরিমাপ করে ? শিক্ষার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি কতটুকু সহায়ক ? শিক্ষার্থীর জীবনের ওপর পরীক্ষার প্রভাব কতটুকু ?

প্রথম প্রশ্ন সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য হল প্রচলিত রচনাধর্মী পরীক্ষা ব্যক্তি-সাপেক্ষ, মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। একই পরীক্ষক একই ধরনের প্রশ্নের খাতায় বিভিন্ন ধরনের নম্বর (marks) বিভিন্ন সময়ে দিয়ে থাকেন। বিভিন্ন পরীক্ষক সম্বন্ধে ত কথাই নেই। কারণ বিভিন্ন পরীক্ষক পরীক্ষার্থীর সাফল্য পরিমাপের বিভিন্ন বিভিন্ন মান (standard) প্রয়োগ করেন। দ্বিতীয়তঃ, পরীক্ষা যা পরিমাপ করার কথা তা অনেক ক্ষেত্রেই পরিমাপ করে না। পরীক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর লব্ধ জ্ঞান, তার বিচারবুদ্ধি পরিমাপ করা। কিন্তু কার্যতঃ পরীক্ষা শিক্ষার্থীর স্মরণ শক্তি পরিমাপ করে। শিক্ষার্থী মুখস্থ করে কতটুকু বিবৃত করল তার পরিমাপই পরীক্ষা করে থাকে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য হল, প্রচলিত পরীক্ষা শিক্ষার মোটেই সহায়ক নয়। সমাজ ও দেশের প্রয়োজনের পরিবর্তনের সংগে সংগে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের পরীক্ষাপদ্ধতি মিশরের মমির মত স্থির হয়ে আছে। যান্ত্রিকভাবে শিক্ষার্থীর মুখস্থ শক্তি বিচার করেই আমাদের পরীক্ষাপদ্ধতি ক্ষান্ত। পরীক্ষাদ্বারা একদল ছাত্রকে উত্তীর্ণ ও আর একদলকে অনুত্তীর্ণ ঘোষণা করেই শিক্ষার আয়োজন শেষ হয়। আধুনিক শিক্ষার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, শিক্ষা শিক্ষার্থীকে নির্বাচিত করে না, শিক্ষার সুযোগ থেকে একদলকে বঞ্চিত করার জন্য পরীক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত হয়নি, বরং শিক্ষা সকল স্তরে, সকলের জন্য ব্যাপ্ত। শিক্ষাবণ্টন (distribution of education) আধুনিক শিক্ষার লক্ষণ। যখন শিক্ষার সুযোগ সীমাবদ্ধ ছিল, কেবলমাত্র 'ভদ্রলোক'দের জন্য শিক্ষা নির্বাচিত ছিল, এ ধরনের পরীক্ষার হয়ত তখন একটা সার্থকতা ছিল। কিন্তু আধুনিক গণতান্ত্রিক শিক্ষায় এ ধরনের পরীক্ষার বিশেষ সার্থকতা নেই।

তৃতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে আমাদের অভিমত হল, এ ধরনের পরীক্ষাদ্বারা শিক্ষা পরীক্ষা-সর্বস্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষক শিক্ষার্থীর সকল ধ্যান ধারণা পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়। সহযোগিতার পরিবর্তে ছাত্রদের মধ্যে

প্রতিযোগিতা, হিংসা, হীনমন্যতা ইত্যাদি দেখা দেয়। ব্যক্তিগত বৈষম্য, শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতা ইত্যাদির কোন মূল্য স্বীকৃত হয় না। যারা পরীক্ষায় ব্যর্থ হল, তারা সকল নিন্দা ও অযোগ্যতার পাত্র হয়ে পড়ল। অন্য দিকে পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করে যারা কার্যক্ষেত্রে, বাস্তবজীবনে বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিতে পারল না, তারা জনসমক্ষে শিক্ষার অসার্থকতা প্রদর্শন করল। মূলতঃ এ দুই সমালোচনাই ভ্রান্ত।

অতএব দেখা যাচ্ছে, পরীক্ষা যা পরিমাপ করতে চায়, তা যথাযথভাবে পরীক্ষা করতে পারে না। পরীক্ষা শিক্ষার্থীর আগ্রহ, বিচারবুদ্ধি, লব্ধজ্ঞান, শিক্ষার অগ্রগতি কিছুই যথাযথভাবে পরিমাপ করতে পারে না।

পরীক্ষা কি পরিমাপ করতে ব্যর্থ হয়ঃ আমরা পরীক্ষার ওপর অহেতুক গুরুত্ব দিয়ে থাকি, কারণ আমরা অনেকেই মনে করি, পরীক্ষা ব্যক্তির জীবনের সার্থকতা বিচার করে, পরিমাপ করে। কিন্তু পরীক্ষা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, চরিত্র কিছুই পরিমাপ করে না। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের বিভিন্ন স্তরে যে বহুবিধ সম্ভাবনা দেখা দেয়, পরীক্ষা তা কখনই পরিমাপ করতে পারে না। এজন্য মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫২-৫৩ খ্রীঃ) শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবনের একটি সামগ্রিক রূপ বিবেচনা করার জন্য আমাদের দেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে ধারাবাহিক পরিমাপ পত্র (Cumulative Record Card) প্রবর্তন করার সুপারিশ করেছেন। এই ধারাবাহিক পরিমাপ পত্রে ব্যক্তির পারিবারিক পরিচয় থেকে শুরু করে তার বিদ্যালয় জীবনের সকল আচরণ, প্রবণতা, আগ্রহ, চাহিদা সবকিছু উল্লিখিত থাকবে। আসল কথা, পরীক্ষা জীবনের সার্থকতার কোন স্বাক্ষর বহন করে না। শিক্ষার একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ পরীক্ষার দ্বারা যাচাই করা হয়। শিক্ষার লক্ষ্য সামগ্রিক জীবন, পরীক্ষা কেবল অধীত বিদ্যা যাচাই করে তার বেশী কিছু নয়।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the merits and demerits of essay-type examination.
2. What are the new-type tests? What improvements they have made upon the essay-type examination?
3. Discuss the influence of Public Examination upon teaching.
4. What are the defects of the existing system of examination? How would you bring about reforms in the system?
5. What qualities do examinations test & What do they fail to test?

সপ্তদশ অধ্যায়

বুনিয়াদী শিক্ষা

(Basic Education)

আমরা ইতিপূর্বে গান্ধীজীর প্রস্তাবিত শিক্ষা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় আলোচনা করেছি। বুনিয়াদী শিক্ষা নানা পরিবর্তন ও পরীক্ষণের স্তর পেরিয়ে বর্তমানে একটি সার্থক শিক্ষানীতি বলে পরিগণিত হয়েছে। স্বাধীনতার পর ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাস বুনিয়াদী শিক্ষারই ইতিহাস। ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬ খ্রীঃ) বুনিয়াদী শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। অনেক সময় বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে যে সকল সমালোচনা শোনা যায়, তার বেশীরভাগই আমাদের অজ্ঞতাপ্রসূত। এজন্য আমরা সংক্ষিপ্তভাবে বুনিয়াদী শিক্ষার মূল প্রত্যয়গুলিকে সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রস্তাব করছি।

মহাত্মা গান্ধী স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যেই নতুন ভারত পরিকল্পনার কাজে হাত দেন। তিনি দেখলেন, একটি দরিদ্র দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার মধ্যেই সংগ্রাম শেষ হতে পারে না। দেশের আপামর জনসাধারণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তিসাধন চাই। আর এজন্য প্রয়োজন জাতীয় শিক্ষার। এ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে মহাত্মা গান্ধী তাঁর বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। এখন প্রশ্ন হল, মহাত্মা গান্ধী তদানীন্তন ভারতের গতানুগতিক শিক্ষাকে বর্জন করতে চেয়েছিলেন কেন? এ প্রশ্ন আলোচনা করলে, গান্ধীজীর শিক্ষাদর্শন সম্বন্ধে আমাদের ধারণা গঠন সহজ হবে।

(ক) **গান্ধীজী ও গতানুগতিক শিক্ষা (Gandhiji on traditional education):** (১) গান্ধীজী লক্ষ্য করেন যে দেশের আপামর জনসাধারণের সংগে গতানুগতিক শিক্ষার কোন মিল নেই। এ শিক্ষা শিক্ষার্থীকে তার পরিবেশ থেকে বিচ্যুত করে। গ্রামের ছেলে লেখাপড়া শিখে, গ্রাম ছেড়ে শহরমুখী হয়ে পড়ে। তার পরিবেশ ও মাতাপিতার জীবিকা এবং কর্মকে অবহেলার চোখে দেখে।

(২) গতানুগতিক শিক্ষা কেবলমাত্র তথাকথিত ভদ্রলোকদের সন্তান-সন্ততির জন্য কেন্দ্রীভূত ছিল, দেশের আপামর জনসাধারণের জন্য সে শিক্ষার কোন আয়োজন ছিল না।

(৩) গতানুগতিক শিক্ষা ছিল পুস্তককেন্দ্রিক, শিক্ষার্থীর জীবনের সংগে সম্পর্কহীন। শিক্ষার বিষয়বস্তুকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করে কৃত্রিম উপায়ে সে শিক্ষায় পরিবেশিত হয়।

(৪) গতানুগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও অশিক্ষিত শ্রেণী বলে দুটি শ্রেণীর সৃষ্টি করা হয়েছিল। শিক্ষার সামাজিক ও সর্বজনীন দিকটি সেদিন অনুপস্থিত ছিল।

(৫) গতানুগতিক শিক্ষার সংগে আমাদের জাতীয় জীবন ও সংস্কৃতির কোন সম্পর্ক ছিল না। বিদেশী সরকারের দ্বারা সাহায্য ও উৎসাহ প্রাপ্ত শিক্ষায় ইংরেজী ভাষা ও ইংরেজ সভ্যতার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করাই গতানুগতিক শিক্ষার লক্ষ্য ছিল।

(৬) কায়িক শ্রমের প্রতি অবজ্ঞা, ব্যক্তিমনে প্রতিযোগিতার ভাব সৃষ্টি করা, নিজের পরিবেশ ও পিতৃপুরুষের দৈন্য সম্বন্ধে সচেতন করা, সেদিনকার শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ছিল।

(৭) তাছাড়া, শিক্ষাব্যবস্থা এমন ছিল যা একমাত্র সংগতিসম্পন্ন ব্যক্তির সন্তান-সন্ততিরা গ্রহণ করতে পারে। দেশের দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে শিক্ষা অপাংক্তেয় ছিল।

এসব কারণে মহাত্মা গান্ধীর পক্ষে গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থাকে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতাদের মধ্যে জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সেদিন মহাত্মা গান্ধীই সবচেয়ে জোরালো ভাষায় প্রচার করেন এবং শিক্ষার একটি অভিনব পরিকল্পনা দেশবাসীকে উপহার দেন। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসের মত ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে মহাত্মাজীর নাম তাই স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

১৯৩৭ খ্রীঃ জুলাই মাসে 'হরিজন' প্রত্রিকায় মহাত্মা গান্ধী লিখলেন[1] "শিক্ষার দ্বারা আমি বুঝি; দেহ, মন ও আত্মার, শিশু ও ব্যক্তির সর্বমুখী সর্বোত্তম

1. "By education, I mean an all-round drawing out of the best in child and man—body, mind and spirit...Literacy itself is no education. I would, therefore, begin the child's education by teaching it a useful handicraft and enabling it to produce from the moment it begins its training. Thus every school can be made self-supporting, the condition being that the State takes over the manufactures of these schools."

—Harijan, July, 1937.

বিকাশ সাধন। কেবলমাত্র অক্ষরজ্ঞান শিক্ষা নয়। এজন্য আমি একটি প্রয়োজনীয় শিল্প শিক্ষাদ্বারা শিশুর শিক্ষা আরম্ভ করব এবং শিশুকে তার শিক্ষার শুরুতেই উৎপাদন-ক্ষম করে তুলতে সহায়তা করব। তার ফলে প্রতিটি বিদ্যালয় স্বনির্ভর হবে এই শর্তে যে রাষ্ট্র উৎপাদিত সামগ্রী ক্রয় করবে।"

মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবিত পরিকল্পনা যথাযথ রূপ লাভ করেনি। বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন স্তরে তার রূপ পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু গান্ধীজীর শিক্ষা নীতির মূল ধারাটি বজায় রাখা হয়েছে। শিক্ষার আর্থিক স্বনির্ভরতাকে বাদ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু স্বনির্ভরতাকে শিক্ষানীতি হিসেবে গ্রহণ করে কর্ম কেন্দ্রিক শিক্ষাই মেনে নেওয়া হয়েছে। এক্ষণে আমরা গান্ধীজীর শিক্ষা তথা বুনিয়াদী শিক্ষার মূল কথাগুলি ক্রমান্বয়ে বিবৃত করছি।

(খ) বুনিয়াদী শিক্ষার মূল কথা : (Fundamentals of Basic Education) : (১) বুনিয়াদী শিক্ষা শিশু কেন্দ্রিক : গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন শিশু যদি সক্রিয়তার সংগে শিক্ষা গ্রহণ না করে তবে সে শিক্ষা ব্যর্থ হতে বাধ্য। সমাজ ও দেশ গঠনের মূলে দেশের জনসাধারণ। সুতরাং শিক্ষা জীবন গঠনের সহায়ক হতে হবে। আর তা হতে গেলে শিক্ষা শিশুর জীবনকে কেন্দ্র করে চালিত হবে।

এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে যেহেতু গান্ধীজী শিক্ষার কেন্দ্রে একটি শিল্পকে রাখতে চেয়েছেন, সেহেতু শিক্ষায় শিশুর পরিবর্তে তার উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর উপরই গুরুত্ব পড়বে বেশী। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের উন্মেষ সাধনের চাইতে শিল্পের উৎকর্ষ সাধনের ওপরই শিক্ষক বেশী মনোযোগ দেবেন। এ সমালোচনার জবাবে ডঃ জাকির হোসেনের প্রতিবেদন লক্ষণীয়। ডঃ হোসেন বলেন, শিল্পকে শিক্ষা-অন্তিম (end of education) রূপে দেখার ফলে আমাদের এ ধরনের ভ্রান্তি ঘটে। শিল্পকে স্বনির্ভর ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ সাধনের সহায়ক (means) হিসেবেই গান্ধীজী দেখেছেন। শিল্পের শিক্ষামূলক দিকই বুনিয়াদী শিক্ষায় গৃহীত হয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক দিকটি গুরুত্ব লাভ করেনি।

(২) বুনিয়াদী শিক্ষা কাজের মাধ্যমে শিক্ষা : গান্ধীজী পুস্তক কেন্দ্রিক শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। পুস্তক কেন্দ্রিক শিক্ষা তথাকথিত 'ভদ্র লোক' সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে আয়োজিত ছিল। কায়িক পরিশ্রমের প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলা

প্রকাশ সেদিনকার সমাজের আভিজাত্যের লক্ষণ ছিল। গান্ধীজী এজন্য শিক্ষায় কায়িক পরিশ্রমকে স্থান দিতে চেয়েছেন। তাছাড়া সক্রিয়তা ও ইন্দ্রিয়ানুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষা গৃহীত না হলে শিক্ষা জীবনধর্মী হয়ে উঠতে পারে না। শিশুকে কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে, আর এ কাজ তার আগ্রহ, প্রবণতার দ্বারা নির্ধারিত হবে। কাজ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই শিশুকে নানা বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে হবে। পুস্তকের মাধ্যমে বক্তৃতা দিয়ে শিক্ষা না দিয়ে কাজ ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদত্ত হলে তা কার্যকরী; বাস্তবধর্মী এবং জীবনধর্মী হয়।

(৩) বুনিয়াদী শিক্ষায় জ্ঞান সমন্বয় সাধক সমগ্র: বুনিয়াদী শিক্ষায় জ্ঞানকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে জ্ঞানের অখণ্ডতা বা সামগ্রিকতা নষ্ট করা হয় না। গতানুগতিক শিক্ষা বিষয় কেন্দ্রিক (subject centred)। সেখানে জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়কে বিভিন্ন স্তরে বা শ্রেণীতে বিন্যস্ত করে শিক্ষা দেওয়া হয়। ফলে, বিষয় জ্ঞানই মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। জ্ঞান অবিভাজ্য এবং জীবনের সংগে জ্ঞানের যে স্বাভাবিক সম্পর্ক বর্তমান তার কোন ধারণা শিশু-মনে সৃষ্ট হয় না। এজন্য গান্ধীজী কোন শিল্পকর্মের মাধ্যমে অনুবন্ধ নীতির (Correlation) সহায়তায় বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেবার পক্ষপাতী। বুনিয়াদী শিক্ষা সামগ্রিক সংহতি পূর্ণ পাঠ্যসূচীর (Integrated Curriculum) প্রবর্তন করতে চায়। এ পাঠ্যসূচী একাধারে শিশুর পরিবর্তনশীল বিকাশোন্মুখ ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন চাহিদার সংগে এবং অন্যদিকে সদা পরিবর্তনশীল সামাজিক পরিবেশের সংগে সংহতি সাধন করবে।

(৪) বুনিয়াদী শিক্ষায় সক্রিয়তা উদ্দেশ্যমুখী ও উৎপাদনাত্মক: বুনিয়াদী শিক্ষায় শিশুর সক্রিয়তা নিছক উদ্দেশ্য বিহীন কর্মশীলতা নয়। সক্রিয়তা শিশুর জীবনধর্ম। শিক্ষায় এই সক্রিয়তাকে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এজন্য নির্বাচিত বা শিশুর আগ্রহ সঞ্চারক বিভিন্ন কর্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা বুনিয়াদী শিক্ষায় গ্রহণ করা হয়। সুতরাং বুনিয়াদী শিক্ষায় সক্রিয়তা উদ্দেশ্যমুখী। কিন্তু উদ্দেশ্যমুখী সক্রিয়তানীতি গ্রহণ করেই বুনিয়াদী শিক্ষা সমাপ্ত হয় না, এই সক্রিয়তা উৎপাদনাত্মকও হওয়া চাই। অর্থাৎ ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদনে এ সক্রিয়তাকে কাজে লাগান চাই। এতে প্রয়োজন মেটে, অর্থের জন্য শিক্ষা বন্ধ হয় না।

গান্ধীজীর শিক্ষানীতির মূলে শিল্প-কর্মকে রাখার যুক্তি এখানেই নিহিত। মোট কথা, বুনিয়াদী শিক্ষার মাধ্যম হবে শিল্প-কর্ম। শিল্প-কর্ম সকল স্তরে সকল বিষয় শিক্ষার কেন্দ্রে থাকবে। একটি বিশেষ শিল্পকে কেন্দ্র করে অনুবন্ধ নীতির সাহায্যে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষা দিতে হবে। শিল্প-কর্ম পাঠ্যসূচীতে কোন নতুন বিষয় সংযোজন নয়। গান্ধীজী শিল্পকে দৈহিক ও সামাজিক পরিবেশের স্বাভাবিক মিলন ক্ষেত্র হিসেবে দেখেছেন। শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষার মাধ্যমে শিশু যেমন সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন হবে, তেমনি জীবনপ্রস্তুতির শিক্ষাও লাভ করবে। তার দেহমন, পরিবেশ সমাজ থেকে বিচ্যুত হয়ে সে নিছক তত্ত্বীয় জ্ঞান মুখস্থ করবে না। জীবনের সংগে শিক্ষার সংহতি সাধন হবে।

সক্রিয়তা ভিত্তিক, কর্মকেন্দ্রিক, শিল্পকেন্দ্রিক হবার ফলে বুনিয়াদী শিক্ষায় কায়িক শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা সৃষ্টি হয়। নিজের হাতে কাজ করা আর কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা জীবন ধারণ করা আমরা হেয় চোখে দেখে থাকি। যারা পরের পরিশ্রমের ওপর বাঁচে তারা 'বড়লোক' বলে সম্মানিত নয়। কিন্তু গান্ধীজী যে ভবিষ্যৎ ভারতের পরিকল্পনা করেছিলেন সেখানে জাতিভেদ, কর্মভেদ নেই; শ্রেণীবৈষম্যহীন রামরাজ্যই ছিল গান্ধীজী পরিকল্পিত স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ সমাজের রূপে।

সুতরাং বুনিয়াদী শিক্ষা গৃহীত হলে এ আদর্শ সমাজে আমরা পৌঁছাতে পারব বলে গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন। ভারতের মত গরীবদেশে সামাজিক উন্নয়নে প্রচুর কায়িক পরিশ্রম প্রয়োজন। শিক্ষাব্যবস্থায় কায়িক পরিশ্রমকে অপাঙক্তেয় রেখে দেশের জনগণের কাছ থেকে তা আশাকরা যায় না। এজন্য গান্ধীজী কায়িক পরিশ্রমকে শিক্ষানীতি হিসেবে গ্রহণ করার পক্ষপাতী।

(৫) বুনিয়াদী শিক্ষা সমাজ উন্নয়ন ও প্রগতির সহায়ক ঃ মহাত্মা গান্ধীর পরিকল্পিত শিক্ষায় বিদ্যালয় গ্রামীন জীবন বা সমাজের সংগে সংযুক্ত। সাম্প্রদায়িক জীবনের সংগে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে থাকবে প্রতিটি বুনিয়াদী বিদ্যালয়। গ্রামের বা পরিবেশের সংগে বিদ্যালয়ের কর্মসূচীর সম্পর্ক থাকবে। গ্রামের সংস্কার কার্যে, সমাজের সমস্যা সমাধানে, আনন্দ উৎসবে প্রতিটি বিদ্যালয় কর্মকেন্দ্র হয়ে দাঁড়াবে। শিক্ষক ও ছাত্র সামাজিক দায়িত্বের নেতৃত্ব প্রদান করবে। গতানুগতিক শিক্ষায় ব্যক্তিগত উন্নতি ও উদ্যমকে গুরুত্ব দেওয়া

হয়। কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষায় সমবেত প্রচেষ্টা, সামাজিক উন্নতি সাধনকে লক্ষ্য বলে গ্রহণ করা হয়।

(৬) বুনিয়াদী শিক্ষা বিশ্ব শান্তির সহায়কঃ বুনিয়াদী শিক্ষা প্রতিযোগিতার, ব্যক্তিগত উৎকর্ষ সাধনের ওপর গুরুত্ব না দেবার ফলে পরস্পরের মধ্যে সমবেত কর্মপ্রচেষ্টা, সহায়তা ও সহানুভূতির মনোভাব জাগ্রত হয়। পরস্পরের মধ্যে বোঝা পড়া, কায়িক পরিশ্রম, শ্রমদান প্রভৃতির মাধ্যমে আদর্শ সমবায়মূলক সমাজের ভিত্তিভূমিই প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে অন্যের অধিকার কেড়ে নেওয়া, বৈরীভাব পোষণ করা, প্রতিযোগিতা দ্বারা অন্যকে বশকরা ইত্যাদি মনোভাব ব্যক্তিগত ও জাতীয় চরিত্র থেকে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়। আর এতে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জনগণ সহায়ক হয়। রাষ্ট্র নায়করা জনগনের দ্বারা পরিচালিত হয়। এই শিক্ষানীতির দ্বারা গান্ধীজী একটি সামাজিক বিপ্লব সৃষ্টি করেন। তিনি বিশ্বাস করেন শিক্ষা ও হিংসা পরস্পর বিরোধী। সার্থক শিক্ষা অহিংসার ওপর ভিত্তিশীল। বুনিয়াদী শিক্ষায় তাই সমবেত কর্ম প্রচেষ্টা, সহানুভূতি, পরিবেশ, সমাজ, দেশ প্রভৃতির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

প্রশ্নাবলী

1. Why does Gandhiji criticise traditional education ?
2. Discuss the fundamental ideas of Basic Education ?

অষ্টাদশ অধ্যায়

শিক্ষায় সক্রিয়তা নীতি

(Activity Principle in Education)

(ক) শিক্ষায় 'সক্রিয়তা' কেন ? (Why activity in education ?) : আধুনিক শিক্ষায় আমরা সক্রিয়তা নীতির কথা শুনে থাকি। গতানুগতিক মানসিক উৎকর্ষ সাধনের যে চেষ্টা চলত তাতে সক্রিয়তা নীতি অনুপস্থিত ছিল। বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করে পাঠ্যপুস্তক পঠন পাঠনের মধ্যে গতানুগতিক শিক্ষা সীমিত ছিল। প্রাচীন শিক্ষায় আবৃত্তি, স্মৃতিশক্তি দ্বারা নিষ্ক্রিয়ভাবে শিক্ষার্থী কতকগুলি জ্ঞান সংবাদ আহরণ করত—আর মানসিক শৃঙ্খলা লাভে উৎসাহিত হত। এর পরিণামে না বুঝে মুখস্থ করা, নকল করা, পরীক্ষা সহায়ক বাজারের নোট বই পড়া ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ শিক্ষার সংগে শিক্ষার্থীর অন্তরের চাহিদার, প্রবণতার কোন যোগ এতে নেই। শাস্তি ও পুরস্কার, নিন্দা ও প্রশংসা দ্বারা শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করার চেষ্টা হত। শিক্ষা হল পুস্তক থেকে জ্ঞান সংবাদ সংগ্রহ করা। শিক্ষার বিষয়বস্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে, শিক্ষার্থীর আগ্রহ সঞ্চারক বিষয় বস্তুকে বিচার করে গৃহীত হত না। এর ফলে শিক্ষা ও জীবনের মধ্যে পার্থক্যের এক প্রাচীর সৃষ্টি হল। ব্যক্তির চাহিদা, সামাজিক চাহিদা সবকিছু গতানুগতিক শিক্ষায় অস্বীকৃত হয়ে বাস্তব জীবনের সমস্যা থেকে শিক্ষা দূরে রইল।

আধুনিক শিক্ষা জীবন-কেন্দ্রিক ; জীবনের প্রকাশ বিচিত্র অভিজ্ঞতায়, বিভিন্ন অভিজ্ঞতা মানেই সক্রিয়তা। সক্রিয়ভাবে ব্যক্তি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় না করলে তার জীবনের বহুমুখী প্রকাশ ও ব্যক্তিত্ব সম্ভব নয়। সুতরাং জীবনের সংগে শিক্ষার সংযোগ সাধন সক্রিয়তার দ্বারাই সম্ভব। তাই আধুনিক শিক্ষায় সক্রিয়তানীতিকে অপরিহার্য বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

(খ) সক্রিয়তা নীতির অর্থ (Meaning of activity principle) : শিক্ষায় সক্রিয়তা বলতে বোঝায় ; শিক্ষা বাস্তব মূর্ত অভিজ্ঞতা এবং কোন উৎপাদনাত্মক সৃজনশীল কাজের মাধ্যমে প্রদান করা। যে অভিজ্ঞতা সংগ্রহে ও

কাজ সম্পাদনে শিশু তার আগ্রহ, চাহিদা, প্রবণতা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হবে, শিক্ষায় সে সব অভিজ্ঞতা ও কর্মকে গ্রহণ করাই সক্রিয়তা নীতির তাৎপর্য।

সক্রিয়তা আমাদের জীবন ধর্ম। সক্রিয়তাকে বাদ দিলে আমরা পংগু জীবনবিমুখ। শিক্ষায় সক্রিয়তাকে বাদ দিলে শিক্ষা জীবন বিরোধী।

আধুনিক শিক্ষা শিশু কেন্দ্রিক, জীবন কেন্দ্রিক। এর অর্থ কি? এর অর্থ শিক্ষা হল শিশুর ব্যক্তিত্ব-বিকাশ প্রক্রিয়া; বাস্তব পরিবেশ ও সমাজের সংগে ক্রমবর্ধমান সংগতি সাধন—আর এ সম্ভব শিশু যখন সক্রিয় হয়ে তার পরিবেশ ও সমাজ, তার অন্তরের তাড়না, নোদনা, চাহিদা, আগ্রহ, প্রবণতা প্রভৃতির প্রতি প্রতিক্রিয়া করে। অর্থাৎ শিশু কেন্দ্রিক বা জীবন কেন্দ্রিক শিক্ষার গোড়ার কথা হল শিশুকে স্বীকৃতি দেওয়া—পাঠ্য-পুস্তক বা জ্ঞান সংবাদ আহরণকে গুরুত্ব দেওয়া নয়। আর শিশুকে স্বীকৃতি দেওয়ার অর্থ তার আপন সক্রিয়তাকে মেনে নেওয়া। এ অর্থে শিশু-শিক্ষা সক্রিয়তা নীতির নামান্তর। এজন্য মাদাম মণ্টেসরী শিক্ষাকে আত্ম-সক্রিয়তা বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

সক্রিয়তার মধ্যেই জীবনের প্রকাশ। যা কিছু শিশুকে সক্রিয় করে তোলে তার প্রতি শিশুর আবেদন বেশী। এজন্য শিশু সদা চঞ্চল, সদা কর্মমুখর। তার ইন্দ্রিয়ানুশীল বিভিন্ন সক্রিয়তার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। ফলে সে তার পরিবেশ ও সমাজের মধ্যে একটি সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়। বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে তার জীবনের আগ্রহ দেখা দেয়। সকল স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ, সহজাত প্রবৃত্তি, আগ্রহ ও চাহিদাকে কেন্দ্র করে শিশুর অহংবোধ কর্মমুখর ও সক্রিয় হয়ে ওঠে। আর বিভিন্ন সৃজনশীল কাজের মাধ্যমে তার দৈহিক, মানসিক ও কল্পনা শক্তি উৎসারিত হতে থাকে। শিক্ষায় এসব অস্বীকার করলে শিশুর জীবনকেই অস্বীকার করা হয়। শিক্ষায় তাই সক্রিয়তাকে একটি নীতি হিসেবে গ্রহণ করে শিশুর অজস্র কর্ম প্রবাহকে ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে প্রধাবিত করা উচিত—যাতে শিশু বিভিন্ন অভ্যাস, প্রবণতা ও আদর্শ সংগঠনের দ্বারা নিজেকে সমাজ জীবনে, বাস্তব পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

(গ) সক্রিয়তা নীতির তাৎপর্য (Significance of activity principle)

আধুনিক শিক্ষায় সক্রিয়তা নীতির গুরুত্ব যেমন অসীম, তাৎপর্য তেমনি ব্যাপক। নানা ভাবধারার সম্মিলনে সক্রিয়তা নীতি গভীর তাৎপর্য লাভ করেছে—

দার্শনিক, সমাজতাত্ত্বিক, মনোবৈজ্ঞানিক ও শিক্ষামূলক দিক থেকে এ তাৎপর্যকে ব্যাখ্যা করা চলে।

(১) দার্শনিক ঃ প্রয়োগবাদী (Pragmatist) এবং মানবতাবাদী (humanist) দর্শন সক্রিয়তা নীতির স্বীকৃতির মূলে কাজ করেছে। যা কিছু জীবনের অভিজ্ঞতার সঞ্চারক, যা জীবনের অভিজ্ঞতার সংস্কার ও পুনর্গঠনের সহায়ক তাকে শিক্ষার স্থান দিতে চায় প্রয়োগবাদী দর্শন। কারণ শিক্ষা হচ্ছে অভিজ্ঞতার সংস্কার ও পুনর্গঠন। মানবতাবাদীদর্শন যা কিছুর মধ্যে মানবিক আবেদন বর্তমান, তাকে শিক্ষায় গ্রহণ করার পক্ষপাতী। আপন পরিবেশ ও অহংবোধকে কেন্দ্র করেই মানবিকতাবোধ জাগ্রত হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সক্রিয়তা নীতি ছাড়া শিক্ষায় অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন, কার্যকরী অভিজ্ঞতা সঞ্চয়, মানবিক আবেদন গ্রহণ, কোন কিছুই সম্ভব নয়।

(২) সমাজতাত্ত্বিক ঃ সক্রিয়তা নীতির মূলে সমাজ তাত্ত্বিক যুক্তি হল একমাত্র সক্রিয়তার দ্বারাই শিক্ষার্থী সামাজিক সত্ত্বা (Social self) লাভ করতে পারে। সক্রিয়তা ভিত্তিক পাঠ্যসূচী গৃহীত হলে তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীর মধ্যে যে পার্থক্য বর্তমান তা তিরোহিত হবে। সক্রিয়তা নীতি মেনে নিলে শিক্ষার্থী তার সকল কর্মপ্রেরণা সামাজিক প্রয়োজনীয় বা সমাজ অভিপ্রেত কাজে নিয়োজিত করবে। মহাত্মা গান্ধী এজন্য তাঁর বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনার শিল্প তথা কর্মকে স্থান দিয়ে সমবায় মূলক সমাজ সংগঠনের কথা বলেছেন। অর্থনীতিক দিক থেকে বিবেচনা করলে শিক্ষায় সক্রিয়তা নীতির দ্বারা আমরা শিক্ষার্থীর উৎপাদনাত্মক যোগ্যতা বৃদ্ধি করাতে পারি। সকল কর্ম প্রচেষ্টা তখন ব্যক্তিগত উৎকর্ষ সাধনের সীমা পেরিয়ে সমাজাভিমুখী হবে। বিদ্যালয় ও সমাজ, শিক্ষা ও জীবনের মধ্যে সক্রিয়তাই সেতুবন্ধন করবে।

(৩) মনোবৈজ্ঞানিক ঃ আধুনিক মনোবিজ্ঞান দেখিয়েছে, শিশু সদাসক্রিয়। তার নিজস্ব সমস্যা আছে, চাহিদা, আগ্রহ ও প্রবণতা আছে। এগুলিকে শিক্ষায় স্থান না দিলে তার সক্রিয়তাকে অস্বীকার করা হয়। বাস্তব মূর্ত কর্মশীলতার মধ্যে শিশুর সক্রিয়তা প্রকাশিত হয়। আর সক্রিয়তার দ্বারা শিশুর শিক্ষা জীবনধর্মী হয়। গতানুগতিক শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের উদ্‌ঘাটিত এ সত্য স্বীকৃত হয়নি। ইন্দ্রিয়ানুশীলন, অভিজ্ঞতা ও কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যসূচী গতানুগতিক শিক্ষায় স্থান পায়নি। কেবল মানসিক শৃংখলা ও উৎকর্ষ সাধন সে শিক্ষার

উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের নিরন্তর গবেষণার ফলে আজ আমরা দেখতে পেয়েছি যে দেহকে বাদ দিয়ে মনের উৎকর্ষ সাধন জীবনকে বঞ্চনা করা মাত্র। দেহ ও মনের সমবায়ে ব্যষ্টির জীবনবোধ, ব্যক্তিত্ববোধ সৃষ্টি হয়। তার স্বাভাবিক চাহিদা, দেহ ও মনের আবেদন অস্বীকৃত হলে বহু বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেয়। ব্যক্তি চরিত্র স্বাভাবিক, স্বনির্ভর না হয়ে পরনির্ভর এবং অপটু হয়ে পড়ে। সামাজিক শক্তি হিসেবে শিক্ষা কাজ করতে পারে না। সুতরাং সক্রিয়তা নীতি শিক্ষার একটি অপরিহার্য স্বাভাবিক নীতি।

(৪) শিক্ষামূলক : আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বে জ্ঞান কতকগুলি পুঁথিগত সংবাদ আহরণ নয়। ব্যক্তিগত জীবনে, সামাজিক জীবনে জ্ঞান একটি শক্তি (power) রূপে কাজ করে। আর তা সম্ভব যখন আমরা শিক্ষাকে বাস্তব অভিজ্ঞতার জ্ঞান আহরণ ও বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য বিধান বলে গণ্য করি এবং অন্য দিকে আমাদের সংগেও অভিজ্ঞতার সম্পর্ক নির্ণয় করি। অর্থাৎ শিক্ষা কেবলমাত্র বুদ্ধির অনুশীলন নয়—শিক্ষা ইন্দ্রিয়ানুশীলনও। বিদ্যালয়ে তাই শিশুর জীবন ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক অভিজ্ঞতার, কর্মানুষ্ঠানের আয়োজন থাকা চাই। শিক্ষার্থী তার আপন চাহিদা, আগ্রহ ইত্যাদি অনুসারে স্বতঃস্ফূর্ত নানা কাজে ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে ব্রতী হবে। সক্রিয়তা নীতি শিশুর সহজাত প্রবণতা, চাহিদা এবং দেহ ও মনের স্বাভাবিক গতিকেই স্বীকৃতি দেয় বলে আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব সক্রিয়তা নীতিকে একটি গুরুত্ব পূর্ণ স্থান দিয়েছে।

(ঘ) খেলা ভিত্তিক শিক্ষা ও সক্রিয়তা নীতি (Play-way education & Activity Principle) : খেলা শিশুর স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ। খেলাকে জীবনের প্রস্তুতি, বাড়তি শক্তির প্রকাশ যে ভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক্ না কেন, খেলা শিশুর কাজে আনন্দপূর্ণ স্বাভাবিক সক্রিয়তা। অর্থাৎ খেলা শিশুর আত্মসক্রিয়তা। খেলার স্বতঃস্ফূর্ততাকে শিক্ষায় গ্রহণ করাই খেলা ভিত্তিক শিক্ষা। খেলায় শিশু স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে যেমন সক্রিয় তেমন তাকে শিক্ষা গ্রহণ সক্রিয় করে তোলাই খেলাভিত্তিক শিক্ষার উদ্দেশ্য। খেলাভিত্তিক শিক্ষায় শিশুর ক্রীড়ামূলক সক্রিয়তাকে শিক্ষামূলক করে তোলা হয়। শিক্ষার উপাদান ও শিক্ষার বিষয়বস্তুকে শিশুর খেলার সংগে সংযোজিত করে শিক্ষা পরিচালনা করা হয়।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে খেলা ও সক্রিয়তার মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। খেলাভিত্তিক শিক্ষানীতি এবং সক্রিয়তা নীতি উভয়ই শিক্ষাকে স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত করে তুলতে চায়। খেলাভিত্তিক শিক্ষায় শিশু যখন খেলে তখন সে কাজ করে, শিক্ষা গ্রহণ করে; আর সক্রিয়তা ভিত্তিক শিক্ষায় শিশু যখন কাজ করে, সক্রিয় হয় তখন খেলে। খেলাভিত্তিক শিক্ষা সক্রিয়তা নীতির সাহায্য নেয়, আর সক্রিয়তা ভিত্তিক শিক্ষা খেলাভিত্তিক শিক্ষাকে গ্রহণ করে। উভয় পদ্ধতিই শিশুর চাহিদা, আবেগ, আগ্রহ প্রভৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এজন্য ফ্রয়েবেল, মণ্টেসরী, পেস্টালৎসী ডিউই, কিলপ্যাট্রিক প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্ শিক্ষায় যুগপৎ সক্রিয়তা ও খেলাভিত্তিক শিক্ষানীতির গুরুত্ব দিয়েছেন।

উভয় শিক্ষানীতির মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য না রইলেও প্রয়োগগত দিক থেকে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। খেলাভিত্তিক শিক্ষায় শিশুর প্রকৃতিগত ও স্বতঃস্ফূর্ত ক্রীড়া-সক্রিয়তা থেকে শিক্ষা শুরু করা হয়; অর্থাৎ শিশুর সামনে বাস্তব বা কল্পনার খেলার সামগ্রী উপস্থিত করা হয়, কিন্তু সক্রিয়তা ভিত্তিক শিক্ষায় এ ধরনের কোন কল্পনার স্থান নেই। যে মূর্ত ও বাস্তব কর্মে শিশু আগ্রহী, সে উৎপাদনাত্মক কর্ম থেকেই শিক্ষা শুরু হয়।

(ঙ) সক্রিয়তাভিত্তিক পাঠ্যসূচী ও সক্রিয়তাভিত্তিক শিক্ষাপদ্ধতি (Activity Curriculum and Activity Metho): মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫২-৫৩ খ্রীঃ) শিক্ষায় সক্রিয়তানীতির গুরুত্ব প্রসংগে বলেছেন, "যদি আত্মসক্রিয়তার পথ গ্রহণ করা হয়, যদি কর্ম-পরিকল্পনায় কল্পনাশক্তি এবং কর্মসম্পাদনে স্বাধীনতা থাকে; তবে বর্তমান পুস্তককেন্দ্রিক বিদ্যালয়গুলি 'কর্ম-ভিত্তিক বিদ্যালয়' বা 'সক্রিয়তাভিত্তিক বিদ্যালয়ে' রূপান্তরিত হতে পারে এবং এগুলি শিশুর সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব বিকাশের সঠিক শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হবে।"[1]

1. "If self-activity approach is adopted, if there is imagination in planning work and freedom in its execution, the present bookish schools can be transformed into 'work schools' or 'activity schools', and they can become genuine centres of education for the whole personality of the child."

Report of the Secondary Education Commission,
—Chap. VII Page 87.

এর অর্থ হল আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যবহারিক জ্ঞান বা কর্ম এবং উৎপাদনাত্মক কর্ম উপযুক্ত গুরুত্ব লাভ করতে হবে। প্রতিটি বিষয় শিক্ষা দেবার সময় তত্ত্বীয় দিকটির ওপর গুরুত্ব না দিয়ে ব্যবহারিক ও বাস্তব দিকটির ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। অর্থাৎ শিক্ষা-পরিকল্পনায় সক্রিয়তানীতির সর্বাত্মক প্রয়োগ চাই।

শিক্ষায় সক্রিয়তানীতির প্রয়োগ দুভাগে করা যেতে পারে যদিও এ বিভাজন পরস্পর নির্ভরশীল এবং বাস্তবক্ষেত্রে একই সংগে প্রযোজ্য। তবুও সক্রিয়তা-নীতির সংব্যাখ্যানে এ বিভাজন আমাদের সহায়তা করবে বলে আমরা সক্রিয়তা-নীতিকে দুটি স্তরে বিভক্ত করে আলোচনা করছি।

সক্রিয়তানীতিকে সক্রিয়তা-পাঠ্যসূচী (ctivity curriculum) এবং সক্রিয়তা-পদ্ধতি (activity method) এ দুভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। সক্রিয়তা-পাঠ্যসূচী সক্রিয়তাভিত্তিক (activity-based) পাঠ্যসূচী বা সক্রিয়তা কেন্দ্রিক (ctivity centred) পাঠ্যসূচী হতে পারে। এ উভয় পাঠ্যসূচীর মূল কথা হল কাজের মাধ্যমে শিক্ষা (earning by doing)। সক্রিয়তা ভিত্তিক পাঠ্যসূচীতে বহু বাস্তব (al) ও মূর্ত (concrete) কর্মের আয়োজন করা হয়। শিশু শিক্ষাগ্রহণের সময় এসব কর্মে নিয়োজিত হয়ে তার উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধি করে, বাস্তব কর্ম-সম্পাদনের সমস্যা নিরসন করতে শেখে। এ ধরনের পাঠ্যসূচীতে বিভিন্ন ধরনের কর্মের আয়োজন করা হয়। কোন একটি বিশেষ কর্মকে স্থান দেওয়া হয় না। প্রতিটি বিষয়কে কতকগুলি পুস্তকে সীমাবদ্ধ রেখে বক্তৃতা ও নোট দিয়ে শিক্ষাপ্রদান না করে শিক্ষার বিষয়বস্তুকে কতকগুলি 'প্রজেক্ট' বা সমস্যায় সংগঠিত করা হয়। শিক্ষার্থী শিক্ষা সমাপনান্তে বাস্তব জীবনে প্রবেশ করে বহু সংগ্রাম ও সমস্যার সংগে শুধু পরিচিত হবে না, সেগুলির সমাধান করতে হবে বেঁচে থাকবার জন্য। এজন্য সক্রিয়তা ভিত্তিক পাঠ্যসূচীতে বিষয়-শিক্ষার (ubject learning) চাইতে কর্ম সম্পাদনের শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপিত হয়। আমেরিকার প্রখ্যাত দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ্ জন ডিউই তাঁর পরিকল্পিত শিক্ষায় সক্রিয়তাভিত্তিক পাঠ্যসূচীর প্রবর্তন করেন এবং শিক্ষায় সক্রিয়তানীতির সার্থক প্রয়োগ সাধন করে আমেরিকার শিক্ষাজগতে তিনি এক অভিনব বিপ্লব সৃষ্টি করেন। [এ প্রসংগে ডিউইর শিক্ষাদর্শন দ্রষ্টব্য।]

সক্রিয়তাভিত্তিক পাঠ্যসূচীতে বিভিন্ন কর্মের আয়োজন করে তাদের মধ্যে একটি অনুবন্ধ (correlation) সৃষ্টি করে শিক্ষা প্রদান করা হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫২-৫৩ খ্রীঃ) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের যে পাঠ্যসূচী পরিকল্পনা করেছেন তা সক্রিয়তাভিত্তিক পাঠ্যসূচী। পাঠ্যসূচীর সংগে সহপাঠ্যসূচী কর্মগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে কমিশন বিদ্যালয়কে কর্মভিত্তিক বিদ্যালয়ে পরিণত করতে চেয়েছে। বিষয়বস্তু শিক্ষাপ্রদানে ব্যবহারিক কর্ম সম্পাদনের ওপর কমিশন গুরুত্ব দিয়েছেন।

সক্রিয়তাকেন্দ্রিক পাঠ্যসূচীর কেন্দ্রে একটি নির্দিষ্ট শিল্প বা উৎপাদনাত্মক কর্ম সংযোজিত হয়। সক্রিয়তাভিত্তিক পাঠ্যসূচীর মত এখানে বিভিন্ন ধরনের কর্মের অবতারণা করা হয় না। কোন নির্দিষ্ট কর্মকে কেন্দ্র করে বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। অর্থাৎ সক্রিয়তাভিত্তিক পাঠ্যসূচীতে বিভিন্ন কর্মের মধ্যে যেখানে সমন্বয় বা অনুবন্ধ নীতি গ্রহণ করা হয়, এখানে একটি শিল্প বা কাজের প্রতি শিক্ষা প্রদানকে কেন্দ্রীভূত (concentration) করা হয়। মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা সক্রিয়তা কেন্দ্রিক, কর্ম কেন্দ্রিক। একটি বিশেষ শিল্পকে মহাত্মা গান্ধী শিক্ষার কেন্দ্রে রাখতে চেয়েছেন এবং তিনি চরকাকে স্থান দেবার পক্ষপাতী ছিলেন। এই বিশেষ শিল্পকে কেন্দ্র করে অনুবন্ধ নীতি অবলম্বন করে অন্যান্য বিষয় ক্রমান্বয়ে শিক্ষা দেবার কথা তিনি বলেছেন।

একটি বিশেষ শিল্পকে কেন্দ্রে রাখার এই অর্থ নয় যে একটি শিল্পে পারদর্শী কতকগুলি কারিগর সৃষ্টি করা। কেন্দ্রীয় শিল্পের শিক্ষামূলক দিকটিই এখানে উল্লেখযোগ্য। চরকাকে কেন্দ্রে রেখে অংক, ভূগোল, ভূবিদ্যা, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতি সহজভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় বলেই গান্ধীজী 'চরকা'কে কেন্দ্রীয় শিল্প হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া এ শিল্প বাস্তব ও ব্যবহারিক জীবনেও সহায়ক এবং শিক্ষার্থীর আগ্রহ সঞ্চারক।

সক্রিয়তা-পাঠ্যসূচীর মত সক্রিয়তা শিক্ষাপদ্ধতির মূলকথা হল কাজের মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ। সক্রিয়তা পদ্ধতিতে কেবলমাত্র মানসিক বা বুদ্ধিগত চর্চার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না। সক্রিয়তা পদ্ধতি বলতে কোন বিশেষ কাজকে হাতেকলমে শিক্ষা দেবার কথা বোঝায়—যে কাজ সম্পাদনে শিক্ষার্থীর দেহ ও

মন সক্রিয় হয়, যে কাজের আবেদনে সে সক্রিয় হয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে। পুস্তক পাঠের মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় হয়ে শ্রেণীকক্ষে বসে শিক্ষাগ্রহণ করার সংগে শিক্ষার্থীর কোন বাস্তব সম্পর্ক থাকে না। এজন্য সক্রিয়তাপদ্ধতিতে বাস্তব কর্ম সম্পাদনে গুরুত্ব প্রদান করা হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫২-৫৩ খ্রীঃ) এ প্রসংগে বলেন, "প্রতিটি বিষয় শিক্ষা দেবার সময় শিক্ষার্থীকে তার লব্ধ জ্ঞানকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার সুযোগগুলি দিতে হবে।"[1] যেমন ভূগোল শিক্ষা দেবার সময় মানচিত্র, নমুনা (model) অংকন, আবহাওয়ার নির্ঘণ্ট প্রস্তুত, বিভিন্ন জায়গা ভ্রমণ প্রভৃতি কর্মের অবতারণা করে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। ইতিহাস শিক্ষা দেবার সময় ওপরের কাজগুলি ছাড়া ঐতিহাসিক নাটক করা, বিভিন্ন যুগের পোশাক-পরিচ্ছদ প্রস্তুত করা, সমবেতভাবে স্থানীয় সমাজের ইতিহাস অনুসন্ধান করা ইত্যাদি কর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করা যেতে পারে। আধুনিক শিক্ষায় সক্রিয়তানীতি গ্রহণ করার ফলে গতানুগতিক শিক্ষার মত বিষয়বস্তুর আয়োজনে গুরুত্ব দেওয়া হয় না—গুরুত্ব দেওয়া হয় শিক্ষা পদ্ধতির ওপর। কি শিখল তার চাইতে কিভাবে শিক্ষক শিক্ষা দিলেন তার গুরুত্বই এখন বেশী।

(চ) সক্রিয়তানীতির সমালোচনা (Criticism of Activity Method): গতানুগতিক শিক্ষায় তত্ত্বীয় জ্ঞান অর্জনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হত, কিন্তু আধুনিক শিক্ষায় সক্রিয়তানীতির ওপর গুরুত্ব দিয়ে ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জনের কথা বলা হয়। কিন্তু এ প্রসংগে আমাদের স্মরণ রাখা উচিত তত্ত্ব ও প্রয়োগ (theory and practice) ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এককভাবে কোনটির ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। এজন্য মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫২-৫৩ খ্রীঃ) সহপাঠ্যসূচীর কার্যাবলীর ওপর গুরুত্ব দিয়ে তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিকজ্ঞানের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বিধান করেছেন।

শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুসারে কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কর্মে তাকে নিয়োজিত করলে তার শিক্ষা সংকীর্ণ হয়ে পড়তে পারে। যে সীমাবদ্ধ ছাত্রজীবন সে বিদ্যালয়ে

1. '.. ...in the teaching of every subject, opportunities should be afforded for pupils to apply practically the knowledge that has been acquired by them.'
—Report of the Secondary Education Commission, Chap VII Page 87.

অতিবাহিত করে সে সময়গুলিতে তাকে অনেককিছু সম্বন্ধে জ্ঞান সংগ্রহ করতে হয়। আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার জটিল জীবনে সকল বিষয়কে সক্রিয়তার মাধ্যমে শিক্ষার আয়োজন করা সম্ভবপর নয়।

শিক্ষার দ্বারা প্রাচীন সংস্কৃতি ও কৃষ্টির সংগে আমরা পরিচিত হই। যুগ যুগ ধরে মানুষের সঞ্চিত ভাবরাশি ও অভিজ্ঞতার সংগে শিক্ষার্থীর পরিচিতি না ঘটলে সে তার সংস্কৃতির ভিত্তি ভূমি হারিয়ে ফেলে। সেখানে পুস্তককেন্দ্রিক শিক্ষা বা তত্ত্বীয় আলোচনাই শ্রেয়।

প্রশ্নাবলী

1. Why are craft and creative activities forming part of school curricula? Indicate the educational value of knowledge correlated to natural activities of children.

2. What do you mean by an 'activity curriculum?

3, State briefly the significance of the activity principle in education.

ঊনবিংশ অধ্যায়

বিদ্যালয় ধারণা এবং বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয়

(School Idea and Types of School)

১। শিক্ষা ও আদিম মানুষ (Education and the Savage man) :

ব্যাপক অর্থে শিক্ষা অভিজ্ঞতার দ্বারা আচরণের অভিপ্রেত পরিবর্তন ও পরিবেশের সংগে সংগতিসাধন। এ অর্থে মানবজাতির ইতিহাস ও শিক্ষার ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু মানব সভ্যতার আদিম স্তরে না ছিল কোন শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষক, ছাত্র বা বিদ্যালয়। প্রকৃতির আবেদনে মানুষ সাড়া দিত—নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টায় প্রকৃতির সংগে সংগতি বিধানের চেষ্টা করত।

আদিযুগের মানুষের জীবনে কোন নিরপত্তা ছিল না, সাধারণ পশু প্রাণীর মত মানুষ ছিল বর্বর। কেবলমাত্র বেঁচে থাকবার উদ্দেশ্যে প্রকৃতির সংগে নিরন্তর সংগ্রামে সে ব্যস্ত থাকত। কি ভাবে প্রচণ্ড শক্তিশালী প্রকৃতির রাজ্যে বাস করতে হয় তার কতকগুলি অভিজ্ঞতা আকস্মিক ও অসচেতনভাবে মানুষ সংগ্রহ করে থাকত। বর্বর যুগের মানুষের অভিজ্ঞতা গ্রহণ ছিল রীতিধারা বহির্ভূত। জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কি কি প্রতিক্রিয়া করতে হবে; এ সব বিষয়ের চিন্তা ও কল্পনা আদিম যুগের মানুষের ছিল না। আসল কথা প্রকৃতির অধীনে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টাই সেদিনকার মানুষের একমাত্র ধ্যান ছিল। প্রকৃতির নিয়ম কানুন তাদের জানা ছিল না—প্রকৃতির প্রতি প্রতিক্রিয়া (reflect) করার মত বুদ্ধি বিকাশ আদিম মানুষের হয়নি। বেঁচে থাকার সংগ্রাম ছাড়া কোন ব্যাপারে সংঘবদ্ধ জীবনের প্রকাশ সভ্যতার আদিম স্তরে ছিল না। সমস্যা সমাধানে, কর্মসম্পাদনে প্রচেষ্টা ও ভ্রান্তি (trial and error) পদ্ধতি তারা গ্রহণ করত। ভাষার যথাযথ প্রয়োগ, লেখ্য ভাষার প্রচলন, সামাজিক চলাচল ভাববিনিময়, অভিজ্ঞতার সংস্কার ও পুনর্গঠন সেদিন সম্ভব ছিল না। সুতরাং শিক্ষার কোন আয়োজন আদিম সমাজে ছিল

কল্পনাতীত। বিদ্যালয় সংগঠনের কোন প্রশ্নই সেখানে উঠেনি। মানব শিক্ষা ছিল পরিবেশ বা বিশ্ব প্রকৃতির সহিত কোন না কোন ভাবে সংগতি স্থাপন করা। মানব সভ্যতার আদিম যুগের শিক্ষাকে এজন্য রীতিবর্জিত পরিবেশ গত শিক্ষাস্তর বলে অভিহিত করা যায়।

২। আনুষ্ঠানিক শিক্ষাস্তর (Formal Stage of Education) :

ইতিহাসের বহু শতাব্দী পেরিয়ে মানুষ ধীরে ধীরে তার বাহ্যিক পরিবেশের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে শিখল। জীবন সংগ্রামের জন্য, পরিবেশের ওপর নিজের কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য সে নানা ধরনের কৌশল আয়ত্ব করতে লাগল। আত্মরক্ষা, খাদ্যসংগ্রহ, দলবদ্ধ হয়ে বসবাস প্রভৃতি নিয়ে নানা রীতিনীতি সৃষ্টি হতে শুরু করল। মানুষ কাঠ, পাথর, ধাতু প্রভৃতি দিয়ে নানা অস্ত্র তৈরী করতে শিখে নিল, তাতে তার আত্মরক্ষা কিছু সহজ হল, প্রাণী হত্যা করে খাদ্য সংগ্রহ করা সহজ হল। আর এতে তারা শিখল গোষ্ঠী (tribe) হয়ে বাস করা অনেক নিরাপদ। সভ্যতার আদিম স্তর পেরিয়ে মানুষ যেন তার সভ্যতার শৈশবে প্রবেশ করল। সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ব্যবহার কিছুটা সে করতে শিখেছে, প্রথা, বিশ্বাস প্রভৃতির দ্বারা মানুষ তার আচরণকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে শিখেছে। কিন্তু সভ্যতার এ শৈশবস্তরে মানুষ বিশ্বাস করত প্রকৃতির সর্বস্তরে প্রাণ বর্তমান। এ বিশ্বাস সর্বপ্রাণবাদ (animism) বলে অভিহিত হয়। সেদিন মানুষ ভাবত বিশ্বচরাচরে যা আছে তা তারই মত প্রাণসত্ত্বামূলক। এ ধারণা থেকে জড়োপাসনার উদ্ভব। আর সকল বস্তুর, সকল প্রাণীর পেছনে রয়েছে অদৃশ্য অশরীরী সত্ত্বাগুলি (spirits)। এ সত্ত্বাগুলিকে মানুষের সন্তুষ্ট করে রাখতে হয় তা না হলে এদের অভিশাপে মানব জীবন বিপর্যস্ত হয়। মহামারী আসে, প্লাবন আসে, মাঠে চাষ হয় না, বজ্রপাত ঘটে ইত্যাদি। এ সময়ে বয়স্করা অপরিণতদের জীবন ধারণের জন্য তাদের লব্ধ অভিজ্ঞতা প্রদান করতে শুরু করল। নিজ নিজ আশ্রয়স্থল বা গৃহে সমবেত লোককে বয়স্করা তাদের অভিজ্ঞতা বিতরণ করে জীবনের নানা কৌশল ও বেঁচে থাকার নানা অভিজ্ঞতা শিক্ষা দিতে লাগল। অর্থাৎ এ সময়ে অন্ততঃ কিছুটা সচেতনভাবে মানুষ তার

উত্তরসূরীদের তার সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও মতামত প্রদান করাকে গোষ্ঠীজীবন ও ব্যক্তিজীবনের সহায়ক বলে মনে করল। আদিম মানুষের নিকট বিশ্ব-প্রকৃতি ছিল বিদ্যালয়, জীবনের' বিভিন্ন অপ্রতিকূল পরিবেশ ছিল তার শিক্ষক, আর প্রচেষ্টা ও ভ্রান্তি ছিল শিক্ষা পদ্ধতি। এরকম একটি উপমার সাহায্যে ব্যাখ্যা করলে আনুষ্ঠানিক শিক্ষান্তরে—গৃহের বয়স্ক ব্যক্তি বিশেষভাবে মাতাপিতা হয়ে দাঁড়াল শিশুর শিক্ষক, আর গৃহ ও গৃহপরিবেশ হল বিদ্যালয়। বয়স্কের অভিজ্ঞতা, গোষ্ঠী জীবনের রীতিনীতি, প্রথা, বিশ্বাস প্রভৃতি হল শিক্ষার বিষয়বস্তু, আর জীবনযাপনে ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন হল শিক্ষার লক্ষ্য এবং বাস্তবে কর্মসম্পাদন বা দৈহিক সক্রিয়তা হল শিক্ষা পদ্ধতি।

৩। শিক্ষার সামাজিক স্তর (Social Stage of Education) :

শিক্ষার আনুষ্ঠানিক স্তরের প্রসারই শিক্ষাকে একটি সামাজিক স্তরে উন্নীত করে। শিক্ষার শুরু গৃহে—সরাসরি প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে শিক্ষালাভ করে বয়স্করা যখন নিজেদের সন্তান-সন্ততিদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা গৃহে বিতরণ করতে থাকে তখনই শিক্ষা বা বিদ্যালয়ের জন্ম। নানা বিবর্তন ও ইতিহাসের নানা ধাপে গৃহের এই অভিজ্ঞতা বিতরণ কাজটি আনুষ্ঠানিক রূপ পেতে থাকে। গৃহের সীমা পেরিয়ে সমাজের অর্থাৎ গোষ্ঠী জীবনের স্তরে ব্যাপ্ত হয়। আদিবাসী বা পার্বত্য মানবজাতি ধীরে ধীরে পশুপালন শিখল, চাষবাস শিখল, পার্বত্যস্থল ছেড়ে সমতল অঞ্চলে বসবাস শুরু করল মোটামুটি স্থায়ীভাবে—গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে যৌথ জীবনযাপন শুরু করল। যৌথজীবন ও বিশেষ অঞ্চলে মোটামুটি স্থায়ীভাবে বসবাসের সংগে সংগে প্রাচীন মানুষের জীবন যাত্রায় নানা রীতিনীতি, সামাজিক আচার-আচরণ, বিশ্বাস, প্রথা, সংস্কার প্রভৃতির উদ্ভব হতে থাকে। সর্বপ্রাণবাদমূলক বিশ্বাস থেকে নানা দেবদেবীর কল্পনা করে প্রাচীন মানুষ প্রাকৃতিক ও নিজ জীবনের নানা ঘটনা ও বৈচিত্র্যকে ব্যাখ্যা করতে শুরু করে। ধর্ম বা দেবদেবীতে বিশ্বাস প্রাচীন মানুষের সকল কর্মে ব্যাপ্ত হল। শুধু তাই নয় পার্থিব জীবনের সকল স্তরে ধর্ম প্রধান নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়াল। ধর্মকে মেনে নেবার ফলে ধর্মের আচার, প্রার্থনার রীতিনীতি প্রভৃতি সৃষ্টি হতে লাগল। এ সব কাজে শিক্ষা দেবার জন্য ধর্মীয় নেতা বা

পুরোহিত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল—যারা জীবন সংগ্রামের ব্যবহারিক কাজ থেকে মুক্ত হয়ে জনসাধারণকে ধর্ম শিক্ষা দেবেন। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, যুদ্ধবিগ্রহ, গৃহজীবন, বিবাহ, চাষবাস সকল ব্যাপারে পুরোহিতের প্রাধান্য স্বীকৃত হতে লাগল। মানুষ ও ঈশ্বরের মাঝামাঝি স্তরে এই পুরোহিত সম্প্রদায়—ইতিহাসে বহু শতাব্দী সমাজ জীবনে নেতৃত্ব করে এসেছে। আদিম স্তর পেরিয়ে মানুষ যত উন্নত পথে এগুতে থাকে ততই তার জীবনে নানা জটিলতা সৃষ্টি হতে থাকে। কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ বা সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা সংগ্রহের দ্বারা ব্যক্তিজীবন চলতে পারে না। যুগ যুগ সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও ধর্মীয় জীবনের ব্যাখ্যায় ও রীতিনীতিতে অভ্যস্ত করার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে সামাজিক স্তরে শিক্ষার বা অভিজ্ঞতা বিতরণের প্রয়োজন দেখা দিল। আর সে প্রয়োজন মেটানর দায়িত্ব পড়ল পুরোহিতের ওপর। মানব সমাজের আদি শিক্ষায়তনের পত্তন এভাবে ঘটল আর পুরোহিতরাই হলেন আদি শিক্ষক।

ধর্মীয় আচার ও প্রথা পালনের মধ্য দিয়ে সমাজ জীবনে যেমন কৃত্রিম কুসংস্কার ও সংকীর্ণতা সৃষ্টি হল, তেমনি পুরোহিতের নেতৃত্ব দ্বারা সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও সংহতি সাধন সম্ভব হল।

৪। বিদ্যালয়ের উদ্ভব (Origin of School) :

আধুনিক সমাজে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব আমরা লক্ষ্য করি ইতিহাসের কোন্ স্তরে তা পূর্ণাংগ রূপ পেল তা বলা দুরূহ। মানব সভ্যতার অগ্রগতির সংগে সংগে ধর্মবোধ এবং পুরোহিতের কাজে নানা জটিল ক্রিয়াকর্ম পদ্ধতি দেখা দিল। তারপর লেখ্য ভাষার উদ্ভবের ফলে পুরোহিত বা বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা ভাষার কলাকৌশল আয়ত্ত করল। পুরোহিত বা ভাষাজ্ঞানের ব্যক্তিরা সমাজ সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয়ে দাঁড়াল। সকলের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করে সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় তারা ব্রতী হল। তাদের প্রচেষ্টায়ই সম্ভবতঃ নির্দিষ্ট স্থলে বিদ্যালয়ের আবির্ভাব ঘটে। আবার অনেকে বলেন, ইংরেজী 'স্কুল' শব্দটি গ্রীক্ সখোল (*Shkole*) শব্দ থেকে উদ্ভূত। প্রাচীন গ্রীসবাসী আগুন পোহানর সময় যে আলোচনা বৈঠক করত সেটাই স্কুলের আদি জনক।

সে যা হোক, আধুনিক বিদ্যালয় সৃষ্টির মূলে রয়েছে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা। আমাদের সমাজের আদিম স্তরে মানুষের অভিজ্ঞতা,

ভাবধারা, কলাকৌশল ইত্যাদি আদান-প্রদানের কোন নির্দিষ্ট মাধ্যম ছিল না। মানুষ তখন সরাসরি পরিবারের মাধ্যমে তাদের অর্জিত অভিজ্ঞতা বা কলাকৌশল পরবর্তী বংশধরদের অর্পণ করেই ক্ষান্ত হত। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির সংগে দেখা গেল পরিবার-কেন্দ্রিক অভিজ্ঞতা বিতরণ দ্বারা সামাজিক চাহিদা মেটান যায় না। তাই সৃষ্টি হল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

সমাজের জটিলতা বৃদ্ধির সংগে সংগে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে নানা জটিল সমস্যা দেখা দেয়, জীবিকা অর্জনের দুরূহতা বৃদ্ধি পায়। পরিবারের বয়স্ক সদস্যরা অর্থ উপার্জনে, জীবন সংগ্রামে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তাই প্রয়োজন শিক্ষায়তনের যেখানে শিশু সমবেত হয়ে জীবনের অভিজ্ঞতা শিক্ষকের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারে।

মানুষ যখন তার মনোবিজ্ঞান থেকে মন সম্বন্ধে নানা সংবাদ জানতে পারল, তখন সে শিশু-মনকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য, তার চাহিদা পরিপূরণের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করল। কারণ, জীবন সংগ্রামে ব্যস্ত মাতাপিতা বা পরিজনের পক্ষে শিশুর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া সম্ভব নয়।

এ সব ছাড়াও বিদ্যালয় সৃষ্টির মূলে রয়েছে বিভিন্ন যুগে ধর্ম ও রাষ্ট্র শক্তির চাহিদা। বিভিন্ন ধর্ম তার অনুগতদের এবং বিভিন্ন রাষ্ট্র তার নাগরিকদের উপযুক্ত করে তোলার জন্য বিদ্যালয় সৃষ্টি করেছে।

৫। বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয় (Different Types of School) :

সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক চাহিদার ফলে নানা ধরনের বিদ্যালয়ের উদ্ভব হয়েছে। মানবসভ্যতার অগ্রগতির ফলে বিশ্বপ্রকৃতির রূপান্তর ঘটেছে। যে প্রকৃতিতে মানুষ জন্মেছে সে প্রকৃতিকে মানুষ তার জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বারা নিত্যনিয়ত পরিবর্তন করে যাচ্ছে। এর ফলে তার জীবন যেমন হচ্ছে জটিল, বহুমুখী স্বার্থসম্পন্ন, তেমনি তার চাহিদা, সামাজিক পরিবেশও অজস্র ধারায় প্রকাশিত হচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয় সংগঠনের মূলে মানুষের পরিবর্তিত পরিবেশ, অর্থনৈতিক, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা কাজ করে যাচ্ছে।

প্রাচীন শিক্ষায় এ সমস্যা দেখা দেয়নি। প্রথমতঃ, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপকে কেন্দ্র করেই বিদ্যালয় গড়ে উঠত। মানুষ তার অর্জিত অভিজ্ঞতা শিশুদের কাছে বিতরণ করেই শিক্ষা সমাধা করত। শিক্ষার মধ্যে কোন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, পরিবর্তিত পরিবেশের আবেদন, মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক চাহিদার সমাধান, অভিজ্ঞতার পুনর্গঠনের আয়োজন কিছুই ছিল না। অতীতে শিক্ষার কোন সর্বজনীন সামাজিক রূপ ছিল না। অভিজাত সম্প্রদায়, রাজন্যবর্গ ও পুরোহিতদের মধ্যেই শিক্ষা সীমিত ছিল। আর সকল বিদ্যালয়েই সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হত। বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয় গঠনের প্রয়োজনীয়তা প্রাচীন বা গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় স্থান পায়নি।

কিন্তু আধুনিক যুগে সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক আন্দোলনের ফলে আমাদের শিক্ষা-চিন্তায় নানা দিকে বিপ্লব ঘটেছে। শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্বাচনে, বিদ্যালয় সংগঠনে, শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয়ে আজ নানা পরিবর্তন লক্ষণীয়। বিদ্যালয়কে আজ বিভিন্ন চাহিদা ও বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নানা স্তরে ভাগ করে নানা ধরনের বিদ্যালয়ে ভাগ করা হয়।

আধুনিক যুগে শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচন করা হয় না। শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণের (democratization) ফলে শিক্ষা আজ সমাজে বণ্টিত (distributed) হয়। শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য আজ নির্বাচন নয় বণ্টন। ব্যক্তিগত বৈষম্যনীতি গৃহীত হবার ফলে ব্যক্তির বয়স, গ্রহণ-ক্ষমতা, চাহিদা, আগ্রহ ও প্রেরণার পার্থক্য অনুসারে শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্বাচিত ও শিক্ষার স্তর বিন্যাস করা হয়। তদুপরি শিক্ষাকে সামাজিক সংগঠনের শক্তি হিসাবে গ্রহণ করার ফলে সামাজিক চাহিদা ও প্রগতির জন্য শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্বাচিত করে বিদ্যালয়কে সমাজমুখী করে তোলা হয়। শিক্ষার বহুমুখী সুযোগ প্রদানের জন্য তাই আজ বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে।

৬। বিদ্যালয়ের শ্রেণী বিন্যাসের নীতি (Principles of classification of schools) :

বিভিন্ন ধরনের নীতি অনুসারে বিদ্যালয়ের শ্রেণীবিন্যাস করে বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয় গঠন করা হয়। আমরা নিম্নে বিভিন্ন নীতি অনুসারে নানাধরনের বিদ্যালয়ের উল্লেখ করছি। একটি কথা এখানে স্মরণ রাখা উচিত যে বিদ্যালয়ের

এ শ্রেণীবিন্যাস পরস্পর সম্পর্ক শূন্য নয় একই বিদ্যালয়কে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যেতে পারে।

(ক) বয়স ও যোগ্যতা অনুসারে ঃ শিক্ষার্থীর বয়স ও যোগ্যতা অনুসারে বিদ্যালয় বিভিন্ন ধরনের হতে পারে যেমন, নার্সারী ও শিশু বিদ্যালয়, প্রাথমিক, নিম্ন বুনিয়াদী, উচ্চবুনিয়াদী, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি।

(খ) বিভিন্ন পাঠ্যসূচী অনুসারে ঃ পাঠ্যসূচী অনুসারে বিদ্যালয়কে সাধারণ শিক্ষার বিদ্যালয়, পেশা বা বৃত্তি শিক্ষার (professional) বিদ্যালয়, কারিগরী (technical) বিদ্যালয়, বাণিজ্য বিষয়ক বিদ্যালয়; পলিটেকনিক (polytechnic) বিদ্যালয়, সর্বার্থ সাধক বিদ্যালয় (Multipurpose) প্রভৃতি ধরনে ভাগ করা যেতে পারে।

(গ) বিদ্যালয়ের মালিকানা অনুসারে ঃ বিদ্যালয়ের মালিকানা অনুসারে বিদ্যালয়কে বেসরকারী (private), সরকারী, গৃহ-বিদ্যালয়, একক ব্যক্তি মালিকের বিদ্যালয়, ট্রাষ্ট বা মিশনারী বিদ্যালয় ইত্যাদি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে।

(ঘ) বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর অবস্থান অনুসারে ঃ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী কতক্ষণ অবস্থান করে এবং তার প্রতি বিদ্যালয়ের কতটুকু দায়িত্ব সে অনুসারে বিদ্যালয়কে আবাসিক বিদ্যালয়, নৈশ বিদ্যালয়, দিনের বিদ্যালয় (day school) ইত্যাদিতে ভাগ করা যেতে পারে।

(ঙ) ছাত্রের দৈহিক ও মানসিক স্বাভাবিকতা অনুসারে ঃ ছাত্রদের দৈহিক ও মানসিক তারতম্য অনুসারে বিদ্যালয়কে স্বাভাবিক ছাত্রের বিদ্যালয়, বিকলাংগদের বিদ্যালয়, অন্ধদের বিদ্যালয়, বোবা ও বধিরদের বিদ্যালয়, হীনবুদ্ধিদের বিদ্যালয় ইত্যাদি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে।

(চ) ছাত্রের সামাজিক ও আর্থিক মর্যাদা অনুসারে ঃ ছাত্রের সামাজিক ও আর্থিক সংগতিকে নির্ভর করে বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয় গঠিত হয়েছে, যেমন অবৈতনিক বিদ্যালয়, সাধারণ ও মধ্যবিত্তদের জন্য সামান্য বেতন গ্রহণকারী বিদ্যালয়, ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের জন্য বিদ্যালয় বা পাব্লিক স্কুল।

এ ছাড়া কেবলমাত্র ছেলেদের বিদ্যালয়, মেয়েদের বিদ্যালয় বা সহ শিক্ষার (ছেলে ও মেয়েদের একই সংগে) বিদ্যালয়; বয়স্কদের বিদ্যালয় ইত্যাদি ধরনের বিদ্যালয় বর্তমান।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন ও বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয়ঃ ১৯৫২ খ্রীঃ স্যার লক্ষ্মণ স্বামী মুদালিয়রের সভাপতিত্বে গঠিত মাধ্যমিক শিক্ষাকমিশন (মুদালিয়র কমিশন) প্রদত্ত বিবরণীতে বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয় উল্লিখিত হয়েছে। কমিশন বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয় সম্বন্ধে বলেন যে এগুলির মধ্যে কোন সংহতি নেই, অনেক স্থলেই খাপছাড়া। কমিশন অভিমত প্রকাশ করেছেন যে নব্যভারতের চাহিদা এসব বিদ্যালয় মেটাতে পারে না। গতানুগতিক পুস্তক কেন্দ্রিক পাঠ্যসূচী মূলতঃ গৃহীত হবার ফলে বিদ্যালয় বাস্তব জীবনের সংগে সম্পর্কশূন্য হয়ে পড়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন তাই মাধ্যমিক বিদ্যালয় গুলিকে বহুমুখী বা সবার্থ সাধক (multipurpose) করে তোলার জন্য সুপারিশ করেছেন। শিক্ষার্থীর বিভিন্ন চাহিদা ও গ্রহণ ক্ষমতা অনুসারে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে সাতটি পাঠ্যপ্রবাহ (streams) প্রবর্তন, গতিশীল সক্রিয়তামূলক শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণ, পুরাতন ইণ্টারমিডিয়্যাট স্তরের বিলুপ্তি সাধন করে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের প্রবর্তন প্রভৃতি সুপারিশ করেন। এ কমিশনের সুপারিশ অনুসারেই আমাদের দেশে উচ্চতরমাধ্যমিক ও সর্বার্থসাধক বিদ্যালয় প্রবর্তিত হয়েছে। নবম শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত উচ্চতর মাধ্যমিক স্তর। সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ের গুরুত্বও সুবিধার কথা উল্লেখ করে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বলেন,[1] (১) যেহেতু একই বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের পাঠক্রম (course) পড়াবার ব্যবস্থা থাকে সেহেতু বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণের সংগে ছাত্রদের মধ্যে যে হীনমন্যতা দেখা যায় তা দূরীভূত হবে—সবার্থসাধক বিদ্যালয় গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে শিক্ষা পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে সহায়তা করে।

(২) সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার সুযোগ থাকে বলে ছাত্রকে তার চাহিদা অনুসারে পাঠক্রম প্রদান করে শিক্ষামূলক সুপরিচালনা (educational guidance) প্রদান করা যেতে পারে।

(৩) সবার্থসাধক বিদ্যালয়ে কোন শিক্ষার্থী ভুলবশত কোন পাঠক্রম গ্রহণ করলে অতি সহজেই তাকে তার যোগ্য পাঠক্রম প্রদান করা যেতে পারে।

1. Report of the Secondary Education Commission. —Page 30-31

কারণ, একই বিদ্যালয়ে বিভিন্ন পাঠক্রমের ব্যবস্থা থাকে। সেখানে এক বিদ্যালয় থেকে অন্য বিদ্যালয়ে যাবার প্রশ্ন ওঠে না।

অবশ্য মাধ্যমিক শিক্ষাকমিশন একমুখী (unilateral) বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেন নি। বিশেষ পাঠক্রম বা বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য একমুখী বিদ্যালয় থাকা উচিত। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন কর্তৃক পরিকল্পিত বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয়ের একটি ছক আমরা নিম্নে প্রদান করছি।

স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

কলা ও বিজ্ঞান	শিক্ষা ও শিক্ষক শিক্ষণ	পেশাগত শিক্ষা আইন, চিকিৎসা ইত্যাদি	কারিগরী ও যন্ত্রবিদ্যা	কৃষি ও পশু চিকিৎসা	অন্যান্য বিষয়

ত্রিবার্ষিক স্নাতক পাঠক্রম	পলিটেকনিক ৩ থেকে ৫ বর্ষ ব্যাপী

প্রাক্ বিশ্ব-বিদ্যালয় শ্রেণী		উচ্চ মাধ্যমিক এবং সর্বার্থ সাধক বিদ্যালয়	শিল্প ও পেশাগত বিদ্যালয়
উচ্চ বিদ্যালয়	উচ্চ কারি-গরী বিদ্যালয়		

নিম্ন উচ্চ বিদ্যালয়
বা
উচ্চ বুনিয়াদী

প্রাথমিক
বা
নিম্ন বুনিয়াদী

শিশু বিদ্যালয়

৭। বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয়ের কাজ (Functions of different types of schools) :

আমাদের দেশের বর্তমান বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয়ের কাজ আমরা আলোচনা করছি। সামাজিক চাহিদা ও সমস্যা নিরসনের জন্য বিদ্যালয়ের

কাজ নির্ধারিত হয়। কিন্তু এ চাহিদা ও সমস্যা বিভিন্ন সমাজে ও সংস্কৃতিতে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন। এজন্য বিত্তালয়ের কাজ ও গঠন বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হয়। একথা মনে রেখেই বিদ্যালয়গুলির কাজ আমার ব্যাখ্যা করছি।

(ক) নার্সারী ও শিশু বিত্তালয়ঃ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার সর্বনিম্ন স্তরে বা শুরুতে রয়েছে নার্সারী ও শিশু বিদ্যালয়গুলি। ছয় বছর বয়স অবধি (৩-৬ বছর) শিশুদের শিক্ষা এখানে সমাপ্ত হয়। নার্সারী ও শিশু বিদ্যালয় শিশুর দৈহিক মানসিক পরিচর্যা করে। নানা কারণে গৃহে শিশুর সর্বাংগীণ পরিচর্যা সম্ভব নয়। সেজন্য শিশু বিদ্যালয় গৃহের এ দায়িত্ব গ্রহণ করে। আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বে শিশুর শৈশবকে শিক্ষামূলক স্তর হিসেবে খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিশুর চাহিদা, ইন্দ্রিয়ানুশীল, প্রক্ষোভ প্রভৃতি অতৃপ্ত থাকলে শিশুর চরিত্রে নানা অপসংগতি দেখা যায়। তার ভবিষ্যৎ শিক্ষা ব্যাহত হয়। এজন্য শিশু বিদ্যালয় বা প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের অপরিহার্যতা আজ স্বীকৃত হয়েছে। শুরুতে দরিদ্র বস্তিবাসী ছেলেমেয়েদের জন্য শিশু বিদ্যালয় গড়ে উঠলেও আধুনিক সমাজে শিশু বিদ্যালয় সর্বস্তরের শিশুদের জন্য প্রবর্তিত হয়েছে। শিশু বিদ্যালয়ে অক্ষর জ্ঞান বা পুস্তক পাঠের ওপর গুরুত্ব না দিয়ে খেলাভিত্তিক ও সক্রিয়তা কেন্দ্রিক শিক্ষা প্রদত্ত হয়। শিশুর ইন্দ্রিয়ানুশীলনের (sense training) ওপর গুরুত্ব দিয়ে শিশুকে তার পরিবেশের সংগে বা বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সংগে সংগতি সাধনের চেষ্টা করা হয়।

(খ) নিম্ন বুনিয়াদী বা প্রাথমিক বিত্তালয়ঃ শিশু বিদ্যালয়ের পরই প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুকে অক্ষর জ্ঞান দিতে শুরু করা হয়। অবশ্য পরোক্ষভাবে এই অক্ষর জ্ঞান শিশু বিদ্যালয়েই শুরু করা হয়। প্রাথমিক স্তরে ৬ থেকে ১১ বছরের শিশুরা শিক্ষা গ্রহণ করে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম কাজ হল শিশুর ব্যক্তিত্বকে সমাজমণ্ডিত (socialised) করে তোলা, সমবেত কাজ ও যৌথ জীবনে অভ্যস্ত করে তোলা। দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে শিশুকে তার নিজস্ব ও সামাজিক দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় কাজ হচ্ছে শিশুকে তার পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা, তার পক্ষে যতটুকু বোধগম্য ততটুকু পারিবেশিক জ্ঞান প্রদান করা এবং পরিবেশের প্রতি প্রতিক্রিয়া করতে শেখান।

চতুর্থ কাজ হচ্ছে শিশুর কর্মপ্রবণতাকে গঠনধর্মী বা সৃজনশীল করে তোলা— নানা হাতের কাজে তাকে অভ্যস্ত করা। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম কাজ হচ্ছে শিক্ষার্থীকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষাযোগ্য করে তোলা।

স্বাধীনতার পর আমাদের দেশে বুনিয়াদী শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা বলে গ্রহণ করার পর প্রাথমিক স্তরে বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রবর্তিত হচ্ছে। গতানুগতিক প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলিতে পুস্তককেন্দ্রিক শিক্ষা প্রদত্ত হত। শিক্ষার্থীর জীবনের সংগে এগুলির কোন সম্পর্ক ছিল না। শিশুর জীবনে কর্ম প্রবৃত্তি, সক্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ানুশীলন প্রভৃতি এতে উপেক্ষিত হত। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষা সক্রিয়তা কেন্দ্রিক—শিল্প বা কর্মভিত্তিক। ভারত সরকার তাই গতানুগতিক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার নীতি গ্রহণ করেছেন। ফলে আমাদের দেশে এখনও পাশাপাশি গতানুগতিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বুনিয়াদী বিদ্যালয় দেখা যায়। অচিরে সকল বিদ্যালয়ই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা জনসাধারণের শিক্ষা। সামাজিক ও সভ্যজীবনের উপযোগী আচরণে শিশুকে অভ্যস্ত করার জন্য পৃথিবীতে সকল রাষ্ট্রই প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছে।

(গ) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ ১৩ থেকে ১৭ বছর বয়স অবধি শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করে। আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক নীতিগত স্বীকার করা হয়েছে মাত্র। এখনও অধিকাংশ শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। আর যারা প্রাথমিক শিক্ষাস্তর পেরিয়ে আসে তাদের অনেকেই মাধ্যমিক স্তরে আসে না। আমাদের শাসনতন্ত্রে ১৪ বছর বয়স অবধি প্রতিটি নরনারীর শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মাধ্যমিক স্তরে উচ্চবুনিয়াদী বা মধ্য বিদ্যালয়ে (Senior Basic or Middle School) সাধারণতঃ পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে। নবম শ্রেণী থেকে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের (High School) শিক্ষা আরম্ভ হয় দশম শ্রেণী পর্যন্ত। যে বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণীর ব্যবস্থা থাকে সেগুলি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় (Higher Secondary School) এবং যে সব বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের (১৯৫২-৫৩ খ্রীঃ)

সুপারিশ অনুসারে বিভিন্ন পাঠক্রমের ব্যবস্থা করা হয়েছে সেগুলিকে সর্বার্থসাধক (Multipurpose) বিদ্যালয় বলে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান কাজ হল শিক্ষার্থীকে নিরবচ্ছিন্নভাবে সাধারণ শিক্ষা (general knowledge) প্রদান করা যাতে শিক্ষার্থী ব্যাপকভাবে তার অভিজ্ঞতা ও অধীত বিদ্যাকে কাজে লাগাতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, যে বয়সে শিক্ষার্থী মাধ্যমিক স্তরে উপনীত হয় সে বয়স তার কৈশোরের কাল। সুতরাং মাধ্যমিক শিক্ষা কিশোরের দৈহিক মানসিক (বিশেষ ভাবে প্রক্ষোভ মূলক) চাহিদার পরিতৃপ্তি সাধন করবে। তৃতীয়তঃ, মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ববিকাশের সুযোগ প্রদানের মধ্যে তার দ্বারা যে সম্ভাবনা বা বিশেষ ক্ষমতা (talent) বর্তমান তা অনুসন্ধান করবে। চতুর্থতঃ, মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষার্থীকে বৃত্তিমূলক সুপরিচালনা (vocational guidance) প্রদান করবে। কারণ অধিকাংশ যুবক মাধ্যমিক স্তরের পর বাস্তব কর্মজীবনে প্রবেশ করে—তারা উচ্চ শিক্ষায় উপযুক্ত নয় বা উচ্চ শিক্ষার জন্য সময় ব্যয় করতে নানা কারণে পারে না। পঞ্চমতঃ, মাধ্যমিক বিদ্যালয় কলেজীয় শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীকে প্রস্তুতির সুযোগ দেবে। একথা ঠিক সকল ছাত্র কলেজীয় শিক্ষায় যাবে না, কিন্তু যারা মেধাবী তাদের জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে থাকা উচিত।

আধুনিক প্রগতিশীল দেশগুলিতে মাধ্যমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে! বিজ্ঞানের জটিল যুগে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর অবধি না পড়লে দেশের যুবক সক্রিয়ভাবে সামাজিক কাজকর্মে অংশ গ্রহণ করতে পারে না, তার দক্ষতা ব্যাহত হয়। এজন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে পরিসমাপ্তিমূলক (terminal) শিক্ষা দেবার কথা বলা হয়ে থাকে। এজন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কাজ হল, শিক্ষার্থীকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদান করা, এমন শিক্ষা দেওয়া যা শিক্ষার্থী মাধ্যমিক শিক্ষার পর বাস্তব কর্মজীবনে কাজে লাগতে পারে, বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে বাস্তবজীবনে যেন অসহায় বোধ না করে।

আমাদের গতানুগতিক মাধ্যমিক শিক্ষা পুস্তককেন্দ্রিক এবং ব্যবহারিক জ্ঞান বর্জিত ছিল। এগুলির লক্ষ্য ছিল শিক্ষার্থীকে কেবলমাত্র কলেজীয় শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করা। দেশের চাহিদা পরিবর্তিত সমাজজীবনের চাহিদা, যুবচিত্তের চাহিদা, শিক্ষার সক্রিয়তা সবকিছুই এতে উপেক্ষিত ছিল। ১৯৫২-৫৩ খ্রীঃ

মাধ্যমিক শিক্ষা (মুদালিয়র) কমিশন গতানুগতিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আমূল পরিবর্তন সুপারিশ করেন। কমিশন ইণ্টারমিডিয়্যাট কোর্স বিলোপ করে দশম শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয়গুলিকে একাদশ শ্রেণীতে উন্নীত করে মাধ্যমিক শিক্ষা ও ত্রিবার্ষিক কলেজীয় শিক্ষা প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। সে অনুসারে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের দশ বছর পর গঠিত শিক্ষা কমিশন (কোঠারী ১৯৬৪-৬৬ খ্রীঃ) লক্ষ্য করেন, মাধ্যমিক শিক্ষা নানা কারণে সার্থক হয়নি। উপযুক্ত বৃত্তিশিক্ষার অভাব, পুস্তক কেন্দ্রিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব, ত্রুটিপূর্ণ পাঠ্যসূচী, গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতি ইত্যাদি মাধ্যমিক শিক্ষাকে ফলপ্রসূ করে তুলছেনা এবং কলেজীয় শিক্ষায় ভীড় ক্রমাগত বাড়ছে। এজন্য শিক্ষা কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরকে অধিকতর বৃত্তিমূলক করার পক্ষপাতী। নবম শ্রেণী থেকে উচ্চতর মাধ্যমিক স্তর আরম্ভ না করে একাদশ শ্রেণী থেকে উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা আরম্ভ করে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া উচিত। অর্থাৎ শিক্ষা কমিশন মনে করেন মাধ্যমিক শিক্ষা দ্বাদশবর্ষব্যাপী হবে। ভারত সরকার শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করেছেন।

মাধ্যমিক স্তরে বিশেষ বিশেষ চাহিদা অনুসারে বিশেষধর্মী বিদ্যালয় (special school) বর্তমান। আমরা নিয়ে এ বিদ্যালয়গুলির কাজ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি।

পাব্লিক স্কুল (Public School) : ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে ইদানীং পাব্লিক স্কুল বলে কতকগুলি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। এ বিদ্যালয়গুলি ইংলণ্ডের পাব্লিক স্কুলগুলির অনুকরণে সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৫২ খ্রীঃ পাব্লিক স্কুল কনফারেন্সে সমগ্র ভারতে ১৪টি পাব্লিক স্কুলকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এ কয়েক বছরে এদের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। এসব বিদ্যালয়ে আসন সংখ্যা সীমিত, উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক, ব্যক্তিগত মনোযোগ আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষাদান ব্যবস্থা, সহপাঠ্যসূচীর অন্তর্গত কার্যাবলীর প্রচুর সুযোগ, শিক্ষার আধুনিক সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি থাকার ফলে শিক্ষার গুণগতমান খুব বেশী।

পাব্লিক স্কুলগুলির প্রয়োজনীয়তাকে নিয়ে প্রচণ্ড বিতর্ক দেখা যায়। কারণ প্যাব্লিক স্কুলগুলি নামে 'প্লাবিক' হলেও উহা সকল জনসাধারণের জন্ত নহে।

পাব্লিক স্কুলে সাধারণতঃ উচ্চ মধ্যবিত্ত ও ধনিক গোষ্ঠীর সন্তানরা শিক্ষার সুযোগ পায়—কারণ এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষাব্যয় প্রচুর, এবং আনুষংগিক ব্যবস্থা করা প্রচুর ব্যয় সাপেক্ষ। পাব্লিক স্কুলের বিরুদ্ধে সমালোচকরা বলেন, এ সব বিদ্যালয়ের দেশের শিক্ষাপ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য কোন অবদান নেই। এসব বিদ্যালয়ের ছাত্ররা যেহেতু উচ্চ অবস্থাসম্পন্ন পরিবার থেকে যায় এবং বিলাসবহুল জীবন যাপন করে সেহেতু অনেক সময় সংকীর্ণচেতা এবং দাম্ভিক হয়ে পড়ে। দেশের জনসমাজ থেকে বিচ্যুত এরা এক নতুন শ্রেণী সৃষ্টি করে। এ ধরনের শ্রেণী চেতনা এবং বিচ্ছিন্ন মনোভাব গণতান্ত্রিক সমাজগঠনের পরিপন্থী। কিন্তু, পাব্লিক স্কুলের সপক্ষে ভারতের পূর্বতন শিক্ষা উপদেষ্টা স্যার জন সার্জেণ্ট বলেন যে, এসব বিদ্যালয় থেকে যে সব ছেলে বেরোয়, তারা খুব বুদ্ধিমান না হতে পারে, তাদের আচার ব্যবহার দাম্ভিক হতে পারে, কিন্তু নিয়মানুবর্তিতা, দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষমতা এবং দেশকে নেতৃত্ব প্রদানের যে সব গুণাবলী থাকা প্রয়োজন তা এসব বিদ্যালয়ের ছাত্ররা অর্জন করে।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫২-৫৩ খ্রীঃ) পাব্লিক স্কুলের প্রয়োজনীয়তা খুব গভীর ভাবে বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে এ বিদ্যালয়গুলিকে উপযুক্তভাবে সংগঠিত করলে ছাত্রদের মধ্যে দেশাত্মবোধক মনোভাব গড়ে উঠতে পারে। ছাত্ররা সুনাগরিকের গুণাবলী অর্জন করতে পারে। সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয় অপেক্ষা এসব বিদ্যালয়ে ছাত্র শিক্ষকের মধ্যে নিকট সম্পর্ক বর্তমান। ছাত্ররা নানা বিষয় শিক্ষার সুযোগ পায়, ফলে তাদের চরিত্রে এমন সব গুণাবলী দেখা যায়, যার ফলে তারা শিক্ষান্তে সমাজকে নেতৃত্ব দিতে পারে। গেল বিশ্বযুদ্ধে দেখা গেছে যে, যারা আমাদের সেনাবাহিনীতে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের কেহ কেহ পাব্লিক স্কুলেও পড়েছেন। যেহেতু রাতারাতি সকল বিদ্যালয়ের গুণগত মানোন্নয়ন সম্ভব নয়—সেহেতু পাব্লিক স্কুলগুলিকে তুলে দেবার প্রশ্ন ওঠে না। বরং এসব বিদ্যালয়ের সংস্কারসাধন প্রয়োজন। এজন্য মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বলেন ; আমাদের দেখা উচিত যেন দেশের প্রচলিত শিক্ষার সংগে এসব বিদ্যালয়ের যোগ থাকে, দেশের মাটির সংগে সংযোগ থাকে—এগুলি যেন সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন শিক্ষা কেন্দ্র হয়ে না ওঠে। পাব্লিক স্কুলগুলিতে কেবলমাত্র ক্রীড়াপ্রিয়তার (sportsmanship) দিকে লক্ষ্য রাখলে চলবে না, সুনাগরিকের সকল গুণ, শ্রমের মর্যাদা এবং সামাজিকতাবোধ

এ সবের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। তা ছাড়া, আমাদের দেখা উচিত এ সব বিদ্যালয় যেন ভারতীয় সংস্কৃতি ও ভাবধারার সংগে সামঞ্জস্য বিধান করে।

শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬ খ্রীঃ) মনে করেন আলাদা পাব্লিক স্কুল গণতান্ত্রিক সমাজের পক্ষে সমর্থনীয় নয়। শিক্ষার সমসুযোগ (equal opportunity) সকলকে দিতে গেলে সর্বসাধারণের বিদ্যালয় (common school) স্থাপন করা উচিত।

কারিগরী শিক্ষার বিদ্যালয় (Technical School) : মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বিভিন্ন ধরনের হাতে কলমে কাজ শিক্ষার বিদ্যালয় বর্তমান। সাধারণ শিক্ষা গ্রহণে অসমর্থ বা অপারগ শিক্ষার্থীকে জীবিকা অর্জনে উপযুক্ত করে তোলাই এসব বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। কোন বাণিজ্য বিষয়ক কাজ (trade), শিল্পমূলক (industrial work) কোন বৃত্তি মূলক (occupational) কাজ ইত্যাদি শেখাবার জন্য এসব বিদ্যালয়ের উদ্ভব হয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন চার প্রকারের ছাত্রদের জন্য কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করার সুপারিশ করেছেন। প্রথমতঃ, উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যে সমস্ত ছাত্র কারিগরী শিক্ষা গ্রহণ করতে চায়। দ্বিতীয়তঃ, যে সকল ছাত্র মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য উপযুক্ত নয়, এবং যত শীঘ্র সম্ভব অর্থ উপার্জন করে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। তৃতীয়তঃ, যারা মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর অতিক্রম করে কলেজীয় শিক্ষা গ্রহণ না করে পলিটেক্‌নিকে ভর্তি হতে চায়। চতুর্থতঃ, যারা কোন না কোন ভাবে কারিগরী শিক্ষা শেষ করে চাকরি করে কিন্তু সন্ধ্যার কারিগরী বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে কর্ম জীবনে উন্নতি করতে চায়।

বর্তমানে আমাদের দেশে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে সর্বার্থসাধক বিদ্যালয় গুলিতে কারিগরী শিক্ষাক্রম প্রবর্তিত হয়েছে। কিন্তু চাকুরিরত কারিগরদের জন্য শিক্ষার কোন ব্যবস্থা আজও হয়নি। শিক্ষাকমিশন (১৯৬৪—৬৬ খ্রীঃ) মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচীতে বৃত্তিশিক্ষার অধিকতর সুযোগ দেবার কথা বলেছেন এবং অষ্টম শ্রেণী থেকেই কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে সুপারিশ করেছেন।

প্রতিবন্ধীদের বিদ্যালয় (School for the Handicapped) : সাধারণ স্বাভাবিক জীবন থেকে দুর্ভাগ্যবশতঃ কিছু কিছু ছেলেমেয়ে বঞ্চিত। তারা কেউ ক্ষীণবুদ্ধি, অন্ধ, মূকবধির, পংগু ইত্যাদি। সুতরাং স্বাভাবিক শিশুদের

মত তাদের শিক্ষা দেওয়া যায় না। এদের জন্য পৃথকভাবে বিত্থালয় প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। এজন্য আমাদের দেশে মূকবধিরদের বিত্থালয়, অন্ধদের বিত্থালয়, ক্ষীণ বুদ্ধিদের বিত্থালয় বর্তমান। প্রয়োজনের তুলনায় এদের সংখ্যা কম হলেও প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার ব্যবস্থা এগুলি করে থাকে।

প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের দেশে কোন সুপরিকল্পনা গৃহীত হয়নি। সর্বপ্রথম এ সম্বন্ধে পূর্ণাংগ আলোচনা করেন শিক্ষাকমিশন (১৯৬৪-৬৬ খ্রী:)। কমিশন প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা সহকারে শিক্ষাব্যবস্থার সুপারিশ করেছেন।

৮। উচ্চশিক্ষার বিদ্যালয় (Schools for Higher Education) :

উচ্চ শিক্ষার বিত্থালয় বলতে আমরা কলেজ ও বিশ্ববিত্থালয় বুঝি। উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার পর শিক্ষার্থী কোন বিশেষ বিষয়ে পারদর্শী হবার জন্য কলেজে প্রবেশ করে। কলেজীয় শিক্ষা সমাপ্ত করে সে স্নাতকোত্তর স্তরে বা বিশ্ববিত্থালয়ে প্রবেশ করে। যেহেতু কলেজ বা বিশ্ববিত্থালয় উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র এবং আমাদের প্রচলিত অর্থে বিত্থালয়ভুক্ত নয়, এজন্য এ সম্বন্ধে এখানে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করব না।

প্রশ্নাবলী

1. How does school idea develop ?
2. Enumerate the main types of schools & their distinctive functions.
3. Discuss the functions of different schools found in India.

বিংশ অধ্যায়

অভিভাবন, সহানুভূতি, অনুকরণ

(Suggestion, Sympathy, Imitation)

১। দলগত শিক্ষাদান (Group teaching) :

আধুনিক প্রগতিশীল বা শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষায় ব্যক্তিমুখী শিক্ষানীতি (principle of individualised instruction) গৃহীত হলেও শিক্ষা কেবলমাত্র শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ব্যাপার নয়। শিক্ষার্থী দলগতভাবেই শিক্ষকের সম্মুখে উপস্থিত হয়। প্রতিটি শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে একটি গোষ্ঠীর সদস্য। কি গৃহে, কি সমাজে, কি বিদ্যালয়ে সর্বত্রই শিক্ষার্থী আপন গোষ্ঠী চেতনা বহন করেছে। সুতরাং শিক্ষায় শিক্ষার্থীর এই গোষ্ঠী চেতনাকে কাজে লাগানো উচিত। অনেকে বলে থাকেন শিক্ষার্থীকে দলগতভাবে শিক্ষা দিলে ব্যক্তিগত বৈষম্যনীতি অবহেলিত হয়। যারা অনগ্রসর তারা পাঠে মোটেই উন্নতি করতে পারে না। যারা অগ্রসর তাদের পাঠোন্নতি যথাযথ হয় না—তাছাড়া দলগতভাবে শিক্ষা দিলে ব্যক্তি দলের মধ্যে হারিয়ে যায়, সে মোটেই গুরুত্ব লাভ করতে পারে না। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে নৈকট্য থাকে না। ছাত্রদের মধ্যে প্রতিযোগিতা, হিংসা প্রভৃতি দেখা দেয়।

কিন্তু এখানে আমাদের স্মরণ করা উচিত যে আধুনিক ব্যক্তিমুখী শিক্ষানীতি শিশুকে দল বা গোষ্ঠী থেকে আলাদা করে একক হিসাবে শিক্ষা দেবার কথা বলে না। শিক্ষার লক্ষ্য জীবনের সামগ্রিক প্রকাশ এবং তা একমাত্র সমাজে, যৌথজীবন যাপনে সম্ভব। শিক্ষা ব্যক্তিগত উদ্যমের দ্বারা জ্ঞানসম্ভার অর্জন করা নয়, সে জ্ঞান কিভাবে কাজে লাগানো যায়, কি ভাবে অধিকতর সার্থক সমাজজীবন যাপন করা যায়—তা-ই শিক্ষায় অভিপ্রেত। সমবেত জীবনযাপন, ভাবের আদান প্রদান, অন্যের সংগে সংগতি স্থাপন, ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ করে সামাজিক মংগলে অংশ গ্রহণ করা প্রভৃতির দ্বারা ব্যক্তির পবিত্র সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। আর তখনই সুষম ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। সুতরাং

শিক্ষায় শিক্ষার্থীকে একক হিসেবে গ্রহণ না করে গোষ্ঠীগতভাবে গ্রহণ করাই উচিত।

অন্যদিকে সমবেতভাবে শিক্ষাদানের যৌক্তিকতা হল এই যে একই শিক্ষক একই ছাত্রকে সকল বিষয়ে শিক্ষাদানের যোগ্য হতে পারেন না। যদি প্রতিটি শিক্ষার্থীকে প্রতি বিষয় এককভাবে শিক্ষা দেবার জন্য শিক্ষক সংগ্রহ করার কথা বলা হয় তবে তা অবাস্তব। সুতরাং বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন শিক্ষক সমবেত শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থিত হয়ে শিক্ষা দেবেন, সেটাই যুক্তিযুক্ত। আধুনিক বিদ্যালয়ে ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষা প্রদত্ত হয় না।

২। গোষ্ঠী (Group):

আমরা বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান প্রসংগে ছাত্রগোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করেছি। গোষ্ঠী-চেতনাকে শিক্ষায় সদ্ব্যবহারের ওপর শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশ নির্ভর করে। সুতরাং গোষ্ঠী সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে কিছু বলা প্রয়োজন। গোষ্ঠী বলতে আমরা এমন এক জনসমষ্টি বুঝি যারা মিথস্ক্রিয়া (reciprocity) ও পরস্পর আদান প্রদানের দ্বারা একটি সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে—যেমন পরিবার, ছাত্রদল ইত্যাদি। গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের মধ্যে পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ সম্পর্ক বা পরিচয়ের সুযোগ থাকে, একে অন্যের মুখোমুখি (face to face) হতে পারে। মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে দেখলে; গোষ্ঠীর প্রত্যেকটি ব্যক্তি অন্যের সংগে একটি মানসিক সংযোগ স্থাপন করে। তাদের পরস্পরের মধ্যে একটি 'আমরা অনুভূতি' (we-feeling) বর্তমান। ব্যক্তি নিয়ে গোষ্ঠী গঠিত—সুতরাং গোষ্ঠী সংগঠনকারী বিভিন্ন ব্যক্তির মানসিক সংগঠন গোষ্ঠীর ওপর প্রভাব বিস্তার করে। অন্যদিকে গোষ্ঠীর প্রভাবও ব্যক্তির ওপর প্রতিভাত হয়। ব্যক্তি ও গোষ্ঠী পরস্পর এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বিধৃত। গোষ্ঠীর প্রতি ব্যক্তির একটি অনুরক্তি বা নিষ্ঠার (loyalty) মনোভাব দেখা দেয়। জ্ঞাতসারে, অজ্ঞাতসারে গোষ্ঠীর অনুকরণ ব্যক্তি করে থাকে, গোষ্ঠী থেকে সে অভিভাবন গ্রহণ করে, গোষ্ঠীর প্রতি তার সহানুভূতি সদা জাগ্রত থাকে। ব্যক্তির সকল কাজে গোষ্ঠী উদ্দীপনা সঞ্চার করে।

আমরা এক্ষণে শিক্ষায় অনুকরণ, অভিভাবন ও সহানুভূতির গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করছি। এগুলি মনস্তাত্ত্বিক প্রত্যয় (psychological concepts)

হলেও শিক্ষার সমাজতত্ত্বমূলক ব্যাখ্যায় এ প্রত্যয়গুলি গুরুত্বলাভ করেছে। সার্থক শিক্ষাপ্রদানে এগুলির সদ্ব্যবহার করতে গেলে এগুলি সম্বন্ধে আমাদের সম্যক্ ধারণা থাকা উচিত।

৩। অনুকরণ, সহানুভূতি এবং অভিভাবন (Imitation, Sympathy and Suggestion) :

বিদ্যালয়ে সমবেত শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা প্রসংগে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভিড ষ্টু (*David Stow*) একটি নতুন কথা ব্যবহার করেছেন : সে নতুন তত্ত্বটি হল 'সংখ্যাগত সহানুভূতি' (sympathy of numbers)। ষ্টু মনে করেন সংখ্যার মধ্যে একটি বিশেষ ক্ষমতা বর্তমান, ব্যক্তিগত ভাবে যা থাকেনা। একটি দলের মধ্যে যখন ব্যক্তি উপনীত হয় তখন সে যে বিশেষ ক্ষমতা লাভ করে—তাকেই তিনি সংখ্যাগত সহানুভূতি বলেছেন। প্রতিটি শিশু আপন পরিবারে অন্য শিশুর সংগে মিশতে চায়, তার সংগী শিশুদের মধ্যে সমবেত হয়ে সে বুদ্ধিগত এবং নৈতিক চেতনামূলক সহানুভূতি লাভ করে, যা অন্যান্য বয়স্কদের মধ্যে সে অনুভব করে না। এজন্য ষ্টু ছোট ছোট শ্রেণীর পরিবর্তে বড় বড় শ্রেণীর পক্ষপাতী। কারণ বৃহৎ শ্রেণীতে সংখ্যাগত অনুভূতি ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়।

ডেভিড ষ্টু যে সংখ্যাগত সহানুভূতির কথা বলেছেন তাকে আমরা ম্যাক্‌ডুগালের (*McDougall*) আসংগলিপ্সু প্রবৃত্তির (gregarious instinct) সংগে তুলনা করতে পারি। সংগপ্রিয়তা এবং নির্জনতা পরিহার আমাদের সহজাত প্রবৃত্তি, মাতৃ এষণা। একে ঘিরে শিশুমনে সৌন্দর্যপ্রিয়তার (loveliness) প্রক্ষোভ সৃষ্টি হয়। ব্যাপক অর্থে একে আমরা গোষ্ঠী চেতনা-মূলক প্রবৃত্তিও বলতে পারি। এই আসংগলিপ্সুতার জ্ঞানমূলক দিককে অভিভাবন, অনুভূতিমূলক দিককে সহানুভূতি এবং ইচ্ছমূলক দিককে অনুকরণ বলা হয়। অন্যের সংগে একাত্মবোধ হওয়ার পেছনে এ তিনটি দিকই বর্তমান। এক্ষণে এই তিনটি সম্বন্ধে আমরা পৃথকভাবে আলোচনা করছি।

(ক) অনুকরণ : অনুকরণমূলক প্রবণতা আমাদের জন্মগত। অন্যের কাছ থেকে তাদের চিন্তা, অনুভূতি কাজ প্রভৃতিকে অনুসরণ করে নিজের আচরণে প্রতিফলিত করা অনুকরণ। এ অনুকরণ জ্ঞাতসারে হতে পারে,

আবার অজ্ঞাতসারে হতে পারে। যখন পক্ষীশাবক ডানা মেলে উড়বার চেষ্টা করে, হাঁসের বাচ্চা প্যাক্ প্যাক্ করে তখন সে অনুকরণ অজ্ঞাতসারেই হচ্ছে, এ অনুকরণের মধ্যে বুদ্ধি বিবেচনা, বা ইচ্ছামূলক দিকটির কোন সচেতন উপস্থিতি নেই। একে অনেক সময় মিমেসিস্ (*Mimesis*) বলা হয়। শিশু যখন বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে অন্যদের সংগে দৌড়ঝাপ শুরু করে—তখন সে তার সচেতন মনের অজ্ঞাতসারেই অনুকরণ করছে। এই অসচেতন অনুকরণকে লয়েড মরগান (*Lloyd Morgan*, জৈবিক বা প্রবৃত্তিমূলক (biological or instinctive) অনুকরণ বলেছেন। ভেলেনটাইন (*Valentine*) একে বলেছেন মিমেসিস্ (*Mimesis*)। কিন্তু শিশু যখন বিচার বিবেচনা করে অন্যের অনুকরণ করে তখন তাকে বলা হয় সচেতন অনুকরণ (deliberate or reflective imitation)। শিশু যখন বয়স্কদের নাচ দেখে অনুকরণ করে, বা বড়দের টেবিলে বসে লিখতে, পড়তে, কাজ করতে শুরু করে, তখন সে সচেতনভাবে এসব কাজের রকম (modes) মনে রেখে অনুকরণ করে।

(খ) অভিভাবন (Suggestion): যখন সচেতনভাবে অনুকরণের ক্ষেত্রে অনুকরণযোগ্য কাজের জ্ঞানমূলক দিকটি গ্রহণ করা হয় তখন তাকে অভিভাবন বলে। ম্যাক্ডুগাল অভিভাবন ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, কোন যুক্তি-বিচার না করে, পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে কোন কিছুতে অংশ গ্রহণ করার প্রক্রিয়া (process of communication)। অভিভাবন সামাজিক বা প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে ব্যক্তির সচেতন মনের অগোচরে ব্যক্তির ওপর প্রতিফলিত হতে পারে। অন্যদিকে ব্যক্তি সচেতনভাবে একে অন্যের ওপর অভিভাবন বিস্তার করতে পারে। অভিভাবনের ফলে ব্যক্তি যাকে অনুকরণ করে তার প্রতি নিষ্ঠা অনুভব করে। অভিভাবন যদি যুক্তিহীন হয়ে অন্ধ বিশ্বাসের আকার ধারণ করে তবে তা সম্মোহনে (hypnotism) পরিণত হয়।

(গ) সহানুভূতি (Sympathy): অন্যের কাছ থেকে তার অনুভূতিকে গ্রহণ করা হল সহানুভূতি। গোষ্ঠী চেতনার কেন্দ্রে এই অনুভূতি বা সংগীপ্রিয়তা বর্তমান। সহানুভূতি একের অন্যের ওপর সংক্রমিত হয়। ম্যাক্ডুগাল বলেন, সহানুভূতি হল একটি মন যখন অন্যে মনের অনুভব করে। এটা আমাদের প্রক্ষোভনজনিত ব্যাপার। মানুষের আসংগলিপ্সা এর মূলে কাজ করে। সহানুভূতির ফলেই আমরা অন্যের আবেগমূলক দিকটি অনুসরণ করি।

এখানে একটি কথা স্মরণ রাখা উচিত যে ব্যাপক অর্থে অনুকরণের মধ্যে সহানুভূতি ও অভিভাবন বর্তমান। অনুকরণকে যখন আমরা সীমিত অর্থে প্রয়োগ করি তখন কাজের জ্ঞানমূলক দিকটি বুঝি। কিন্তু কোন কাজকে অনুকরণ করার অর্থ তার জ্ঞানমূলক, অনুভূতিমূলক এবং ইচ্ছামূলক সকল দিকগুলিই গ্রহণ করা।

৪। শিক্ষায় অনুকরণ, অভিভাবন ও সহানুভূতির গুরুত্ব (Importance of Imitation, Suggestion and Sympathy in Education) :

শিক্ষা শিশুর ক্রমবর্ধিষ্ণু ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়। শিশু তার ব্যক্তিসত্ত্বা বিকাশে প্রাকৃতিক, সামাজিক পরিবেশ থেকে বহু উপাদান সংগ্রহ করে, আত্মস্থ করে। আর এ উপাদান সংগ্রহ সম্ভব হয় তার অনুকরণ প্রবণতার দ্বারা। যে পরিবেশে সে জন্মে, যে গোষ্ঠী বা সমাজে সে বর্ধিত হয়, তা থেকে নানা উপাদান শিশু সচেতনভাবে, অসচেতনভাবে নিজের চিন্তায়, আচার আচরণে প্রতিফলিত করে। তার মানসিক দৃষ্টিভংগী, তার নৈতিকবোধ, ন্যায় অন্যায় বিবেচনা, তার কথাবার্তা, আচার আচরণ সবকিছুই অভিভাবনের দ্বারা গড়ে ওঠে। কৈশোর আগমনে শিশুর যৌন চেতনাকে কেন্দ্র করে তার মধ্যে যে কর্মচেতনা, রোমান্স বা বিস্ময়ানুভূতি, প্রক্ষোভমূলক তাড়না প্রভৃতি দেখা দেয়, তখন সে তার পরিবেশ থেকে, সংগী সাথীর কাছ থেকে, বড়দের কাছ থেকে সচেতন ভাবে অনেক কিছু অনুসরণ করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়ে। বুদ্ধি বিবেচনার দ্বারা এগুলিকে গ্রহণ করতে না পারলে সে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শিক্ষার্থীর এই অনুকরণ প্রিয়তাকে শিক্ষায় সদ্ব্যবহার করা চাই। অভিভাবন সঞ্চারের দ্বারা শিক্ষক শিশুর মনে আচার আচরণে অভিপ্রেত পরিবর্তন আনতে পারেন। তার মনকে গঠনধর্মী করে তোলার জন্য শিক্ষাপ্রদানের সময় নানা বিষয়ের অবতারণা তিনি করবেন। নতুন ভাব ও আদর্শ শিশুমনে সঞ্চার করার জন্য শিক্ষক ইতিহাস থেকে, সাহিত্য থেকে নানা উপাদানের সাহায্যে অভিভাবন সৃষ্টি করতে পারেন।

সমাজের প্রতি, শিক্ষার প্রতি, বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি শিক্ষক শিশুমনে সহানুভূতি সৃষ্টি করে শিক্ষাকে স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত করে তুলতে পারেন।

সহানুভূতির ফলেই শিশু বয়স্কদের, অন্যান্য শিশুদের অনুকরণ করে। এর ফলে তার সামাজিকতা বোধ, পরানুভূতি জাগ্রত হয়, বাস্তব রূপ পায়। সহানুভূতির দ্বারাই শিশুর চরিত্রকে সমাজ-মণ্ডিত (socialised) করে তোলা যায়। শিক্ষক শিক্ষায় সহানুভূতিকে কাজে লাগাবেন। শিশু অন্যের সংগে বিশেষ ভাবে বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংগে সবচেয়ে বেশী সহানুভূতিসম্পন্ন হয়। তার হাবভাব, হাতের লেখা, কথাবার্তা, আচার আচরণ শিশু সহানুভূতির সংগে অনুকরণ করে। সুতরাং শিক্ষককে সচেতন থাকতে হবে যেন তিনি কোন বিরূপ বা শিক্ষার প্রতিকূল কোন সহানুভূতি শিশুমনে সৃষ্টি না করেন।

শিক্ষার দ্বারা আমরা আচরণের সামাজিক অভিপ্রেত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন আনতে চাই। আর তা সম্ভব অনুকরণ প্রবণতাকে শিক্ষায় গ্রহণ করার দ্বারা। অনুকরণ মৌলিকতাকে বিনষ্ট করে না। অনুকরণ আর নকল করা এক কথা নয়। অনুকরণ গতিশীল মানসিক প্রক্রিয়া, আমাদের জৈবিক ধর্ম। সুতরাং শিক্ষক শিক্ষাপ্রদানের সময় বিদ্যালয়ের পরিবেশ, পাঠক্রম, পাঠ্যসূচীর কার্যাবলী প্রভৃতির দ্বারা শিশুর মনে অনুকরণ প্রবণতা জাগিয়ে তুলবেন, তাকে অনুকরণ যোগ্য পরিবেশ প্রদানের সদা চেষ্টা করবেন। শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় দেখা যায়, শিশু অনুকরণের দ্বারাই শেখে—অনুকরণ তাই সার্থক শিক্ষায় অপরিহার্য।

প্রশ্নাবলী

1. **Discuss from the psychological point of view the relative merits and demerits of individual education and group education.**

2. **Discuss the nature of imitation, suggestion & sympathy and their importance in education.**

একবিংশ অধ্যায়

শিক্ষার সমাজতত্ত্বমূলক ও জীবতত্ত্বমূলক ভিত্তি
(Sociological and Biological Bases of Education)

আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষার মূলে সমাজতত্ত্ব ও জীবতত্ত্বের যথেষ্ট অবদান বর্তমান। সমাজতত্ত্বের দ্বারা শিক্ষাকে আমরা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া এবং জীবতত্ত্বের দ্বারা শিক্ষাকে জীবন বিকাশ প্রক্রিয়া বলে জেনেছি। আলোচ্য অধ্যায় আমরা শিক্ষার সমাজতত্ত্বমূলক ও জীবতত্ত্বমূলক ভিত্তি আলোচনা করছি।

১। শিক্ষার সমাজতত্ত্বমূলক ভিত্তি (Sociological Bases of Education) :

শিক্ষা একটি ব্যক্তিগত প্রক্রিয়া—কিন্তু এই ব্যক্তিগত প্রক্রিয়া সমাজের পটভূমিকায় সম্ভব হয়। ব্যক্তি জন্মে সমাজে—তার জীবনের সকল কর্ম ধ্যান-ধারণা, আচার আচরণ সমাজেই সংগঠিত হয়। সমাজের সংগে ব্যক্তির নাড়ির বন্ধন। সমাজ চেতনা ব্যক্তির সহজাত প্রবৃত্তি। সামাজিক পরিবেশের সংগে শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তির সংগতিসাধন করা চাই। ব্যক্তির চাহিদা যেভাবে শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করে, সামাজিক চাহিদাও সেভাবে শিক্ষায় পরিতৃপ্তি খোঁজে, প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চায়। সমাজতত্ত্বের দিক থেকে শিক্ষা কেন অপরিহার্য তা আমরা নিম্নে আলোচনা করছি।

(১) মানব ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই মানুষ ইতিহাসের আদিম স্তর থেকেই দলগতভাবে বসবাস করে আসছে। সামাজিক সংগঠনের বহু পরিবর্তন ও বিবর্তন ঘটেছে। অতীতের সামাজিক কাঠামো আজ আর নেই। নিজস্ব গতিশীল ধারায় ইতিহাসের স্তরে সমাজ চলছে। সমাজের সৃষ্টি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি থেকে। কিন্তু সমাজের সৃষ্টি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি থেকে হলেও সমাজের সংরক্ষণ, সামাজিক প্রগতি মানুষের শিক্ষার ওপর নির্ভর করে। সমাজের বিকাশের সংগে সংগে নানা রীতি নীতি, আচার অনুষ্ঠান, প্রথা, সংস্কার দেখা দেয়। শিশু এগুলির সংগে পরিচিত না হলে, এগুলি মেনে না

চললে সমাজে সংহতি বিনষ্ট হয়—নানা সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সুতরাং শিক্ষাদ্বারা শিশুকে সামাজিক জীবনযাপনে উপযুক্ত করে তোলা চাই।

(২) সামাজিক স্থিতি ও সংহতি লাভই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য নয়। সমাজ সংরক্ষণও শিক্ষার লক্ষ্য। বয়স্করা তাদের অর্জিত অভিজ্ঞতা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ ভবিষ্যতের নাগরিক তথা শিশুদের কাছে অর্পণ করে। সমাজের বংশধারাই সমাজকে বাঁচিয়ে রাখে। ব্যক্তির মৃত্যু হলে সমাজের মৃত্যু হয় না—সমাজের ধারাটি ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে পরিবেশিত হয়ে স্থায়িত্ব লাভ করে। শিক্ষায় সমাজের এই গতিটিকে স্থান না দিলে প্রবহমান কালস্রোতে সমাজ স্থায়ী হয় না। শিক্ষা যদি একটি বিশেষ যুগের বিশেষ মানব গোষ্ঠীর চিন্তা ভাবরাশি ও অভিজ্ঞতা অন্য যুগে পরিচালিত (transmitted) না করে, তবে সেই বিশেষ মানবগোষ্ঠীর মৃত্যুর সংগে সংগে সে সমাজেরও সমাধি হয়।

(৩) শিক্ষায় আমরা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের ওপর গুরুত্ব দেই। কিন্তু ব্যক্তিত্ব সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় গড়ে ওঠে—সমাজ পরিবেশ থেকে ব্যক্তি নানা উপাদান আহরণ করে। এজন্য আমাদের দেখা উচিত যাতে শিক্ষায় শিশু উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশ থেকে যেন বঞ্চিত না হয়। ব্যক্তিত্ব ও সমাজবোধ অচ্ছেদ্য—ব্যক্তি ছাড়া যেমন সমাজ নেই, তেমনি সমাজ ছাড়া ব্যক্তি নেই। ব্যক্তি জন্মের পরই সমাজ-জীবনের আচার অনুষ্ঠান রীতি নীতির সংগে জড়িত হয়ে পড়ে। এর ফলে তার সামাজিক সত্ত্বা (social self) বিকশিত হয়। অহংবোধ (ego) আত্মকেন্দ্রিকতায় পর্যবসিত না হয়ে সামাজিক সত্ত্বায় উন্নীত হয়, ব্যাপকতা লাভ করে। সুতরাং শিক্ষায় সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করা উচিত—শিক্ষা সমাজ ধর্মী না হলে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে।

(৪) আধুনিক সমাজে শিক্ষাকে একটি সামাজিক শক্তি ও সমাজের প্রগতি অর্জনে ও আধুনিকীকরণে পরম সহায়ক বলে গণ্য করা হয়। শিক্ষার আধুনিক বৈশিষ্ট্য হল—শিক্ষা একটি সামাজিক শক্তি (Social force)। শুধু জ্ঞান ও সংস্কৃতির সঞ্চিত ভাব ধারার সংগে পরিচিতি ঘটান শিক্ষার লক্ষ্য নয়। সামাজিক নবীকরণ বা আধুনিকীকরণ (modernization) ও প্রগতির উপকরণ হল শিক্ষা। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক, আমরা আমাদের দেশকে অর্থনৈতিক উন্নতিতে অগ্রসর করতে চাই। এ সম্ভব হবে একমাত্র বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী শিক্ষা প্রসারের দ্বারা। দেশকে খাদ্য সংস্থানে স্বনির্ভর করা

কখনই সম্ভব হবে না যতক্ষণ কৃষক মান্ধাতার আমলের গোড়ামি পরিত্যাগ করে বিজ্ঞান ভিত্তিক চাষবাসে এগিয়ে না আসে, কৃষিকার্যে নতুন নতুন পরীক্ষণে আগ্রহ প্রকাশ না করে। আর এ সম্ভব একমাত্র শিক্ষা দ্বারা।

২। সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিভংগীতে শিক্ষা (Education from the Sociological standpoint) ঃ

শিক্ষাকে সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিতে একটি সামাজিক প্রক্রিয়া (Social process) বলে অভিহিত করা হয়। ব্যক্তি যখন বিদ্যালয়ে যায় বা দলে সমবেত হয় বা একাধিক ব্যক্তি যখন একত্র মিলিত হয় তখন তাদের পরস্পরের মধ্যে নানা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এর ফলে ব্যক্তি বিভিন্ন চিন্তা, আবেগ, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। সকলের সংগে আপন পার্থক্য এবং বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও ব্যক্তি যেমন সচেতন হয় তেমনি অন্যান্য সকলের সংগে সে একটি ঐক্য অনুভব করে, সম্পর্ক স্থাপনের প্রেরণা লাভ করে। সমাজতত্ত্বের দিক থেকে এই পারস্পরিক প্রতিক্রিয়াই শিক্ষা। ব্যক্তির সমগ্র জীবনভর এই প্রতিক্রিয়া চলে, আর শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তি বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া ও অভিজ্ঞতার মধ্যে একটি সংহতি স্থাপন করে আপন ব্যক্তিত্ব বিকাশ করে থাকে। এই সংহতি এবং সংগতি সাধন সম্ভব হয় নানা রকম মানসিক দৃষ্টিভংগী সৃষ্টির দ্বারা। শিক্ষাকে সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় শিক্ষা সামাজিক সত্ত্বার বিকাশ বা সামাজিক দৃষ্টিভংগীর সৃষ্টি আর কিছুই নয়।

সমাজতত্ত্বের দিক থেকে শিক্ষার লক্ষ্য কি? সমাজতত্ত্বের দিক থেকে সমাজ সংরক্ষণ ও সমাজ প্রগতি শিক্ষার লক্ষ্য। সমাজের অস্তিত্ব নির্ভর করে সমাজের ভাবধারা, আদর্শ, সংস্কৃতি ইত্যাদি বাঁচিয়ে রাখার ওপর। তাই শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে, সামাজিক ভাব সম্পদ আগামী দিনের সমাজের নাগরিকদের অর্পণ করা। এতে সমাজের অস্তিত্ব রক্ষা পাবে। কিন্তু পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হলেই আমাদের পক্ষে সমাজকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়। প্রতিটি যুগের তার নিজস্ব চাহিদা আছে, পরিবর্তনশীল পরিবেশের আছে নিজস্ব আহ্বান। তাই নতুন চিন্তার, নতুন ভাবের ও নতুন দৃষ্টিভংগীর প্রয়োজন। নতুন পরিবেশের সংগে সংগতি সাধনের জন্য নতুন কৌশল চাই, নতুন আবিষ্কার চাই, মানুষের অভিজ্ঞতার ও জ্ঞানের এভাবে হয়

প্রসারণ। তাই শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু সমাজের সংরক্ষণ নয় সমাজের প্রগতি-সাধনও।

সমাজ জীবনে শিক্ষার অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তার জন্য ডিউই প্রতিটি বিদ্যালয়কে সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ রূপে গড়ে তোলায় কথা বলেছেন। শিক্ষার মাধ্যম রূপে সমাজ, রাষ্ট্র, বিদ্যালয় প্রভৃতি সামাজিকতার ভূমিকাই গ্রহণ করে। শিক্ষা আধুনিক যুগে মোটেই ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়।

৩। শিক্ষার জীবতত্ত্বমূলক ভিত্তি (Biological basis of Education) :

শিক্ষার কেন্দ্র হল মানব জীবন। মানব জীবনকে ব্যাখ্যা করতে গেলে জীবনের জৈবিক দিককে বাদ দেওয়া চলে না। শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয় করে থাকে শিক্ষাদর্শন। কিন্তু দর্শন জীবতত্ত্বের মৌলিক তত্ত্বগুলিকে বাদ দিয়ে তৈরী হতে পাবে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে জীবতত্ত্বের অবদান শিক্ষায় বর্তমান।

জীবতত্ত্বের প্রধান অবদান হল তার বিবর্তনবাদের (theory of evolution) তত্ত্বটি। বিবর্তনবাদ অনুসারে মানুষ অন্যান্য প্রাণীদের সংগে সম্পর্কীভূত—বহু শতাব্দীর পরিবর্তন ও বিবর্তনের পথে মানুষ আজকের অবস্থায় উপনীত হয়েছে। বিবর্তন বাদের একটি মৌলিক অনুসিদ্ধান্ত হল জীবনসংগ্রাম—(struggle for existence); যারা উপযুক্ত, টিকে থাকার সংগ্রামে শক্তিশালী ও দক্ষ তারা টিকে থাকবে—যারা দুর্বল, জীবন সংগ্রামে অপটু তারা ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হবে। মানুষ বিশ্বের প্রাণী সমাজে শ্রেষ্ঠ—জীবন সংগ্রামে জয়ী হয়ে সে সকল প্রাণীর ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছে।

দেহের গঠন ও দৈহিক বলের দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায়, মানুষের চাইতে শক্তিশালী দেহ ও দৈহিক বল সম্পন্ন প্রাণীর সংখ্যা অনেক। দৈহিক দিক থেকে মানুষ প্রাণীর সমকক্ষই নয়। ইন্দ্রিয় শক্তির দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায় বহু প্রাণী মানুষের চাইতে উন্নত ও বহু সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের অধিকারী; কুকুরের ঘ্রাণ শক্তি, বাদুরের স্পর্শশক্তি, হরিণের শ্রবণ শক্তি মানুষকে হার মানায়। বেশীর ভাগ প্রাণী অন্ধকারে দেখতে পায়। তবুও

মানুষ জীবন সংগ্রামে অমিত শক্তির অধিকারী হল কি ভাবে? কি কারণে মানুষ বিবর্তন প্রক্রিয়ায় শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হয়? আমরা নিম্নে তা সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করছি। এর ফলে শিক্ষায় জীবতত্ত্বের ব্যাখ্যা আমাদের কি অবদান যুগিয়েছে তা সহজেই বোধগম্য হবে।

মানুষের দৈহিক ও মানসিক সংগঠনে এমন কতকগুলি জৈবিক উপাদান বর্তমান যার ফলে মানুষ অন্যান্য প্রাণীর চাইতে অধিকতর অভিযোজন (adaptibility) ক্ষমতা লাভ করেছে। প্রথমতঃ, মানুষ মস্তিষ্কের সংগঠন ও বুদ্ধি-ক্ষমতার কথা বলা চলে। প্রাণীর গুরু মস্তিষ্কের (cerebrum) বিভিন্ন অংশগুলি (lobe)গুলি এত বড় যে তারা সহজাত প্রবৃত্তি, প্রতিবর্ত ক্রিয়া এবং ইন্দ্রিয় জনিত সংবেদনের ওপর নির্ভর করে। মানুষের মস্তিষ্কের সম্মুখের অংশটি (lobe) কেবলমাত্র বর্ধিত থাকার ফলে মানুষ জটিল কর্ম ক্ষমতা, চিন্তা ও বিচার বুদ্ধির অধিকারী। কিন্তু অধস্তন প্রাণীর মস্তিষ্কের সম্মুখের অংশটি (lobe) অপরিপুষ্ট থাকার ফলে সে মানুষের মত বুদ্ধি ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত। মানুষের মধ্যে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি (endocrine glands) থাকার ফলে সে অভিযোজন ক্ষমতার অধিকারী যা প্রাণীর পক্ষে সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, মানুষের বাক্ শক্তির ক্ষমতা—তার ভাষাজ্ঞান তাকে প্রাণীরাজ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছে। বাক্শক্তি ও ভাষার সাহায্যে মানুষ তার জ্ঞান ও চিন্তা ধারা আদান প্রদান করতে পারে—বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন যুগে বিতরণ করতে পারে, সঞ্চিত করে রাখতে পারে। তার দুটি হাত তাকে জীবন সংগ্রামে সাহায্য করে বলে তার মুখ তার ভাষাও বাক্ শক্তির সহায়ক। তৃতীয়তঃ, মানুষের হাত দুটি মুক্ত থাকার ফলে মানুষ হাতের সাহায্যে খাদ্য সংগ্রহ করা, যুদ্ধ বিগ্রহকরা, যন্ত্রপাতি তৈরী করা, প্রকৃতিতে অভিপ্রেত পরিবর্তন আনার অধিকারী। প্রাণীদের হাতগুলি তার দেহের ভর নির্ভর করতে কাজে লাগে, চলাফেরা করতে কাজে লাগে। মানুষ দুটো পা দিয়েই তার দেহকে চালিয়ে নিতে পারে—হাতদুটিকে বিশেষ বিশেষ কাজে লাগাতে পারে। কিন্তু তা অধস্তন প্রাণীর পক্ষে সম্ভব নয়। চতুর্থতঃ, মানুষের শৈশব দীর্ঘস্থায়ী হবার ফলে সে অনেক সুবিধা লাভ করে। যদিও মানব শিশু অসহায় এবং অন্যের ওপরে সে বেঁচে থাকার জন্য শৈশবে নির্ভরশীল, তবুও এ নির্ভরতা তাকে সমাজবন্ধনে সহায়তা করে, পরস্পর পরস্পরের সংগে সহযোগিতা করা তার জীবন ধর্ম হয়ে দাঁড়ায়। শৈশব শিশুর জীবন

বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ কাল। নমনীয়তা, খেলার মধ্যে জীবনের প্রস্তুতি ও বিচিত্র বিকাশ শৈশবেই দেখা যায়। মানব শিশুর বিলম্বিত শৈশব তাকে জীবন সংগ্রামের জন্য অন্যান্য প্রাণীর চাইতে অধিকতর উপযোগী করে তোলে।

৪। জীবতত্ত্বের দৃষ্টিভংগীতে শিক্ষা (Education from the Biologicial Stand point) :

আধুনিক প্রগতিশীল বা শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার ওপর জীবতত্ত্বের দুটি ভাবধারা অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে। একটি হচ্ছে কৃষ্টি যুগতত্ত্ব (Cultural Epoch theory) এবং অন্যটি বিলম্বিত শৈশবতত্ত্ব (Theory of Delayed Infancy)। জীবতত্ত্ব শিশুর আচরণকে বিবর্তনের ধারায় ব্যাখ্যা করে। প্রাণীর জীবকোষে (cell) তার সকল সম্ভাবনা শৈশবেই লুকিয়ে থাকে। বয়োবৃদ্ধির সংগে সংগে তার জীবনে বিভিন্ন আচরণ দেখা দিতে থাকে। এই আচরণের মধ্য দিয়ে জীব তার পূর্বপুরুষদের আচরণকেই অনুসরণ করে। মানব শিশু সম্বন্ধেও এ সত্য প্রযোজ্য। শিশু তার ক্রমবিকাশের পথে তার পূর্বপুরুষদের প্রধান প্রধান আচরণকেই প্রকাশ করে, পূর্বপুরুষদের মৌলিক আচরণকে বর্জন করা সম্ভব নয়। একেই বলে কৃষ্টি যুগতত্ত্ব। মানুষের জীবনে বিবর্তনের ধারায় যে সব প্রধান প্রধান অভিজ্ঞতা ও আচরণ দেখা যায়, সেগুলি হবে শিশু শিক্ষার পাঠ্য বিষয়।

বিলম্বিত শৈশব তত্ত্ব অনুযায়ী যে প্রাণীর শৈশব যত দীর্ঘস্থায়ী তার জীবন সংগ্রামও তত উন্নত ধরনের এবং তার অস্তিত্বও অন্যান্য প্রাণীর চাইতে নিরাপদ। যে সব প্রাণীর শৈশব স্বল্পস্থায়ী তারা জীবন সংগ্রামে পর্যাপ্ত শক্তিশালী নয়, তাদের অস্তিত্বও নিরাপদ নয়। মানব শিশুর শৈশব দীর্ঘ এবং বৈচিত্র্যময়, তাই তার জীবন সংগ্রামে দক্ষতা বেশী, অস্তিত্ব অনেক নিরাপদ। এজন্য শিক্ষাকে বিলম্বিত এবং বৈচিত্র্যময় করা চাই।

অতএব দেখা যাচ্ছে জীবতত্ত্বের দিক থেকে শিক্ষা শিশুর জীবনের বিকাশ প্রক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। জন্মসূত্রে শিশু যে উন্নত ধরনের অভিযোজন ক্ষমতা লাভ করেছে শিক্ষার দ্বারা, ব্যক্তি পরিবেশের সংগে নানাভাবে তার

ফলে অভিযোজন করে। মানুষের জীবন বিকাশ এবং অভিযোজন একটি স্থির ঘটনা নয়, সমগ্র জীবন ধরে জীবনের অন্তহীন বিকাশ (দৈহিক স্তর থেকে মানসিক স্তরে, মানসিক স্তরে বিচিত্র ভাবধারায়) এই অভিযোজন প্রক্রিয়া চলে। পশু প্রাণীর মত মানুষের অভিযোজন প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণ নয়, বা বিচার বুদ্ধি হীনভাবে পরিবেশের সংগে কোন মতে সংগতি বিধান করে অস্তিত্ব বজায় রাখা নয়। প্রাণী প্রকৃতিকে গ্রহণ করে তাকে মেনে চলে গতানুগতিক ভাবে, একই ধারায়। কিন্তু তার অভিযোজন প্রক্রিয়ার দ্বারা নিজেও যেমন পরিবর্তিত হয়ে যায়, তেমনি প্রকৃতিকেও পরিবর্তিত করে; তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। মানুষের অভিযোজন প্রক্রিয়া অতি ব্যাপক ও গভীর। আদিম মানুষ আধুনিক সমাজে বেঁচে নেই, তেমনি আধুনিক মানুষকে প্রাচীন যুগে বা আদিম সমাজে (এটা সম্ভব নয় শুধু কল্পনা করা হচ্ছে) রেখে দিলে সে বাঁচতে পারে না।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the Sociological basis of education. Define education from the standpoint of sociology.

2. Discuss the biological basis of education. Define education from the stand point of biology.

দ্বাবিংশ অধ্যায়

গণতন্ত্র, জাতীয় সংহতি ও আন্তর্জাতিকতার জন্য শিক্ষা

(Education for Democracy, National Integration and International Understanding)

১। গণতন্ত্রের জন্য শিক্ষা (Education for Democracy) :

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া কোন কাজ সাফল্য করে না। তার কারণ গণতন্ত্র জনগণের সক্রিয়তাকে রাষ্ট্র পরিচালনায় নীতি হিসাবে স্বীকার করে। ব্যক্তির মর্যাদাবোধ (dignity of individual), তার সূক্ষ্ম বিচার বোধ (fine understanding) এই দুই শর্তের ওপর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। অতএব দেখা যাচ্ছে গণতন্ত্র কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় আদর্শ নয়, উহা একটি সামাজিক আদর্শও। যে সামাজিক আদর্শ গণতন্ত্র উপস্থিত করে, সে আদর্শ ব্যক্তির ওপর অনেক দায়িত্ব অর্পণ করে। স্বপরিকল্পিত-স্বপরিশাসিত এবং স্ব-নিয়ন্ত্রিত সমাজ-ব্যবস্থা গঠন করতে গেলে ব্যক্তিকে বুদ্ধি-বিবেচনার অধিকারী হতে হবে, দায়িত্বশীল হতে হবে, একে অন্যের মতামতকে সহনশীলতা ও শ্রদ্ধার সংগে বিবেচনা করতে হবে। কারণ গণতন্ত্র বিশ্বাস করে বিভিন্ন মত ও বিভিন্ন পথের মধ্যে সমাজ প্রগতির মূল শর্তটি নিহিত আছে। সুতরাং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিককে সদা সচেতন ও সহনশীল হতে হবে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বা সমাজে নাগরিকই হল মুখ্য। সুতরাং উপযুক্ত সুনাগরিক না হলে গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা গঠন করা যায় না। অন্যদিকে গণতান্ত্রিক আদর্শ ব্যতিরেকে সুনাগরিক সৃষ্টি করা যায়। যেহেতু গণতন্ত্র ব্যক্তির চিন্তার স্বাধীনতা, ব্যক্তির মর্যাদাবোধ, বিভিন্ন দল ও সংগঠন দ্বারা বিচিত্র অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি ও প্রকাশের সুযোগ প্রদান, সামাজিক মংগলের সহায়ক সকল কার্যাবলীর প্রচার ও পরীক্ষণ মেনে নয়, সেহেতু একমাত্র গণতন্ত্রেই উপযুক্ত

ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি হতে পারে। ডিউই বলেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য উপযুক্ত ব্যক্তিত্বের প্রকাশ, অভিজ্ঞতার সংস্কার ও পুনর্গঠন এবং এজন্য গণতন্ত্রের ওপর শিক্ষা নির্ভরশীল। অন্যদিকে সার্থক শিক্ষা, বিচিত্র অভিজ্ঞতা পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া ও দলগত কর্ম প্রচেষ্টা, ব্যক্তির আগ্রহ প্রভৃতির ওপর গুরুত্ব দেয় বলে, গণতন্ত্র শিক্ষার ওপর নির্ভরশীল। এজন্য ডিউই গণতন্ত্র ও শিক্ষার সংগে সুষ্ঠু সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়কে একটি আদর্শ সমাজরূপে গড়ে তোলার কথা বলেছেন।

গণতন্ত্রে নাগরিকের শিক্ষা। (১) গণতন্ত্রের সাফল্য উপযুক্ত নাগরিকের ওপর নির্ভর করে এবং উপযুক্ত নাগরিক উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা গঠিত হয়। গণতন্ত্রে সুনাগরিক হবার জন্য বুদ্ধিগত, সামাজিক এবং নৈতিক গুণাবলী অর্জন করা দরকার। স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থায় বা অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যেখানে জনগণের বাক্ বা চিন্তার স্বাধীনতা নেই, সেখানে জনগণকে এত দায়িত্বশীল হবার প্রয়োজন নেই। গণতন্ত্রে প্রতিটি ব্যক্তিকে তার স্বাধীন মতামত গঠনের উপযুক্ত হতে হয়—সমাজ ও দেশের ব্যাপারে বিচার বুদ্ধির পরিচয় দিতে হয়। সুতরাং শিক্ষার দ্বারা সর্ব প্রথম প্রতিটি নাগরিককে সঠিক চিন্তায় ও বিভিন্ন ভাবধারা গ্রহণে পারদর্শী করতে হবে। যেখানে নাগরিকরা অশিক্ষিত, বিচার বুদ্ধি হীন—সেখানে স্বার্থপর নেতাদের দ্বারা জনগণ প্রতারিত হবার সম্ভাবনা বেশী এবং গণতন্ত্র ব্যর্থ হতে বাধ্য। এর অন্য নাম নেতাদের দ্বারা জনগণের শোষণ। এজন্য প্রতিটি ব্যক্তির নৈতিক ও বুদ্ধিগত সততা (integrity) থাকা উচিত। প্রতিটি ব্যক্তিকে বৈজ্ঞানিক মনোভাব নিয়ে বাস্তব চিন্তায় অভ্যস্ত হতে হয়ে, প্রমাণিত তথ্য ও তত্ত্ব দিয়ে মতামত গ্রহণ ও বিশ্লেষণ করতে হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫২-৫৩খ্রীঃ) মনে করেন নাগরিকের এই বুদ্ধিগত দিকটিকে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। শিক্ষকের দেখা উচিত ছাত্ররা যেন সক্রিয়ভাবে তার পাঠ গ্রহণ করে এবং স্বাধীন মতামত প্রকাশ করার সুযোগ ও সামর্থ্যলাভ করে।

(২) গণতন্ত্রে ভাবের আদান-প্রদান ও স্বাধীন চিন্তার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। পরস্পর আলোচনা, বিভিন্ন ভাবধারা সংব্যাখ্যানে সহনশীলতা, জনমত সংগঠনে সহায়তা করা নাগরিকের কর্তব্য। এজন্য কথাবার্তা ও ভাষা জ্ঞান

যথার্থ ভাবে জানা উচিত। সামাজিক দিক থেকে এর গুরুত্ব প্রচুর। নিজেকে প্রকাশ করার মত উপযুক্ত ভাষাজ্ঞান থেকে বঞ্চিত থাকলে ব্যক্তি অন্যের ভাবও গ্রহণ করতে পারে না। এজন্য সুনাগরিকের শিক্ষায় ভাষাজ্ঞানের ওপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

(৩) গণতন্ত্রে মানুষ হিসাবে প্রতিটি ব্যক্তির মর্যাদা ও মূল্য স্বীকৃত হয়। কিন্তু কেবলমাত্র রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে ব্যক্তিকে মর্যাদা দিলেই গণতান্ত্রিক নাগরিক সৃষ্টি হয় না। এজন্য গণতান্ত্রিক শিক্ষায় সুষম ব্যক্তিত্বের উন্মেষকে লক্ষ্য বলে গ্রহণ করা হয়। এর অর্থ হল, ব্যক্তির সর্বাংগীণ বিকাশের জন্য শিক্ষা ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক বিশেষভাবে প্রক্ষোভগত, সামাজিক এবং অন্যান্য ব্যবহারিক চাহিদাকেন্দ্রিক হবে। শিক্ষা গতানুগতিক পুস্তককেন্দ্রিক না হয়ে শিক্ষার্থীকে বহুমুখী জীবনে প্রবেশ করার ক্ষমতা অর্জন করাবে। যে শিক্ষা ব্যক্তিকে সক্রিয়ভাবে, সামঞ্জস্য সাধনের সংগে, সহনশীলতার সংগে জীবন যাপনের গুণাবলী প্রদান না করে, সে শিক্ষা গণতান্ত্রিক সমাজে গ্রহণ যোগ্য নয়। গণতান্ত্রিক শিক্ষায় শৃঙ্খলা, সহযোগিতা, সামাজিক অনুভবনশীলতা এবং সহনশীলতা প্রভৃতি সামাজিক গুণাবলীকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

(৪) সামাজিক শৃংখলা কোন মানসিক বা অন্তঃসারশূন্য ব্যাপার নয়। সমবেত কাজ, সক্রিয় কার্যাবলীর মাধ্যমে সামাজিক সংহতি ও শৃংখলা গড়ে ওঠে। এজন্য গণতন্ত্রের শিক্ষায় সমবেত কর্মানুষ্ঠানের সুযোগ দেওয়া হয়। গণতান্ত্রিক সমাজ সকলের জন্য সমসুযোগ (equal opportunity) প্রদান করে। এটা সম্ভব যদি আমরা প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে সামাজিক ন্যায়পরতা বোধ এবং সহনশীলতার (অর্থাৎ অন্যের মত ও পথকে শ্রদ্ধার সংগে বিবেচনা করা ও সহ্য করা) মনোভাব জাগ্রত করি। একমাত্র বিদ্যালয়ে সমবেত কার্যাবলীর আয়োজন করে গণতান্ত্রিক সমাজের আদর্শ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

(৫) গণতান্ত্রিক সমাজের যে স্ব-নির্ভরতার কথা আমরা বলি অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা ছাড়া তা সম্ভব নয়। এজন্য গণতান্ত্রিক সমাজে প্রতিটি ব্যক্তিকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য তার উৎপাদনাত্মক, কারিগরী ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা বৃদ্ধি করতে হবে। প্রতিটি ব্যক্তি তার যোগ্য কাজ করে জীবিকা নির্বাহে স্বনির্ভর হবে। তা না হলে অর্থনৈতিক ক্লীবতা ব্যক্তি চরিত্রকে

পরাধীন, পরনির্ভর করে তুলবে এবং গণতন্ত্র তার অভিপ্রেত উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হবে।

(৬) গণতন্ত্রকে সার্থক রূপায়ণের জন্য উপযুক্ত নেতৃত্বের প্রয়োজন। নেতৃত্ব বলতে কেবলমাত্র রাজনৈতিক নেতৃত্ব বোঝায় না—অর্থনৈতিক, সামাজিক ও বুদ্ধিগত সকল দিক থেকেই নেতৃত্বের প্রয়োজন। সামাজিক প্রগতিতে সকলকে অংশ গ্রহণ করতে গেলে সমাজের সকল স্তরে নেতৃত্বের প্রয়োজন। দেশাত্মবোধক মনোভাব জাগ্রত করা, সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা, কুসংস্কার প্রথা, সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত থেকে স্বাধীন মতামত গঠন করা সহজ নয়। যদি শিক্ষার দ্বারা আমরা শিক্ষার্থীকে সামাজিক স্তরে নেতৃত্ব প্রদানের উপযুক্ত করে তুলতে পারি, তবে গণতন্ত্র সার্থক হবে।

২। জাতীয় সংহতির জন্য শিক্ষা (Education for National Integration):

আধুনিক শিক্ষাকে কেবলমাত্র ব্যক্তির মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রয়োগ করা হয় না। শিক্ষা একটি সামাজিক শক্তি। দেশ ও রাষ্ট্রের সংহতি সাধন, দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তার উন্মেষ সাধনের জন্য শিক্ষাকে প্রয়োগ করা হয়। জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় সংহতি সকলের সংগে একাত্মবোধের নামান্তর। ভৌগোলিক অবস্থান, ভাষা, অতীত ইতিহাস, বর্তমান সমস্যা, ধর্ম প্রভৃতি মানুষের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করে। কিন্তু জাতীয়তাবোধ সৃষ্টিতে এর কোনটিই অপরিহার্য নয়। একটি ধর্মের মধ্যে, একই ভাষার মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠী বা রাষ্ট্রের উদ্ভব ইতিহাসে হয়েছে। ১৯৪৭ খ্রীঃ ভারত ও পাকিস্তান দুই রাষ্ট্রের উদ্ভব একথা প্রমাণ করে। এ দুই রাষ্ট্রের সৃষ্টির মূলে ধর্মের পার্থক্যের দাবী ছিল। কিন্তু ইতিহাস, ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশ, সংস্কৃতি, ভাষা প্রভৃতির দিক থেকে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে ঐক্যই লক্ষ্য করা যায় বেশী। আসল কথা, জাতীয় বা সামাজিক ঐক্য মনস্তাত্ত্বিক ও নীতিশাস্ত্রগত (Psychological and ethical) প্রত্যয় (concept)। মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে সকলের সংগে সহানুভূতি সম্পন্ন হওয়া—সকলের মধ্যে ঐক্য অনুভব করার মধ্যে জাতীয় সংহতি নির্ভর করে। সংহতি তখন একটি বিশেষ প্রক্ষোভে (emotion) পরিণত হয়ে আমাদের নানা আচরণে প্রকাশিত হয়। নীতিশাস্ত্রের দিক থেকে

যখন ঐক্যকে আমরা মর্যাদা দেই, আদর্শ বলে মেনে নেই তখন জাতীয় সংহতি একটি বাস্তব ও গতিশীল রূপ লাভ করে।

(ক) **ভারতে জাতীয় সংহতির গুরুত্ব (Importance of National Integration in India)ঃ** স্বাধীনতার পূর্বে আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করা। সুতরাং লক্ষ্যের এ ঐক্য থেকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পরাধীন ভারতে একটি সংহতি সৃষ্টি হয়েছিল। সংস্কৃতি ও জাতীয় মানসিকতার ক্ষেত্রে রামমোহন, বংকিম চন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু যে উর্বর ভূমি সৃষ্টি করেছিলেন, স্বাধীন ভারতে সে ভূমিতে সংহতির ফসল ফলেনি। দুর্ভাগ্যের হলেও একথা সত্য যে ভারতের অধিবাসী নিজেকে আজ কোন ভাষা, প্রদেশ বা সম্প্রদায়ের বা ধর্মের অনুগত হিসেবে যতটুকু ভাবে, ভারতীয় হিসেবে নিজের পরিচয় ততটুকু দেয় না। প্রাদেশিকতা, আঞ্চলিকতা, ভাষা প্রভৃতির নামে স্বাধীনতার পর আমাদের মধ্যে যে বিচ্ছিন্ন উগ্র মনোভাব দেখা দিয়েছে, তা আমাদের অর্থনৈতিক প্রগতিকে শুধু ব্যাহত করছে না, জাতীয় ঐক্যকে বিনষ্ট করতে উদ্যত। রাজনৈতিক নেতারা দেশের সাধারণ মানুষের এই সংকীর্ণ দৃষ্টিকে নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার কাজে লাগিযে পরিস্থিতিকে আরও কুৎসিত করে তুলেছেন।

১৯৬২ খ্রীঃ ভারত সরকার জাতীয় সংহতি সমিতি (National Integration Council) নিয়োগ করে আমাদের মধ্যে এই অসামাজিক মনোভাব দূরীভূত করার উপায় নির্দেশ করতে বলেন। উক্ত সমিতি এক বিরাট বিবরণী প্রকাশ করে নানা দিক থেকে জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। কিন্তু বাস্তবে কোন কিছু কার্যকরী হয়েছে মনে হয় না। কিন্তু ভারতের শাসনতন্ত্রে যে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের (Democratic Republic) আদর্শ আমরা গ্রহণ করেছি, জাতীয় সংহতির অভাবে তা বিনষ্ট হতে পারে না। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি সংহতি একটি মনস্তাত্ত্বিক এবং নীতিশাস্ত্রগত প্রত্যয়। শিক্ষায় শিশুকে সমাজমণ্ডিত (socialised) করার কথা; বিদ্যালয়কে ক্ষুদ্র সমাজে পরিণত করার কথা আমরা বলে থাকি। অহং কেন্দ্রিক (ego-centric) শিশুকে ব্যাপক সামাজিক স্তরে উন্নীত করার মধ্যেই সামাজিক ও জাতীয় সংহতির কথা

নিহিত আছে। সুতরাং জাতীয় সংহতির শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা করা উচিত—দুটো কারণে, একটি ভারতীয় সমাজের পটভূমিকার এর প্রয়োজন রয়েছে এবং অন্যটি হল জাতীয় সংহতি একটি শিক্ষাদর্শ।

(খ) জাতীয় সংহতির শিক্ষা (Education for National Integration) : জাতীয় সংহতি প্রধানতঃ প্রক্ষোভমূলক (emotional)—সকলের প্রতি ঐক্যানুভব বা একাত্মবোধের দ্বারা এ প্রক্ষোভ স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠলেও তাকে শিক্ষায় একটি চিরস্থায়ী রূপ দেওয়া প্রয়োজন অর্থাৎ সংহতিমূলক প্রক্ষোভটিকে একটি 'রসে' (sentiment) পরিণত করা উচিত। এ কাজে বিদ্যালয়কে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হয়। শিক্ষার্থীর মনে জাতীয়চেতনার উদ্রেক করা, পাঠ্যসূচীতে দেশাত্মবোধক বিষয়ের সংযোজন, শিক্ষাদানের সময় সামাজিক দৃষ্টিভংগী গঠনের চেষ্টা করা, সমবেত কার্যাবলীর আয়োজন করা প্রভৃতি প্রয়োজন।

১৯৬৪ খ্রীঃ ডঃ ডি. এস. কোঠারীর সভাপতিত্বে গঠিত শিক্ষা কমিশন জাতীয় সংহতির শিক্ষাকে গুরুত্ব প্রদান করে কয়েকটি মৌলিক নীতি গ্রহণের সুপারিশ করেন।[1] কমিশন বলেন জাতীয় সংহতি সকল উন্নতির একটি পূর্ব শর্ত (Pre-condition) এবং এই সংহতি অর্থনৈতিক, সামাজিক, সংস্কৃতিমূলক এবং রাজনৈতিক উপাদানে গঠিত। জাতীয় সংহতির জন্য প্রয়োজন প্রথমতঃ, জাতির ভবিষ্যতে বিশ্বাস রাখা। দ্বিতীয়তঃ, সাধারণ মানুষের জীবিকা ও জীবন ধারণের মানোন্নয়ন, বেকার অবস্থা দূরীকরণ, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নতির সমতা আনয়ন এবং সকলের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অর্থে সমসুযোগ প্রদান। তৃতীয়তঃ, নাগরিক হিসেবে গভীর মূল্যবোধ (deep sense of values) এবং নৈতিক বাধ্যবাধকতা বোধ থাকা, কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের সংগে নিজেকে অংগীভূত না করে সমগ্রভাবে দেশের সংগে একাত্ম অনুভব করা। চতুর্থতঃ, পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া (understanding), নাগরিক হিসেবে সকলের সংগে সম আচরণ (equal treatment), দেশের বিভিন্ন সংস্কৃতি, প্রথা ও জীবনযাত্রার প্রণালীর প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হওয়া উচিত।

1. Report of the Education Commission—Page 9—10.

শিক্ষাকমিশন জাতীয় সংহতিকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য শিক্ষাস্তরে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিপ্লবের কথা বলেছেন। আর এ প্রসংগে কমিশন কয়েকটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে জাতীয় সংহতির শিক্ষা দেবার কথা বলেছেন।

(১) কমিশন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে সাধারণ ও উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে সুপারিশ করেছেন।

(২) শিক্ষার সকল স্তরে সামাজিক ও দেশের সেবাকে শিক্ষার অংগীভূত বিষয় হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

(৩) শিক্ষায় জাতীয় চেতনা বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

(৪) ভারতীয় ভাষাগুলির উন্নতি সাধন করতে হবে এবং হিন্দীকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উন্নত করে ভারতীয় রাষ্ট্রের সরকারী ভাষায় সক্রিয়ভাবে গ্রহণ করতে হবে।

এ প্রসংগে আমাদের একটি অভিমত হল এই যে জাতীয় সংহতিকে কেবল মাত্র একটি দেশের পটভূমিকায় বিবেচনা করলে জাতীয় সংহতি একটি বাধাধরা ধারণায় পর্যবসিত হয় এবং কালক্রমে আঞ্চলিকতাবাদে পর্যবসিত হয়। জাতীয় সংহতিকে আন্তর্জাতিকতার পটভূমিকায় শিক্ষাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ জাতীয় সংহতির শিক্ষার জন্য আন্তর্জাতিকতাবোধের শিক্ষাও প্রয়োজন।

৩। আন্তর্জাতিকতাবোধের জন্য শিক্ষা (Education for International Understanding) :

বিশ্বঐক্য বর্তমানে কেবলমাত্র একটি অভিপ্রেত আদর্শ নয়, পৃথিবীর অস্তিত্বের জন্য ; মানবজাতির ভবিষ্যতের জন্য, বিশ্বঐক্য আজ অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞান মানুষের হাতে যে অপরিমিত শক্তি দিয়েছে, তাকে রাষ্ট্রনায়করা বিশেষতঃ প্রগতিশীল,কম্যুনিস্ট ও ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে মারণাস্ত্র আবিষ্কার ও উৎপাদনে ব্যয় করেছেন। সুতরাং পৃথিবীকে আণবিক যুদ্ধ থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব সকল দেশের সকল জনগণের। যুদ্ধের জন্ম আসলে মানুষের

মনে। এজন্য মানুষের মনেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির প্রতিরক্ষা-শক্তি সৃষ্টি করতে হয়। আর তা সম্ভব একমাত্র শিক্ষার দ্বারা। বিজ্ঞানের আশীর্বাদে আমরা ব্যবসা-বাণিজ্যে যতটুকু আন্তর্জাতিক হয়ে উঠেছি ততটুকু আন্তর্জাতিকতাবোধ আমাদের মনে সৃষ্টি হয়নি।

বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে জল, স্থল ও আকাশপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা অতি সহজ, পৃথিবী পরিক্রমণ অতি সংক্ষিপ্ত ব্যাপার। অন্যদিকে যান্ত্রিক সভ্যতায় জ্ঞানও ভাবধারার প্রসার ও প্রচার ঘটেছে অকল্পনীয় ভাবে। মানব জাতির সংস্কৃতি ও ঐক্যকে রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্রসংঘের (UNO) উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে মানুষের মধ্যে বিশ্বঐক্য অনুভূত হলেও রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে বিশ্বরাষ্ট্রের (World State) প্রত্যয়টি আজও বাস্তবে রূপ পায়নি। রাজনৈতিক দিক থেকে ধনতান্ত্রিক ও কম্যুনিস্ট দেশগুলি প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত এবং তারপর এরা নিজেদের মধ্যেও বহু বিবদমান রাষ্ট্রে বিভক্ত। ফলে বিশ্বঐক্যের মূলে যে নীতিবোধ, বুদ্ধিগত এবং আধ্যাত্মিক চেতনা বর্তমান তা বিপর্যস্ত হচ্ছে। বিশ্ব চেতনা (World Consciousness) পরস্পর বোঝাপড়া, সহনশীলতা, শ্রদ্ধা প্রভৃতি গণতান্ত্রিক মনোভাবের মধ্যে গড়ে ওঠে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আধুনিক বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে তা অনুপস্থিত।

জাতীয়তাবাদের নাম নিয়ে আমরা বহু সংকীর্ণতার পরিচয় দিয়েছি। ফলে আমাদের শিক্ষায় জাতিগত ধর্মগত বিদ্বেষ প্রভৃতি মানবতাবিরোধী ধারণাও অনেক সময় স্থান পেয়েছে। অর্থনৈতিক জাতীয়তার নামে ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে দেশে বহু সংগ্রাম হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। এর মূলে আন্তর্জাতিকতা-বোধের শিক্ষার অভাব, উগ্র জাতীয়তাবোধ, সংকীর্ণ শিক্ষার প্রতিক্রিয়া বর্তমান।

পৃথিবীর সকল দেশের শিক্ষাবিদ্‌রা এ সমস্যার গভীরতার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, জন ডিউই, বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রভৃতি চিন্তাবিদ্ আন্তর্জাতিকতার শিক্ষাকে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় গুরুত্ব দিতে বলেছেন। রাষ্ট্রসংঘের অর্থনৈতিক সামাজিক ও সংস্কৃতিমূলক সংস্থা (UNESCO) বিভিন্ন রাষ্ট্রের সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নতির দ্বারা অনগ্রসর

দেশগুলিকে প্রগতিশীল দেশের সমাজ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে আসছে।

৪। শিক্ষা ও আন্তর্জাতিকতাবোধ (Education and International Understanding) :

আন্তর্জাতিকতা বোধ প্রথমতঃ, মানুষের মনেই সৃষ্টি করতে হয়—এজন্য শিশুর মনে বিদ্যালয়েই আন্তর্জাতিকতা বোধ সৃষ্টি করার সুযোগ নিতে হবে। পরিণত বয়সে শিশু রাতারাতি আন্তর্জাতিক হয়ে উঠবে না। শৈশবে তার মনে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ, উদারতা, মানুষ হিসেবে বিশ্বের সকলই যে এক এসব ধারণা মূর্ত ঘটনার মাধ্যমে উপস্থিত করা উচিত।

আন্তর্জাতিকতাবোধ শিক্ষা দেবার জন্য আমাদের শিক্ষার লক্ষ্যকে পুনর্গঠন করে বিশ্বসংস্কৃতির ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। একটা দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় দেশের সংস্কৃতি ও পরিবেশ প্রাধান্য পাবে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্বন্ধে আমরা উদাসীন বা অজ্ঞ থাকব। জাতীয় শিক্ষা এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষা এ দুয়ের মধ্যে কোন মৌলিক বিরোধ নেই। একটি গাছ যেমন মাটিকে নির্ভর করে বিশ্বপ্রসারী আকাশে ডালাপালা মেলে, তেমনি শিক্ষার্থীকে নির্ভর করতে হবে দেশীয় শিক্ষায়, কিন্তু মনের প্রসারতা তাকে খুঁজতে হবে বিশ্ব সংস্কৃতিতে, মানবজাতির ঐক্যে।

সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতির পঠন পাঠনে আন্তর্জাতিকতার দৃষ্টিভংগী গ্রহণ করতে হবে। জাতীয় ইতিহাসকে স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে না পড়িয়ে বিশ্ব ইতিহাসের পটভূমিকায় আলোচনা করা উচিত। ইতিহাস শিক্ষায় বর্তমানে বিভিন্ন দেশের সামরিক ও রাজনৈতিক উত্থান-পতনের ওপর গুরুত্ব না দিয়ে বিভিন্ন দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ওপর আমাদের মনোযোগ দিতে হবে বেশী। সাহিত্য পাঠে মানবজাতির চিন্তাধারা, আদর্শ প্রভৃতির গুরুত্ব দিতে হবে। সাহিত্য মানুষের জীবন্ত ইতিহাস। একটা জাতির মানসিক জীবন সাহিত্যের মধ্যে ধরা পড়ে। এ প্রসংগে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও আমরা উল্লেখ করতে চাই। ভাষা মানুষে মানুষে যোগাযোগের সহজ অকৃত্রিম উপায়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা পৌরবিজ্ঞানকে কেবলমাত্র নিজের দেশের উপযুক্ত নাগরিক সৃষ্টি করার জন্য ব্যবহার না করে মানবজাতির সেবায় উপযুক্ত নাগরিক সৃষ্টি করার কাজে লাগাতে হবে। অর্থনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে মানবপ্রগতির মূলে মানুষের সহযোগিতা, বিভিন্ন দেশের ত্যাগ বর্তমান। জ্ঞানে সকল মানবের সমান অধিকার। ভূগোল পড়াবার বেলা বিভিন্ন দেশ ও মানুষের মধ্যে যে বিভিন্ন পার্থক্য আছে তা আলোচনা করতে আপত্তি নেই, কিন্তু সেখানে মানবজাতির ঐক্যকে গুরুত্ব দিতে হবে।

আধুনিক প্রগতিশীল দেশগুলিতে উচ্চ শিক্ষাস্তরে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নতুন বিষয় হিসেবে সংযোজিত হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস সঠিক পদ্ধতি ও দৃষ্টিভংগী গ্রহণ করলে ইহা আন্তর্জাতিকতাবোধ সঞ্চারে যথেষ্ট সহায়তা করবে।

প্রশ্নাবলী

1. What is National Integration? Discuss the necessity for its education.
2. Discuss education for International Understanding.
3. Discu s education for Democracy.